
চৈত্র, ১৩৪৪
অর্চ্চনা
সম্পাদক—
শ্রীসুধীর কুমার চন্দ
অর্চ্চনা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজ করা হয়
অনুসন্ধান করুন।
182.D.C 904.28
24.5.38

অর্চ্চনা

৩৫ বর্ষ | চৈত্র—১৩৪৪ | ২য় সংখ্যা

দিব্য কর্ম্মী

— শ্রী অনিলবরণ রায় এম-এ

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥

অন্বয়। যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ বুধাঃ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তং পণ্ডিতমাহুঃ।

অনুবাদ। যাঁহার সকল কর্ম্মচেষ্টা ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত, জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা যাহার কর্ম্ম সমস্ত দগ্ধ জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই পণ্ডিত বলিয়া থাকেন।

মুক্ত পুরুষ বাহ্যতঃ অন্যান্য লোকেরই ন্যায় সকল প্রকার কর্ম্ম করেন, বরং তাঁহার কর্ম্ম হয় বৃহৎ, তাহাতে থাকে অধিকতর প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও আবেগ, কারণ তাঁহার ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতির মধ্যে ভগবদ্ ইচ্ছার সতত শক্তি কার্য্য করে। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত বাসনা কামনার বশে কোন কর্ম্ম করেন না নীচের প্রকৃতির কোন প্রেরণার দ্বারা তিনি চালিত হন না, তাঁহার কর্ম্ম বাসনা কামনা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

ভগবানই আমাদের সকল কর্ম্মের কর্ত্তা, আমরা কেবল তাঁহার যন্ত্রমাত্র, এই জ্ঞান লইয়া, "আমি কর্ত্তা" এইরূপ সকল ব্যক্তিগত অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া কর্ম্ম করা— ইহাই হইতেছে দিব্য কর্ম্মীর প্রথম লক্ষণ। তাহার দ্বিতীয় লক্ষণ হইতেছে কামনা হইতে মুক্তি; কারণ যেখানে "অহংকর্ত্তা" এইরূপ অহংভাব নাই, সেখানে কামনা থাকিতে পারে না, তাহার উৎস শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা আর সমর্থন না পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই কর্ম্মের দ্বারা এই ফললাভ করিব এইরূপ কামনা এবং সেই কামনার জন্য সেই কর্ম্ম করিবার সঙ্কল্প - এই দুই হইতেই দিব্য কর্ম্মী মুক্ত। তাহার কর্ম্মের প্রেরণা আসে উর্দ্ধ হইতে, ভগবানের ইচ্ছা হইতে।

আচার্য্য শঙ্কর কর্ম্মের এইরূপ উৎস স্বীকার করেন না, তাহার মতে উর্দ্ধে যে সত্য সেখানে কর্ম্ম নাই, তাহা হইতেছে নীরব, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। তাহা হইলে যে ব্যক্তি মুক্ত হইয়াছেন তিনি কর্ম্ম করিবেন কিসের প্রেরণায়? শঙ্কর ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যাহারা সাংসারিক কর্ম্মে রত হইবেন তাঁহারা লোক সংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিবেন এবং যাহারা সন্ন্যাসী তাহারা শুধু জীবনরক্ষার জন্য কর্ম্ম করিবেন। কিন্তু যাহারা কামনা ও সঙ্কল্প হইতে মুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা লোক সংগ্রহ বা জীবন রক্ষারই কামনা বা সঙ্কল্প করিবেন কেন? তাঁহাদের একমাত্র পরিণতি হইতেছে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন। কিন্তু গীতা যেখানে কাম সঙ্কল্প বর্জ্জিত কর্ম্মের কথা বলিতেছে, সেখানে শঙ্করের যে গীতার অর্থটি ধরিতে পারেন নাই তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তিনি নিজে যে

বিপুল কর্ম্ম করিয়াছেন, আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে নিজের মত প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার নিজেরই সন্ন্যাসের আদর্শের বিরোধী। গীতার দিব্য কর্ম্মী লোক সংগ্রহ বা জীবনরক্ষা বা অন্য কোন কামনার বশে কর্ম্ম করেন না, তিনি নিজে কিছুই করেন না, তিনি কেবল যন্ত্র মাত্র হন, তাঁহাকে নিমিত্ত করিয়া ভাগবতী শক্তি জগতে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

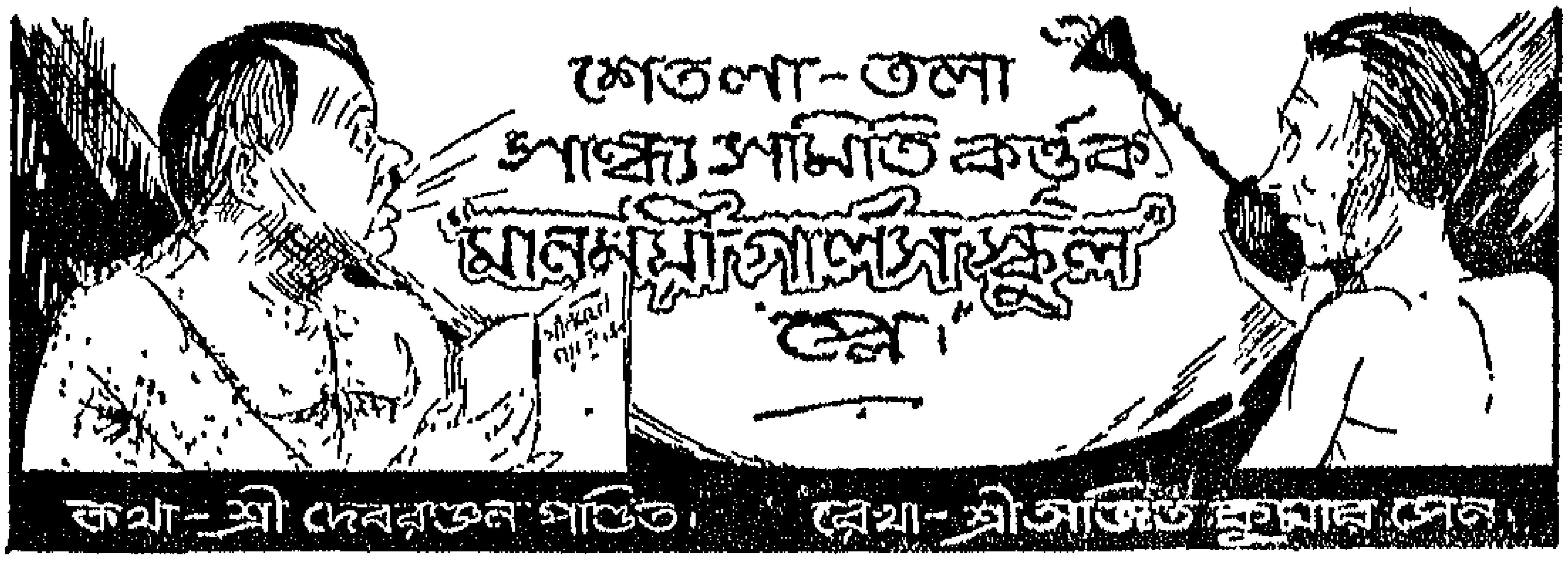
জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়, ইহার অর্থ নহে যে, জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্ম শেষ হইয়া যায়, ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞানের দ্বারা অহংভাব ও কামনা দূর হওয়ায় কর্ম্মের আর বন্ধন শক্তি থাকে না। "মুক্ত ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে ভয় পান না, তিনি সর্ব্বকর্ম্মকারী মহাকর্ম্মী, কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ; অপরের ন্যায় তিনি প্রকৃতির অধীন হইয়া কর্ম্ম করেন না, পরন্তু আত্মার স্থির শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া প্রশান্তভাবে কর্ম্ম করেন। ভগবানই তাঁহার সকল কর্ম্মের অধীশ্বর, কেবল তাঁহার ভিতর দিয়া ঐ সব কর্ম্ম হইয়া থাকে, তাঁহার প্রকৃতি নিজ অধীশ্বর সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তাঁহারই সাক্ষাৎ পরিচালনায় ঐ সব কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। এই জ্ঞানের জ্বলন্ত ও পূত অগ্নি শিখায় তাঁহার কর্ম্ম সকল যেন পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, তাঁহার মনের উপর কোন ক্লেশ বা বিরক্তির দাগ রাখিয়া যায় না, সকল কর্ম্ম করিয়াও সে মন শান্ত, নীরব, অবিচলিত, শুভ্র, নির্ম্মল ও পবিত্র থাকে। কর্তৃত্বের অভিমান শূন্য হইয়া এই মুক্তিপ্রদ জ্ঞানে সমস্ত কর্ম্ম করা ইহাই হইতেছে দিব্য কর্ম্মীর প্রথম লক্ষণ"।"

—শ্রীঅরবিন্দের গীতা

সন্ধ্যের কবিতা

—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আজকে তোমার কাছে চাইবো বিদায়
চাইবো বিদায় এই সন্ধ্যেবেলা ;—
রাতে রয়েছে কাজ অনেকগুলো,
বন্ধ করাই যাক ক্যারম খেলা !
গরম চায়ের কাপ জুড়িয়ে গেছে—
গিয়েছি বেবাক্ ভুলে চুমুক দিতে—
কথায় কথায় গেছে আটটা বেজে,
নেইক সময় মোটে আরাম নিতে।
তোমায় আমার লাগে বেজায় ভালো,
সেই ভালো লাগার কথা জানাই খুলে—
এই খেলার হিড়িকে ঢের বলেছি কথা—
আসল কথাটা রেখেছিলাম ভুলে।



[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ক্লাবের সেক্রেটারী গঙ্গারাম মহা উৎসাহে অভিনয়ের চাঁদা হতে একেবারে একটাকার কাঁচাগোল্লা এনে হাজির করলো।

ক্লাবের মেম্বারেরা জানত না যে, ক্লাব নামে এতটা মাধুর্য্য আছে। আজ সে মাধুর্য্য তারা উপলব্ধি করলো কাঁচাগোল্লার মিষ্ট আস্বাদনে।

কিছুদিন পরে একদিন দুপুরে একাদশী সগর্ব্বে মহোৎসাহে কাকে কোন ভূমিকা দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করছিলেন।

সমস্ত ভূমিকাগুলির বিলি ব্যবস্থা একরকম হয়ে গেল। শেষকালে কিন্তু গোলমাল বাধল নীহারিকার ভূমিকা নিয়ে।

পরাণ বৈরাগী বলে—"আমি নীহারিকার পাঠ করবো।" তারপরে সে দাঁড়িয়ে উঠে বললো—"দেখছ না কেমন বেঁটে সেঁটে ছোট খাট মেয়েলী চেহারা আমার। কিছু মনে করোনা ভায়ারা ও পার্ট আমাকেই মানাবে।"

একাদশী বললো,—"তুমি পাগল হলে নাকি। শিক্ষিতা মেয়েরা আবার বেঁটে হয়? তারা লম্বা হয় হে লম্বা হয়।"

পরাণ বৈরাগী অবিশ্বাসের হাসি হেসে মেয়েলী ঢংয়ে বলে উঠল,—"দেৎ লম্বা হয়।"

নকড়ি হালদার সেই সবে ক্লাব ঘরে ঢুকে হন্ত দন্ত হয়ে বলে উঠলো,—"আরে ও পার্টে যে গান আছে। ও পার্ট আমি ছাড়া কে করবে শুনি। মিছামিছি সব বাজে কথা কয়ে সময় নষ্ট করছো।"

তার কথায় প্রতিবাদ করে একাদশী বললো,—"ও পার্ট তুমি কি করে করবে নকড়ি? নীহারিকা হচ্ছে যাকে বলে আপ-টু ডেট মেয়ে—।"

একাদশীর কথায় নকড়ি ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"হলেই বা আপ-টুডেট মেয়ে। আমি পারব না একথা তোমায় কে বললে! আমি আপটু ডেট মেয়ে দেখিনি মনে করেছ? কোলকাতায় যখন ছিলাম তখন সব জজ ব্যারিষ্টারের মেয়েরা আমার কাছে গান শিখতো। তাদের সঙ্গে কত মেলামেশা করলুম। আর আজ আমি জানলুম না আপটু ডেট মেয়ের কায়দা? আর যত সব কায়দা তোমরা সব জেনে ফেলেছ দেখছি!—তারপর উত্তেজিত হয়ে খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারী করে মুঠি বদ্ধ হাত দুটি একটার পর একটা উঠানামার সঙ্গে সঙ্গে আবার বলতে সুরু করলে—"তাদের পোষাক তাদের ফেশন চলন বলন যাকে বলে মনে গেঁথে রয়েছে—এ।"

'গেঁথে আছে' কথাটী বলে নকড়ি মুষ্টিবদ্ধ একটি হাত অপর হাতের চেটোর উপরে সজোরে টিপে ধরলেন।

—"আমিই নেব নীহারিকার পার্ট" বলে নকড়ি সবেগে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ঠিক সেই সময় লোচন পণ্ডিত ক্লাবঘরে ঢুকছিলেন খুব তাড়াতাড়ি। তাঁর ধাক্কায় নকড়ির রোগা প্যাকাটী দেহখানা সবেগে এসে একাদশীর গায়ে ধাক্কা লাগলো। একাদশী তাতে গড়িয়ে গেল হারাধনের গায়ের উপর। হারাধনের হাতে ছিল সদ্য সাজা হুঁকো। অতর্কিত ভাবে হুঁকোর মাথা নড়ে উঠতে কল্কের জ্বলন্ত টিকেগুলি ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। যাদের গায়ে লাগলো তারা ওরে বাপরে গেলুমরে বলে পরিত্রাহি চীৎকার করে উঠলো। বাকী সবাই আগুন নেবাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

শেষে দোষ হলো লোচন পণ্ডিতের। তার অত তাড়াতাড়ি সামনে না দেখে ঢোকা ঠিক হয়নি। লোচনের

রক্তচক্ষু দেখে সকলে বুঝলো যে তার সেদিন গাঁজার মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গিছল। একাদশী সগর্জ্জনে জানিয়ে দিলেন যে অভিনয়ের দিনে লোচন যেন গাঁজা না খায়।

অনেক বাদানুবাদের পর ঠিক হলো যে নীহারিকার পার্ট নকড়িকে দেওয়া হবে। নকড়িও খুসী হয়ে এক কথাকে তামাক সাজতে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠলো।

গনেশ দাস ইঞ্জিনের ফোরম্যান, সকলের ধারণা—সে ভাল ইংরাজী জানে, তাই বিনা প্রতিবাদে সে মিঃ ফার্ণাণ্ডেজের পার্টটা পেয়ে গেল।

ভোলাময়রার বয়স বিয়াল্লিশ রং কটা আর ভীষণ মোটা। সে আগেই একদিন সের তুয়েক মিষ্টান্ন খাইয়ে প্রস্তাব করে রেখেছিল যেন চপলার পার্টটা তাকেই দেওয়া হয়। ভোলার বয়স হলে কি হয় মুখটী তার বেশ গোলগাল আর মিষ্টান্ন খাবার লোভ আছে তাই ঐ পার্টটী তাকে দিতে কারুর আপত্তি রইল না।

তারপর সকলের মত নিয়ে একাদশী একটা ফর্দ্দ তৈরী করে পড়তে সুরু করলো ;—

দামোদর—লোচন পণ্ডিত

মানময়ী—পরাণ বৈরাগী

মানস—সনাতন মুখার্জ্জী (একাদশী)

নীহারিকা—নকড়ি হালদার

চপলা—ভোলা ময়রা

রাজেন বাউরি—হরেন গোপ

হারানিধি—নন্দখুড়ো

মিঃ ফার্ণাণ্ডেজ—গনেশ দাস

আর ষ্টেজ ম্যানেজমেণ্টের ভার নেবে গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী। সকলে সানন্দে ফর্দ্দটী অনুমোদন করতে একাদশী বললো,—"বাদী, থট মটসিং—এই সব ছোট পার্টগুলো পাড়ার ছোঁড়াদের সাজিয়ে দিলেই হবে।

পরশু হতে যথারীতি রিহার্সাল বসবে স্থির হয়ে যাবার পর সর্ব্বশেষে একাদশী সকলকে জানিয়ে দিলে যে কেউ যেন ঘুণাক্ষরে তার স্ত্রীর কাছে একথা না জানায় যে সে থিয়েটারের খরচা বহন করছে আর সে এই থিয়েটারে প্লে করছে তাহলে ঘরে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে। এইজন্যে সে কিছুদিনের জন্য তার স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেবে।

নকড়ি হালদারের স্ত্রী বাড়ীর সবাইকে খাইয়ে দুপুর বেলা রান্না ঘরে উনুনে পড়ন্ত আঁচে নিজের জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে একটা বাটিচচ্চড়ি রাঁধছিলো।

এমন সময় চাকর রামু রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে হাঁউ মাউ করে চেঁচিয়ে বললো,—"মা বাবুর কি যেন হয়েছে। দেখলেন চুপে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে কি যেন করছেন। বাবুর বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গেল—।"

রামুর ওই অদ্ভুত হৃদয় বিদারক কথা শুনে নকড়ির বউ আর মেয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হতে বেরিয়ে এসে উদ্বিগ্ন হয়ে বললো—"কিরে কি হয়েছে, বল ভাল করে।"

চাকরটী ছিল বাবু অন্ত প্রাণ। তাই সে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো,——'ঘরের কপাট বন্ধ দেখে আমার যেন মা কেমন সন্দ হলো তাই জানালা দিয়ে গিয়ে দেখি—" বাকী কথা তার বিকট কান্নায় চাপা পড়ে গেল।

নকড়ির বউ আর মেয়ে অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। গিয়ে যা দেখলো তাতে তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল।

নকড়ি হালদার তার কন্যা গৌরির পূজার কেনা নতুন শাড়ীটা পরে আয়নার সামনে নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে পায়চারী করছে আর মাঝে মাঝে টেবিলের ওপর খোলা মানময়ী গার্লস স্কুল হতে মিহি সুরে কি যেন বকে যাচ্ছিলো।

নকড়ির বউ ওই ব্যাপার দেখে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলে ;——"ওগো তোমার কি হলো বল না। তুমি পাগল হলে নাকি ?"

অভিনয়ে তন্ময় নকড়ি তখন নাটক হতে মাথা তুলে উদ্ধত সুরে বললো,——"পাগল, পাগল করলে কে আমাকে ! বুঝি না কিছু আমি। ...."

নকড়ির কথা শেষ হবার আগেই তার বউ কান্নাজড়িত স্বরে বললো, —"কি বুঝেছ তুমি বলনা গো."

তার স্ত্রীর কথার উপরই শাড়ী পরা নকড়ি আয়নার

দিকে তাকিয়ে বলে যায়,—"চপলা এসে ঘর গুছিয়ে যায়, চুরী করে গান শেখে। আর আমার সঙ্গে অভিনয়—অভিনয়।"

নাটকে অভিনয় কথার পর 'কাঁদিতে লাগিলেন' লেখা রয়েছে। তাই নকড়ি ও কাঁদতে লাগলো।

আর কোথায় যায়। নকড়িকে কাঁদতে দেখে তার স্ত্রী, মেয়ে ও চাকর সবাই মিলে একসঙ্গে— "আমাদের কি হলো গো———ও" বলে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলো।

নকড়ি বেচারী কিন্তু এ রকমটা প্রত্যাশা করেনি তাই এই সমবেত চীৎকারে একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেল। তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়তে গিয়ে সেফ্‌টিপিন কোথায় আটকান হয়েছে তা খুঁজে বার করতে করতে ইত্যবসরে পাড়ার জনকতক মেয়ে পুরুষ সেখানে এসে হাজির হলো।

পাড়ার মেয়ে মাতব্বর মোক্ষদামাসী এই ব্যাপার দেখে সিধু মোড়লকে ব্যস্ত ভাবে বলে উঠলো—"করছো কি! শিগ্‌গির টেনে বার করে মাথায় জল ঢালো দেখছ না—"

এদিকে নকড়ি শাড়ী না খুলে দরজা খুলতে পারছিল না। দরজা বারকতক ধাক্কা ধাক্কি করা সত্ত্বেও যখন



জল ঢালতে সুরু করে দিলে।

দরজা খুললে না তখন উপস্থিত লোকেরা নায়েব মহাশয়ের হুকুমে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়লো।

নকড়ি বোঝাতে যায় সে সে অভিনয় রিহার্সাল দিচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমবেত গোলমালে তার কথা চাপা পড়ে গেল।

সবাই মিলে তাকে জোর করে বাইরে ধরে নিয়ে এসে মাথায় ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে সুরু করে দিলে।

ঘোষাল গিন্নি—"আমার নন্দাইয়ের ও ঠিক এমনি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়েছিল। সে আর সারলো না।

সে আর সারলো না' এই কথা শুনে নকড়ির স্ত্রী—"আমি আর এ জীবন রাখব না" বলে ঊর্দ্ধশ্বাসে শোবার ঘরের দিকে দৌড়লো।

এই ব্যাপার দেখে মোক্ষদা মাসী নকড়ির স্ত্রীর দিকে ধাবমান হলো।

অনেক জল ঢালার পর নকড়ি ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল। তবু সে ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে আসল ব্যাপারটুকু সকলকে জানাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু জলের ধারায় তার কথা শোনা যাচ্ছিল না। শুধু বড়্ বড়্ করে আওয়াজ হচ্ছিল।

খানিকক্ষণ এই রকম প্রাথমিক চিকিৎসা চলবার পর যখন সবাই আসল ব্যাপারটুকু বুঝতে পারলে তখন কেউ কেউ—বিরক্ত হয়ে নকড়িকে ধমকে দিলে আবার কেউ কেউ রীতিমত উপদেশ দান করে যে যার বাড়ী চলে গেল।

সকলের কাছ থেকে ঠাট্টা বিদ্রূপ ধমকানি শুনে নকড়ির অবস্থা এমন দাঁড়াল যে অবর্ণনীয়।

এর পর থেকে নকড়িকে প্রতিজ্ঞা করে বাড়ীতে রিহার্সাল বন্ধ করে দিতে হলো।

অভিনয়ের দিন গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সকলেই উৎসাহে মেতে উঠেছে। সকাল থেকে জমীদারবাবুর বাড়ীর সামনেকার মাঠে নন্দখুড়ো ও একাদশীর তত্ত্বাবধানে প্যাণ্ডাল টাঙানি ও ষ্টেজ খাটানোর কাজে পাড়ার ছোকরারা লেগে গিয়েছে।

মাঝে জমীদার ত্রিলোচন তালুকদার এসে একবার ভারিক্কিচালে এধার ওধার ভাল ভাবে তাকিয়ে নিয়ে—"ওহে নন্দ, বলি আলোর ব্যবস্থার জন্যে ম্যানেজারের কাছে লোক পাঠিয়েছ ত? মেয়েরা বসবে কোথা? ষ্টেজটা

আর একটু উঁচু করলে'''হোত না?"—প্রভৃতি বিবিধ প্রশ্নে নম্ আর একাদশীকে অস্থির করে তুললেন। তারাও যথাসাধ্য জমীদার বাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলো।

—"ঠিক হচ্ছে না, পালটা আর একটু টেনে বাঁধো,—এই সেরেছে! খুঁটিটা সোজা পোঁতো নি, সবাই পাল চাপা পড়বে যে।' এই সব নানান উপদেশ দিতে দিতে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

বেলা দুটা বাজতেই ষ্টেজ খাটান পাল টাঙ্গানো একদম শেষ হয়ে গেল। একাদশীর প্রস্তাবেই ঠিক হলো যে দর্শকদের বসবার জন্যে সতরঞ্চিগুলো এখন পাতা হবে না। পাতলে ছেলে পুলেরা ময়লা করবে। সেইজন্যে প্লের ঠিক একঘণ্টা আগে ওগুলো পেতে দিলেই চলবে।

কিছুক্ষণ পরে জমীদার মহাশয়ের ম্যানেজারের বাড়ী হতে ছোট বড় নানান আকারে ডে-লাইট এসে হাজির হলো।

সকলের কথা চীৎকার হাসি উল্লাস সবকিছু মিলে মিশে চারিদিককার আবহাওয়াকে আনন্দময় করে তুলেছে।

আগে থেকে খবর পেয়ে অভিনয় মণ্ডপের আশে পাশে পাড়ার কজন বেকার ছোকরা কিছু পয়সা পেটার আশায় বাঁখারী আর দরমা দিয়ে পানের দোকান ও চায়ের দোকান খুলে দিব্বি জাঁকিয়ে বসেছে। আবার এক পাশে দু তিনটে তেলে ভাজার দোকান বসেছে। সেখান হতে খাবারের সুমিষ্ট গন্ধ উৎসবের মাধুর্য্যকে বাড়িয়ে তুলছিল।

মেয়েদের বসবার জন্যে বাঁদিকের অনেকখানি অংশ চিক্ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। পাড়ার মেয়ে মাতব্বর মোক্ষদা মাসী সেই দিককার তত্ত্বাবধানে বিশেষ ব্যস্ত ছিল।

—"ওগো বাছা অমন হাত পা ছড়িয়ে বসলে চলবে কি করে! আরও পাঁচজনকে ত বসতে দিতে হবে।...তুমি বাপু নিজে এসেছ এসেছ আবার একটা পুঁটলি এনেছ কেন? ওবে খেঁদি, তোর আক্কেল কি বলতো? খ্যাপলাকে সামলাতে পারিস না ত নিয়ে এসেছিস কেন? এখন কি করি শিগ্‌গির পরিষ্কার করে ফেল, আমার ওপর ভার আছে বলে আমি ত আর তোর ভায়ের বমি সাফ করতে পারি না?"

অভিনয়ের আর বেশী দেরী নেই। কনসার্ট সুরু হয়ে গেছে।

ওদিকে গ্রীণরুমে যে যার সাজ-গোজে ব্যস্ত। দুতিনটা পেণ্টার ঘেমে নেয়ে হিম সিম খেয়ে যাচ্ছিলো।

একাদশী—"ওহে পেণ্টার ভায়া, আমার মুখে আর এক পোঁচ পেণ্ট লাগিয়ে দিলে ভাল হতো না? এযে নামলেই সব ধুয়ে সাফ হয়ে যাবে।"

পেণ্টার—"আজ্ঞে তা যাবে না, যত ঘামবেন ততই পেণ্টের বাহার খুলবে—"

একাদশী—"না হে নাঃ তার চেয়ে তুমি না হয় পেণ্টের শিশিটা আমাকেই দাও।"

পেণ্টার রঙের শিশি এগিয়ে দিতেই একাদশী মনের সাধে খাবলা খাবলা করে অনেকখানি রং নিজের মুখে মেখে একটা ভুত সেজে বসলো।

একাদশীর সেই বিচিত্র রূপ দেখে হয়ত সবাই হেসে গড়িয়ে পড়তো, কিন্তু অবসর কোথায়! সবাই নিজের নিজের সাজ-গোজ নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত।

নীহারিকা-বেশী নকড়ি থড়মড়ে শাড়ী কোমরে রাখতে পারছিলো না, বারবার তার শাড়ী খুলে আণ্ডার-ওয়ারটা বেরিয়ে পড়ছিল।

সে ধমকে ড্রেসারকে বললো—"একি বাজে শাড়ী আমায় পরিয়েছ..."

ড্রেসার—"কি করবো বলুন, তা বলে চপলার তিনপেড়ে শাড়ীত আপনাকে পরালে মানাবেনা আর মানময়ীর কস্তা পেড়ে শাড়ীই বা আপনাকে পরাই কি করে বলুন? আসুন তা হলে এক কাজ করি—" বলে ড্রেসার নকড়ির কোমরে শাড়ীর ওপর বেশ জোরে একটা ন্যাকড়ার ফালি বেঁধে দিতেই নকড়ির মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠলো।

অভিনেতাদের ভেতর কেউ গম্ভীর ভাবে পায়চারী করতে করতে এসে চট করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফিক্ করে মনের খুশীতে একটু হেসে নিচ্ছে। কেউ কেউ নাটকী সুরে এখন হতেই কথাবার্ত্তা কয়েই গলাটাকে বেশ করে শানিয়ে পরখ করে নিচ্ছে।

সকলের বিচিত্র ভঙ্গী বিচিত্র চেহারা অপরূপ সাজ সজ্জায় রীতিমত বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে।

পিলে চমকান কনসার্ট বাদন তখনও সমানভাবে গর্জ্জন করে যাচ্ছিলো। তার ছেঁড়া বেহালা আর ভাঙ্গা হারমোনিয়ামের হৃদয় বিদারক কান্নার সঙ্গে সঙ্গে ঢোলের বিকট আওয়াজ মিলে মিশে যে আওয়াজ সৃষ্টি হচ্ছিলো তা যারই ভাল লাগুক না যার কিছুমাত্র রসবোধ আছে সে যদি এই কনসার্ট শোনে তাহলে তাকে অন্ততঃ কিছু দিন নিশ্চয়ই ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে।

কিছুক্ষণ বাদে কনসার্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা উঠলো।

যবনিকা উঠতেই দেখা গেল পরিষ্কার আদ্দির পাঞ্জাবী ও কোঁচানো তাঁতের ধুতি পরিহিত মানস মুখার্জ্জি বেশী একাদশী ষ্টেজের উপরে দাঁড়িয়ে একটা দেয়াল হতে নোট-বুকে কি টুকে নিয়ে রীতিমত তড়পাতে সুরু করল।

"চোখ বুজে ঢিল ছুঁড়িতো—" বলেই তিনি একলাফে ফুট লাইটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

প্রমটারের আগের কথাটা শুনতে না পেয়ে তিনি সেই লাইনের শেষের কথাটা অত্যন্ত দুঃখমিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—"হায় হায় পাঁচটা পয়সা গেল।"

দর্শকরা আনন্দে করতালি দিয়ে উঠলো। তারপর—"গ্রাজুয়েট শুনলেই বলে গ্র্যাজুয়েট পোষবার পয়সা নেই।" বলেই উৎসাহের উত্তেজনায় এমন একটি চীৎকার করলেন যে দর্শকরা আবার ঘন ঘন করতালি দিয়ে উঠলো।

একাদশী কেল্লা ফতে করে দিচ্ছে বলে ওদিকে গ্রীণ রুমের ভিতর অন্য অভিনেতারা রেগে লাফাতে সুরু করলো।

নকড়ি আর থাকতে না পেরে—"এবারে আমি যাই বলে তার শাড়ীর আঁচলটা দুলিয়ে ষ্টেজের উপর চলে গেল।

একাদশী নকড়িকে অসময়ে আসতে দেখে বিরক্ত ভাবে বলে উঠলো—"তুমি এখন এলে কেন? এ্যা—" "আহা-হা-আ-করছ কি নকড়ি। তোমার যে ভাই এখনও সময় হয় নি।" বলে লোচন পণ্ডিত দামোদরের পোষাক পরা অবস্থায় নকড়িকে ষ্টেজ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

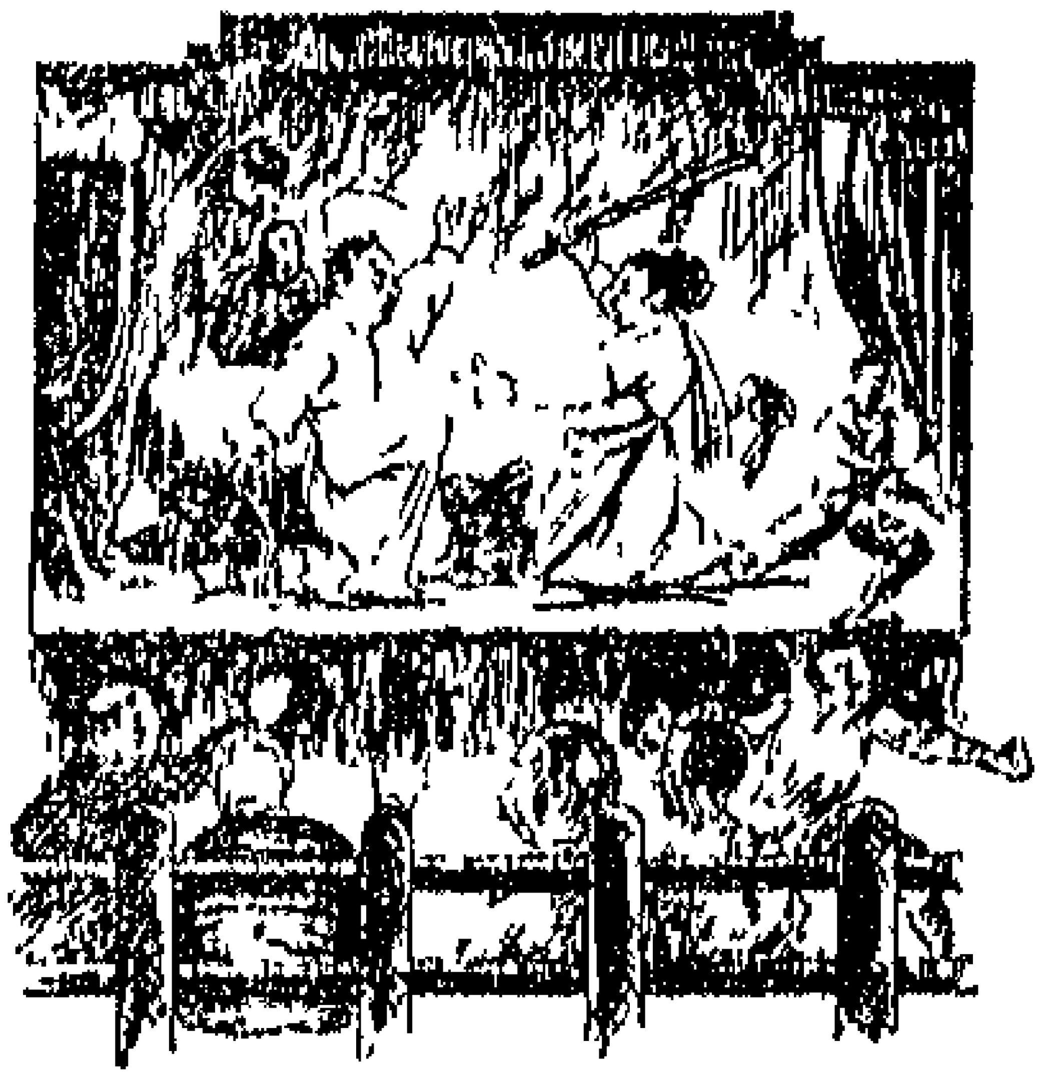
নকড়ি দমবদ্ধ করে উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরেই নকড়ির বেরোবার সময় হতেই ষ্টেজ ম্যানেজার গঙ্গারাম (ক্লাবের সেক্রেটারী) চীৎকার করে উঠলো—"কি করছ নকড়ি। যাও এবার তোমার সময় হলো যে।

নকড়ি সেই সবে চায়ের কাপে চুমুক দিতে সুরু করেছে। ষ্টেজে যাবার কথা শুনে দিগবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে নকড়ি তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ হাতে করেই ষ্টেজের মধ্যে বেরিয়ে পড়লো। আর অমনি দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ হো হো করে হেসে উঠলো। সেই হাসিতেই নকড়ি বুঝল সে কি কিছু ভুল করেছে। অমনি সে এক দৌড়ে গ্রীণরুমে ঢুকে চায়ের কাপটা ফেলে রেখে হাত ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এসেই প্রমটারের প্রমটিং ক্যাচ করেই মানসের দিকে না চেয়ে দর্শকদের দিকে চেয়ে বলে উঠলো,—"দশটাকার জন্যে রোজ তিন ক্রোশ। আর পারি নে।"

দর্শকদের ভেতর থেকে একটী রসিক ছোকরা বলে উঠলো—"না পার ত ঘরে যাও।"

যাক সে কোনরকমে আর একটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ একটা গোলমালের সঙ্গে সঙ্গে সকলে ফিরে দেখলে বেড়া থেকে একটা বাঁশ খুলে নিয়ে রুদ্র ভৈরবী মূর্ত্তিতে একাদশীর স্ত্রী ললিতা সুন্দরী দর্শকদের ঠেলে ঠুলে উল্কাগতিতে



এক লাফে ষ্টেজে উঠে পড়লো।

ছুটে এসে—"তবে রে ড্যাকরা মিনসে" বলে একলাফে ষ্টেজে উঠে পড়লো। উঠেই একাদশীর ঘাড়টী চেপে ধরে অপর হাতের বংশদণ্ডের দ্বারা আচ্ছা করে দুচার ঘা কসিয়ে দিয়ে বললো—"তাই বুঝি আমায় বাপের বাড়ী বিদেয় করা দেওয়া হয়েছিল?"

নীহারিকা-বেশী নকড়ি ব্যাপার দেখে ভয়ে ভেবড়ে গিয়ে পালাতে যাবার সময় আঁচলটা ষ্টেজের খুঁটিতে আটকে গেল। নকড়ি শাড়ী ফেলে ব্লাউজ আর আণ্ডার ওয়ার পরা অবস্থায় উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে গেল।

দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে যারা সাহসী তারা কেউ ললিতা সুন্দরীর হাত থেকে একাদশীকে মুক্ত করতে পারলে না।

একাদশী গিন্নি ললিতা সুন্দরী একাদশীর দিকে রক্ত দৃষ্টি হেনে বজ্র গম্ভীর স্বরে বললো—"দাঁড়িয়ে দেখছ কি? চলো—ও—। "সঙ্গে সঙ্গে আর এক ঘা বাঁশ পেটা।" বলে একাদশীকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ললিতা সুন্দরী সকলের দিকে একবার বজ্রদৃষ্টি হেনে অভিনয় মণ্ডপ ত্যাগ করে চলে গেলো।

—শেষ—

জগতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ

—শ্রীসচী শীল বি-এ

জগতে ডিমক্রেশির আজ বড় দুর্দ্দিন। ফ্যাসিজমের প্রবল আঘাতে ডিমক্রেশি জর্জ্জরিত হয়ে পড়েছে। স্পেনে ঘরোয়া যুদ্ধ বেধেছে আজ দেড় বছর হল। এই যুদ্ধের ফলাফলের ওপর ডিমক্রেশির ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্স যে নীতি অনুসরণ করছে এই ব্যাপারে তাতে মনে হয়, ডিমক্রেশির উদ্ধারের জন্য তাদের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। কোন রকমে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে পারলেই হ'ল।

কিন্তু এইভাবে কতদিন কাটবে? এদিকে যে ফ্যাসিষ্ট অসুরের শক্তি ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। ইটালী ও জার্ম্মাণী এখন মধ্য ইউরোপের ভাগ্য বিধাতা হয়েছে বললেই চলে। সেখানে ফ্রান্সের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। একমাত্র চেকোশ্লোভাকিয়া এখন ফ্রান্স ও রাশিয়ার বন্ধু হিসাবে টিমটিম করছে। রোম-বার্লিন আঁতাতের শক্তি যেন চারধারকার ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোকে চম্বুকের মত টেনে নিচ্ছে। এর ফল হচ্চে এই যে শান্তির আশা ক্ষীণ হয়ে আসছে। ফ্যাসিজমের পুষ্টি মানে যুদ্ধ বাধা। এর শক্তি শান্তিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে বাধা দেওয়ার এবং কাবু করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছে।

ফ্রান্সের সৌহার্দ্য রাখার চেয়ে জার্ম্মাণী ইতালীর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার মধ্যে নিরাপত্তা বেশী আছে। এই ভাবে ফ্যাসিজম ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করছে এ ক'বছর ধরে।

রুমানিয়ার রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন মধ্য ইউরোপে বিশেষ চাঞ্চল্য এনেছে, বিশেষ করে চেকদের মধ্যে। গোগা সাহেব হিটলার-মুসোলিনীর সঙ্গে করমর্দ্দন করেছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন পুরাতন বন্ধুদের তিনি ভুলবেন না। এ যে নিছক ভণ্ডামি। আসল কথা, ডিমক্রেশি তাঁর মনঃপূত নয়, এবং রোম বার্লিনের প্রবল প্রতাপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। Little Entente-এর মেম্বার থেকে ফ্যাসিজমই জিতে আসছে, আর তথাকথিত শান্তিবাদী ডিমক্রেশিগুলো দুর্ব্বলতা দেখিয়া ক্রমশঃ হটে আসছে।

স্পেনে ও চীনে যে যুদ্ধ চলছে সেখানে আসল যুদ্ধ ফ্যাসিজম ও ডিমক্রেশির মধ্যে। চীনে জাপানের অভিযানের পেছনে হিটলার মুসোলিনীর Backing রয়েছে। জাপান বলছে—চীনে Communism ধ্বংস করতে হবে। জার্ম্মাণীর ঐ একই স্বার্থ। রাশিয়া নাকি চীনকে নিজের শিষ্য করে নিতে এগিয়ে আসছিল। তাই জাপানের এই অভিযান।

জগতের শান্তি রক্ষার দিক থেকে শান্তিবাদীদের সাহস ও ক্ষমতা কতটা? এখনও মনে হয় অনেকটা আছে, কিন্তু সবাই এক হলে তবে ত শক্তির মাপ পাওয়া যাবে। এই সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব এখন যুদ্ধের দিকে জগতকে নিয়ে যাচ্ছে।

রোম-বার্লিন এ্যাক্সিসকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে মন্দ হয় না। এর মধ্যে Reality কতটা? হিটলার-মুসোলিনীর স্বার্থটা কি? মুসোলিনী ত জার্ম্মাণীকে পেছনে রেখে চোখ রাঙিয়ে এবিসিনিয়া জয় করে নিলে? কেউ কিছু করতে পারলে না। এখন সে চায় মধ্যসাগরের সর্ব্বময় প্রভু হতে। ইংরেজের সাম্রাজ্যের ওপর দুজনকারই লোভ খুব। জার্ম্মাণী নিজের হারানো কলোণীগুলো আদায় করতে চায়। এদিক দিয়ে মুসোলিনী তাকে খুব সাহায্য করতে রাজী। এধারে কিন্তু আবার জার্ম্মাণী চায় না যে ইংরেজের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বিরোধ বাধুক। বাধলে আবার চতুর ইংরেজ জার্ম্মাণীর সব কটা শত্রুকে এক করে লড়াই করবে। জার্ম্মাণীর উপস্থিত কাম্য হচ্চে পূর্ব্ব ইউরোপে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করা। ইংরেজকে যদি প্রথমতঃ এইদিক দিয়ে রাজী করতে পারে তাহলে পূর্ব্বদিকটা সুরক্ষিত করে তারপর আবার কলোনীর জন্য হুমকী দিলেই হবে। এই হচ্চে তার আসল পলিসি। কিন্তু মুসোলিনীর ইচ্ছা এখনই সে মধ্যসাগর সমস্যার সমাধান করে। ইংরেজ আবার একটু একটু করে নিজের ঘাঁটী সুরক্ষিত করলে ইটালীর আশা নিষ্ফল হতেও পারে। আবার হিটলারের সঙ্গে যদি ইংরেজের মৈত্রী সংস্থাপিত হয় তবে বেচারা মুসোলিনীকে একলা পড়তে হবে। এরকম সম্ভাবনা সে মোটেই বরদাস্ত করবে না। যতদিন ইংরেজের সঙ্গে হিটলারের বিরোধ বজায় রাখা যায়, ততদিন হিটলার-মুসোলিনী প্রীতি-অটল থাকবে। তাই Sig. Gayda কিছুদিন আগে জার্ম্মাণীর হয়ে বলেছিলেন যে, *কলোনী ফেরতের ব্যাপারে জার্ম্মাণীর প্রতি সম্পূর্ণ* সহানুভূতি ইটালীর আছে। ন্যায়ের দিক দিয়ে হিটলারের দাবী অতি সঙ্গত। এই ভাবে হিটলারের মনকে কলোনীর দিকে টেনে রেখে ইংরেজ-জার্ম্মাণ মৈত্রীকে সম্ভব না হতে দেওয়াই মুসোলিনীর উদ্দেশ্য।

হিটলার যদি তাঁর দাবী অনুযায়ী সবটা কিম্বা কতকটা পেয়ে যান তবে মুসোলিনীর হবে কি? আমার মনে হয়, বৃটিশ তার সাম্রাজ্যকে ভেঙে হিটলারকে কিছু দিতে একান্ত নারাজ। এইখানেই রোম-বার্লিন axis-এর reality।

জাপানের অবস্থা যদি শেষে কাহিল হয়ে পড়ে চীনের হাতে, সোভিয়েট সাহায্যের মধ্য দিয়ে—তবে শেষটায় কি হবে ঠিক বোঝা যায় না। জার্ম্মাণী কি তখন জাপানের সাহায্যার্থে এগিয়ে যাবে? এতে তার স্বার্থ কোথায়? বড় লোক চীনে কম্যুনিজম ধ্বংস হবে। তবে একটা কথা। জার্ম্মাণী যদি কলোনী ফেরতের বা পূর্ব্ব ইউরোপে প্রসারের সম্ভাবনা না দেখে ত, শেষ পর্য্যন্ত সে প্রচণ্ড নিনাদে ফেটে পড়বে। অর্থাৎ একটা বড় রকম যুদ্ধ হবে। এই যুদ্ধে সে নিজের দিকে কাকে কাকে পাবে? ইতিমধ্যে যদি জাপান চীনের হাতে ঠাণ্ডা হয়ে যায় তবে প্রাচ্যের একটি শক্তিশালী বন্ধুকে সে হারাবে। জার্ম্মাণী যদি একটু হিসেব করে দেখে ত সে অবশ্যই উপলব্ধি করবে যে যদি একান্ত Explode করতেই হয় ত, তা জাপান বেঁচে থাকতে থাকতে করাই ভাল। এটা অবশ্যম্ভাবী যে জার্ম্মাণীকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে সে Explode করবে। জাপান কাবু হয়ে গেলে ফ্যাসিষ্টদের আর ত্রি-শক্তির সমাবেশ থাকবে না, উপরন্তু রাশিয়া একদিক দিয়ে আরও প্রবল হয়ে উঠবে এবং চীনে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠিত হলে, চীন-রাশিয়ার একত্রিত শক্তি ভবিষ্যতে বিশ্বজয় করবার স্পর্দ্ধা রাখবে; শুধু তাই নয়, যুদ্ধে জাপান পরাজিত হলে ঘরে বিপ্লব বাধবে। এ বিপ্লব Proletarian Revolution ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ এশিয়ার অনেকটা রাশিয়ার আওতায় এসে পড়বে। জাপানী পরাজয়ের পরিণাম এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

এত সব প্রাচ্যে ঘটে যাবার পর তবে কি জার্ম্মাণী যুদ্ধ বাধাবে, যদি কলোনী ফেরত না পায়? তা মনে হয় না। রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের সজ্ঘর্ষ যখন পূর্ণমাত্রায় বেধে উঠবে, তখনই হয়ত হিসাব অনুযায়ী জার্ম্মাণী রাশিয়াকে আক্রমণ করবে। কিন্তু তার আগে যদি কলোনী ফেরত দিয়ে তাকে শান্ত করা যায় তবে সে

জাপানকে সাহায্য করতে মোটেই রাজী হবে না; কারণ desperation কেটে গিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকবার ইচ্ছা তার মনে জাগবে। রাশিয়া যদি প্রবলই হয়ে পড়ে, তবু জার্ম্মানীর ওপর বা তার কলোনীর ওপর রাশিয়ার দিক থেকে অকারণ আক্রমণের কোন আশঙ্কাই নেই। ইউরোপের শান্তি জার্ম্মানীর *Colonial appeasement*-এর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। আর ওদিকে যদি এইভাবে সত্যিই জাপান একলা পড়ে যায়, তবে রাশিয়ার ভয়ে হয়ত হেরে যাবার আগেই সে কোন রকমে সন্ধি করে বাড়ী ফিরে যাবে।

জগতের শান্তি যদি এইভাবে ফিরে আসে তবে রাশিয়ার দেখছি একদিক দিয়ে মস্ত বড় জিত। আবার যুদ্ধ বাধলেও ইংরেজ প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদীদের সমূহ ক্ষতি। ইংরেজ আর সত্যিই যুদ্ধ চায় না। কিন্তু জগত-যুদ্ধ না বেধে যদি শান্তি এইভাবে আসে ত সেই শান্তির পথ চেয়ে *Socialism*-এর অগ্রগতি হবে এটা মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে অনেকেই বুঝতে পারছে। জগতের আবহাওয়া উপস্থিত বড় রহস্যময়। এর পেছনে হয়ত একটা বিচিত্র ভবিষ্যৎ জগতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে।

অসম্পূর্ণ সৃজন।

শ্রীকৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়

নন্দন হইতে শিশু নামিছে ধরায়,
সরলতা মাখা তনু অতনু নিন্দিত,
মুগ্ধ বিশ্ব, অপলকে নেহারে তাহার,
পরশে হরষে সবে হয় উল্লসিত।
সৃজন প্রভাতে যবে ধ্যান মগ্ন দেব,
বিশ্ব সৃষ্টি মহানন্দে হইয়া বিভোর,
সৃজিলেন জীবশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ মানব;
নির্দ্দোষ নবীন ছবি, অনিন্দ্য সুন্দর।
মানব সৃজন বীজ হ'য়ে অধিকারী,
চায় সৃষ্টি করিবারে অনুরূপ ছবি,
আনে মর্ত্ত্যে অমরার সুধা অপসরি,
বিফলে ব্যথায় ভরে অনুতপ্ত হৃদি।
মর্ত্ত্যের গ্লানিমা হ'তে স্বরগের দেবে,
কিন্তু যদি, নাহি পারে রাখিতে অম্লান;
সৃজন বিফল হয়, পশুত্বই লভে,
স্বরগের সুধা হয় গরল সমান।
শৈশব কুসুম যদি সৃজিত স্বভাবে,
অনুকূল আলো হোতে, হোত বিকসিত;
হিংসা, দ্বেষ, লোভ আদি না থাকিত তবে,
কোন পাপ, মর্ত্ত্য হো'ত স্বর্গে পরিণত।

বন্ধুর চিঠি

—শ্রীমতী গৌরী রাণী দেবী

বন্ধু—

তোমার চিঠিটি, পেয়েছি
গত শনিবার, সাঁঝের বেলা,
লিখিব যে চিঠি, সময় পাইনা,
ভাবিছ তোমারে করি গো হেলা !
নববধূ মোর কেমন হয়েছে,
চিঠিতে, তা তুমি জানিতে চাও,
জানাতে পারি' তা, এখুনি লিখিয়া,
তুমি যদি মোরে অভয় দাও,
দেখিতে সে বেশ, 'ফেস্‌কাট্' ভালো,
তন্বী, সুশ্রী, আপ্-টু ডেট্,
তার শির থাকে সদা, উন্নত,
মোর শির থাকে সতত হেঁট,
প্রত্যহ সাঁজে যায়, সিনেমায়,
তাড়াতাড়ি 'ষ্টোভে' চা' যে করি,
চেয়ারে বসিয়া, চা' সে, পান করে,
মনে মনে আমি 'দুর্গা' স্মরি
সাড়ে নয়টার ঘণ্টা, বাজিলে
'ট্যাক্সি' আসিয়া দাঁড়ায় যবে,
তাড়াতাড়ি আমি, ব্যাগ হাতড়াই,
মিটারে' যা ওঠে দিতে ত হবে ?
মাসতুতো ভাই, পিসতুতো ভাই—
কত 'ভাই' এসে আজও জুটে,
সুখেতে তাহারা বেরিয়ে বেড়ান,
আমি ঘরে ভাই সেজেছি মুটে,
চাকরিটা বুঝি থাকে নাকো আর,
ঘরেতে চাকর সেজেছি এবে,
'আলোক প্রাপ্তা' বউ ঘরে এনে,
বসে, বসে, আজ মরছি ভেবে,
'ট্যাক্সি-ফেয়ার' দিতে দিতে ভাবি—
'ফেয়ার' বুঝিবা হ'য়েই যাই,
যাহা কিছু ছিল, নগদ অর্থ
আজ হাতে নাই, সিকি, ও পাই,
তাই ভাবি বসে, সুখেতে থাকিতে,
ভূতেতে, কেন যে মারে গো করে,
এখন ভাবি যে, কোন সুখ নাই—
একা সুখেছিনু 'মেসের' ঘরে
ঘরে কেহ নাই বেড়াতে গিয়াছে,
যায় প্রতিদিন সাঁজের আগে,
তোমাকে বসিয়া, চিঠি লিখিতেছি,
কত কথা আজ, মনেতে জাগে,
শাঁখও বাজে না, সন্ধ্যা বেলাতে,
প্রদীপ জ্বলেনী, ঘরের মাঝে,
তীব্র আলোতে চোখ, ঝলসায়,
সাঁজ হ'লে, ঘরে, বেহালা বাজে,
প্রিয়ার হাসিতে সুধা, ঝরে কিনা
চুড়ির, আওয়াজ কেমন মিঠে
সে সব বন্ধু, দুদিনের তরে,
সে সব কবিত্ব, দু'দিনে মিটে,
মনে পড়ে আজ, মা, ও ঠাকুমাকে,
অতীতের ছবি, নয়নে ভাসে,
প্রগতির এই, দুর্গতি হেরি,
নয়ন মুদি গো, দারুণ ত্রাসে।

প্রেমোপাখ্যান

—শ্রীবিশ্বাম্বক ভট্টাচার্য্য

অতসী প্রেমে পড়লো......

কার প্রেমে এবং কেমন ক'রে পড়লো সে কথা আমি আপনাদের পরে বলছি, কারণ সেটা গৌণ। তবে এ গল্পের মুখ্য কথা হচ্ছে যে, অতসী প্রেমে পড়লো। প্রেমে না পড়ে তার উপায় ছিল না কারণ সে না জেনে প্রেমে পড়েছে। একেবারে না জেনে সম্পূর্ণ অতর্কিত অবস্থায়, যেমন লোকে অন্ধকারে খানায় পড়ে। তাই অতসীকে এ আঘাতটা বেজেছিল খুব।

অতসী কি রকম মেয়ে শুনতে চান? অত্যন্ত সুন্দরী, চমৎকার আদব কায়দা, অদ্ভুত সঙ্গীত নিপুণা, আর আশ্চর্য্য বাক্‌পটিয়সী। যে তার প্রাত্যাহিক জীবন যাত্রার চার পাশে কঠিন কাঁটার বেড়া দিয়ে রেখেছে, যার কাছে পৌছতে হ'লে প্রত্যেক মানুষকেই একটা পরমতম দুর্গতির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে হবে—সেই অতসী কিনা একদা সন্ধ্যায় আবিষ্কার করলো যে সে প্রেমে পড়েছে। এ কথা—আবিষ্কার করার মধ্যে অতসীর ছিল না কোন আশ্বস্তি কারণ সে জানতো।

আচ্ছা গল্পটাই আমি আগে বলি তবে।

(২)

অনেক দিন আগে এই কোলকাতায় কোন একটি মেয়ে এসেছিল নিজের বাপের বাড়ী থেকে পালিয়ে তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে। সেই অক্ষম প্রেমাস্পদটি কিছুদিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত সনাতন ভাবে মেয়েটির সঙ্গে জীবন কাটিয়ে একদিন বেড়াতে বেরিয়ে আর বাড়ী ফিরলো না। আর একটী মেয়ে তখন সেই মেয়েটির কোলে। মেয়েটি অসহায় ভাবে দু'চার দিন কেঁদে উপায়ান্তর না দেখে এদিককার জীবনের চওড়া রাস্তাটাই ধরলো......

সেই কোলের মেয়েটিই আমাদের গল্পের নায়িকা অতসী। হ্যাঁ, অতসী বেশ্যাই। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? বেশ্যা মানেই তো আর অস্পৃশ্য নয়—বেশ্যা মানে বেশ্যা। তবে অতসী যদি আজ নিজের বেশ্যাত্ব অস্বীকার করে বলে—না আমি বেশ্যা নই, তবে আপনার আমার সাধ্যও নেই যে কথা প্রমাণ করবার। অনায়াসে তখন তাকে মালবিকা বাসন্তিকার সঙ্গে এক পর্য্যায়ে ফেলে তার নামে কবিতা লিখতে কারুর কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ হবে না।

কিন্তু তা সে করেনি। অর্থাৎ আপনাদের ঠকানো তার ইচ্ছা নয়। সে প্রকাশ্য ভাবে রাসবাগানে একখানি বাড়ী ভাড়া নিয়েছে। প্রকাশ্য ভাবে প্রতি রাত্রে নতুন নতুন অতিথি নিয়ে রীতিমত গান বাজনা করছে। কারণ সে বেশ্যা। এই সত্যকে জীবনে সে অস্বীকার করে না।

(৩)

অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য গান বাজনা করা বেশ্যাদের রেওয়াজ। ভাল গাইতে আর ভাল কথা কইতে না পারলে ভাল পসার হবে না,—এ একেবারে জানা কথা। কিন্তু অতসীর সম্বন্ধে ও সব কোন কথাই খাটবে না, কারণ সে বেশ চমৎকার গায়। সত্য কথা বলতে—ওর কাছে যত লোক যেত—তার মধ্যে শতকরা পঁচানব্বইটি লোকের আকর্ষণই ছিল গান শোনার আকর্ষণ।

ফোনে তাকে আগে থেকে বলে না রাখলে আশা ভঙ্গের দুঃখ প্রাপ্তি অনিবার্য্য। সেদিন সন্ধ্যায় তাই তাকে দেখা গেল সে একটু বেশী রকম প্রসাধন করেছে। কোন পল্লীগ্রামের জমীদার নাকি আজ আসবেন তার গান শুনতে, সঙ্গে থাকবে বন্ধুর দল। তাই অতসী দেহটাকে আর একটু বেশী ধারালো ক'রে অপেক্ষা করছে তাঁদের জন্য।

(৪)

কারণ পল্লীগ্রামের জমীদার বধ করার মধ্যে বেশ একটু এ্যাড্‌ভেঞ্চার আছে। তাই—।

যাঁরা ঘরে ঢুকলেন—তাঁদের মধ্যে সকলেরই বয়স হয়েছে, কেবল একটি যুবক ছিল পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের বেশী কিছুতেই যার বয়স নয়। অতসী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রে আনলো।

প্রধান অতিথি এবং উদ্যোক্তা রামজীবনবাবু, গোলাপগঞ্জের জমীদার। বয়স হবে বছর পঁয়তাল্লিশ। একটু হেসে বললেন—দেরী ক'রে বৃথা সময় নষ্ট ক'রে লাভ কী। গান হোক।

অতসী একটু মাথাটা হেলিয়ে হাসি মুখে হারমোনিয়ম টেনে নিলো। তারপর সুরটা মনে মনে ভেঁজে নিয়ে গান ধরলো—

মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি
কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে।

অতিথির দল বিমূঢ়ের মত বসে রইল। মুহূর্ত্তকালের জন্য একথা তারা ভুলে গেল যে এটা বারবণিতার প্রমোদ-কক্ষ, এবং গান গাইছে সেই মেয়ে যার প্রতিরাত্রের পাথেয় হচ্ছে পুরুষের সীমাহীন উচ্ছৃঙ্খলতা আর অত্যাচার, নিজের সামর্থ্য বিক্রয় করে যে অর্থ উপার্জ্জন করে। কী যাদু ছিল অতসীর কণ্ঠে, তা জানিনা, কিন্তু রামজীবনবাবুর দলের সামনে মদের বোতল খোলাই পড়ে রইল, গেলাসে ঢেলে খাবার দৈহিক শক্তিরও আজ যেন তাঁদের অভাব ঘটলো। গান শেষ হয়ে গেল, রামজীবনবাবু বললেন—বাঃ। বহুকাল শুনিনি এমন গান। অতসী তার মাথাটা একটু নোয়ালো।

রামজীবনবাবুদের দলের সঙ্গে যে অল্প বয়স্ক ছেলেটি এসেছিল, দেখা গেল সে একদৃষ্টে সূর্য্যমুখী ফুলের মত অতসীর মুখের দিকে চেয়ে আছে। সে চাওয়ার মধ্যে কি ছিল কে তা বিশ্লেষণ করবে? দু একবার অতসীর চোখও তার দিকে পড়লো, দুজনেই দেখলো। রামজীবন বাবু বলে উঠলেন—

—ওহে অমিয়। এবার তুমি একখানা গাওত দেখি বাবা।

—আপনি গাইতে পারেন? অতসী জিগ্যেস করলো।

—হ্যাঁ, সামান্য একটু আধটু পারি।

—অমিয় গান আরম্ভ করলো। যেমন অসামান্য তার কণ্ঠ তেমন অসাধারণ তার দরদ। অতসী সরে এসে তার গা ঘেসে বসলো, তারপর অমিয়র মুখের দিকে চেয়ে বললো—আমি নাচবো?

এই প্রস্তাবে অতিথির দল একেবারে হৈ হৈ করে উঠলো। নাচো-নাচো-নিশ্চয়ই নাচবে। ঘুঙুর কোথায়-ঘুঙুর? ঘুঙুরের দরকার নাই, গম্ভীর কণ্ঠে অতসী বললো আমি এমনি নাচবো।

তারপর অমিয়র গানের সঙ্গে অতসী যে নাচ নাচলো তাকে নাচ কিছুতেই বলা চলেনা, তাকে বলতে গেলে বলতে হয় নৃত্যময় আত্মনিবেদন। সমস্ত তনু দেহকে লীলায়িত ক'রে অতসী যেন কী একটা নিবেদন ক'রে দিতে চায়, কী যেন একটা অকথিত বাণী—একটা গোপন মর্ম্মবেদনা আজ অতসী উজাড় ক'রে দিতে চায়-তার এই নৃত্যছন্দের মধ্য দিয়ে। একটা দুটো একটা নয়—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চললো নাচের পর নাচ।

নাচতে নাচতে অতসীর মুখ চোখ উঠলো আরক্ত হ'য়ে সমস্ত শিরা-উপশিরা ক্লান্তির বেদনায় টনটন করতে লাগল অমিয়ও আর পারছে না, তার স্বরেও নেমেছে একটা ক্লান্তির আমেজ। তবুও গান আর থামলোনা—চলতে লাগলো সমান ভাবে।

হঠাৎ এক সময় দুজনে লক্ষ্য করলো, মাতালের দল ইতিমধ্যেই যে যার আসনে বুঁদ হ'য়ে ঢলে পড়েছে। মদের বোতল সব কটাই খালি, ঘর জোড়া বিছানায় ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অচেতন। অতসী চাইলো অমিয়র মুখে, অমিয় সে দৃষ্টির মধ্যে কী অনুভব করলো কে জানে, সে মাথা নীচু করলো। অতসী বললো, রাত্রি অনেক হয়েছে, খাবেন কিছু?

—না। অমিয় বললো।

—একটু চা?

—না। অমিয় বললো।

—চলুন তবে ছাদে যাই। আজ বড্ড গরম, ফ্যানের হাওয়া যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না।

—চলুন

অতসী আর অমিয় ছাদে উঠে এলো। অন্ধকার রাত্রি ভরে অসংখ্য তারা, মৃদু একটি বাতাস বইছে,—

পাড়ার কোথায় কোন বাড়ীতে এখনও পুরো উদ্যমে গান বাজনা চলছে। ঘুঙুরের রোল আর তবলার চাঁটির শব্দ ভেসে আসছে। কোন্ হতভাগিনীর এখনও দুঃখ নিশার অবসান হয়নি কে জানে!

—অমিয় বাবু! অতসী ডাকলো।

—বলুন।

—আপনি কি করেন?

—পড়ি।

—পড়েন! ও! আপনি তাহ'লে ছাত্র। কী পড়েন?

—এম-এ

—আপনাকে এঁরা এখানে কেন ধরে এনেছেন বলবেন?

—আপনাকে আমার গান শোনাতে।

—সত্যি শোনবার মতই গান বটে আপনার।

অমিয়বাবু।

—কী বলুন।

—আমাকে কেমন লাগলো আপনার

—বেশ। আপনি খুবই সুন্দর দেখতে।

—সত্যি! ভাল লেগেছে তবে আমাকে আপনার।

—হ্যাঁ।

আবার দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পাশের বাড়ীতে দম্ দম্ ক'রে হঠাৎ মারের আওয়াজ উঠলো—আর সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ের আকুল কান্না। অনেকক্ষণ ধরে—নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে সেই কান্না ভেসে বেড়াতে লাগলো। তারপর সব চুপচাপ।

—অমিয়বাবু।

—বলুন।

—কালকে আসবেন আমার কাছে।

—কেন।

অতসী হঠাৎ থেমে গিয়ে ঢোক গিলে বললো—এমনি।

—না।

—না—কেন।

—এখানে আসার আমার কোন দরকার নেই বলে।

—ও। আচ্ছা, আপনার বন্ধুরা যদি আবার কোনদিন আপনাকে এখানে আনতে চান-আসবেন?

—তা বলতে পারছিনে।

—ও! আচ্ছা!

—চলুন নীচে যাই।

—চলুন।

মাত্র এইটুকু কথোপকথন-এরপরই অমিয় নেমে এলো রাস্তায়।

পরদিন সন্ধ্যায়...

অতসী তার নিজের ঘরে শুয়ে আছে, উপুড় হ'য়ে। দু'চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছে। মা এসে ডাকলেন—ওরে অতসী দরজা খোল্—আজ কি কাপড় চোপড় পরবিনে।

ঝি এসে ডাকলো—দিদিমনি দরজা খুলে বাথরুমে যাও; আমি সব গুছিয়ে ঠিক করে রেখে এসেছি।

কিন্তু হায় তবু অতসী দরজা খুললো না। তবে কি অতসী প্রেমে পড়লো। প্রেমে পড়লো অতসীর মত শাণিত যৌবনা নারী। কোথায় ছিল এই প্রেম, অন্তরের কোন গহনতম বন্দরে আত্মগোপন ক'রে। মরা নদীর দুই কূলে উপচে উঠছে আজ যার বন্যা বেগ!

দরজা খোল অতসী, দরজা খোল; উঠে বাথরুমে গিয়ে গা ধুয়ে এসে—তোমার নৈশ প্রসাধন সমাপ্ত করো। আজ হয়ত আসবে কোন অশীতিপর স্থবির বৃদ্ধ, নিজের শক্তিহীনতার কদর্য্যতা তোমার কাছে উদঘাটন করতে, তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে এখন থেকেই নিজেকে প্রস্তুত রাখো তুমি! সহস্র পথ চলা পথিকের মধ্যে যে একটি পথিক তোমার মনোহরণ করেছিল এই সুবিশাল জন সমুদ্রে আজ তাকে কেন খুঁজে মরছো?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। দালাল আসছে বুঝি। ওঠো অতসী—ওঠো। সুন্দর মুখখানা জলে ভেসে যাচ্ছে তোমার। এরপরে প্রসাধনের রং তো সেখানে ধরবেনা। ওঠো অতসী!

বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস

—শ্রীনলিনীকুমার নাগচৌধুরী

আমরা বাঙালী—আমাদের জাতীয় সাহিত্য এই তিন প্রতিভা মণির দ্বারা অলঙ্কৃত। যে প্রতিভা দীর্ঘকালস্থায়ী, যাহা দেশকে জাতিকে এমন কি বিশ্বের স্পন্দন-তন্ত্রীকে এক নব ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করিতে পারে, তাহা এই তিন শিল্পীর মধ্যে আমরা যেমন পাইয়াছি, অন্য কোথাও পাইয়াছি কিনা জানি না। রবীন্দ্রনাথের বিরাট বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা শুধু বাঙলার ছায়ায়মান সীমারেখাই অতিক্রম করিয়াছে, এমন নহে, তাহা ভারতের সমুচ্চ হিমালয়-গিরি, তাহার অনন্ত জলধি ছাপাইয়া পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য-কুঞ্জে বিভাসিত হইয়াছে।—সাহিত্যের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে সেই সব লেখকই প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া আদৃত হইবেন, নিখিলের চেতনার সঙ্গে নিজেদের ভাব-সম্পদকে যাঁহারা মিশ খাওয়াইতে বা নিজেদের দেশকে নব প্রাণে সঞ্জীবিত করিতে পারিয়াছেন। যাঁহাদের ভিতর এই দুইটী বিশেষত্ব নাই, তাঁহাদের রচনা সাহিত্য-পদবাচ্য হইলেও, বিপুল কালাম্বু পথে জল-বুদ্বুদের মতই অদৃশ্য হইবে।

ভাষা ও ভাব লইয়াই সাহিত্য। তাহার দর্পনে জাতির যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই তাহার স্বরূপ; সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব জাতির মধ্যে সচরাচর তিন শ্রেণীর সাহিত্যিকের সহিতই আমাদের পরিচয় ঘটে।

১। এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন, যাঁহাদের চিন্তাধারা দেশকে অতিক্রম করিয়া জগতের চিন্তাধারার সহিত সংশ্লিষ্ট; যেমন সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ।

২। আর এক শ্রেণীর আছেন, যাঁহাদের চিন্তাস্রোত স্বদেশের ভাবধারাকে ছাপাইয়া গেছে; যেমন বঙ্কিমচন্দ্র।

৩। তৃতীয় পর্য্যায়ের সাহিত্যিক তাঁহারা, যাঁহাদের সাহিত্য কেবল পরম আনন্দ দান করে; যেমন শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্র তৃতীয় পর্য্যায়ের সাহিত্যিক হইলেও—বঙ্কিমের সাহিত্য-সোপানের পাশেও কোনো কোনো বিষয়ে তিনি স্থান পাইবার যোগ্য—প্রতিভার বিপুল ব্যাপকতার দিক হইতে নহে, নিছক উপন্যাস রচনার দিক হইতে। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের যে মায়াবিনী সাহিত্য বীনা নিখিলের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত, সেই সুরের তালে তালে পা ফেলিয়া চলিবার যোগ্যতা না থাকিলেও তিনি যে অন্তত তাহার কিছু কাছাকাছি গিয়াছেন—এমনও সাহস করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু সে কেবল উপন্যাসে।

যে রকম প্রতিকূল অবস্থা ও বাধাবিপত্তির মধ্য হইতে শরৎ-প্রতিভা-সূর্য্য আলো বিকিরণ করিয়াছে, অন্য কোন প্রতিভা-তর্পনের দ্বারা তাহা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ।—বঙ্কিমের সময়ে বঙ্কিমের বিকাশোন্মুখ প্রতিভা-পথে কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না—শক্তিশালী বটবৃক্ষের মত পৃথিবীর কঠিন প্রস্তর-পথ ভেদ করিয়া যে শক্তি তাহার আলোতে প্রতিভাত হইয়াছিল;—সেই শক্তি অভিনব মূর্ত্তিতে ও বিচিত্র ভাবে আরো বিরাট হইয়া দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে; এই দুই হিমাদ্রি-শক্তির প্রচণ্ড সংঘাতের ভিতর হইতে যে শরৎচন্দ্র মাথা তুলিতে পারিয়াছিলেন, কম বাহাদুরের কথা নহে; প্রতিভার ইহাও একটা রূপ।

বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্ব তাহার ঘটনা-বিন্যাস। শরৎ-উপন্যাসের প্রধান গুণ তাহার চরিত্র; রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য—তাহার ভাব-সম্পদ।—যখন আমরা বিষম উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবিতেছি, নগেন্দ্রর প্রাণতোষিণী সূর্য্যমুখী আগুনে দগ্ধ হইয়াছে, আর আসিবে না, সেই সময় বা তাহার কিছু পরে সেই সূর্য্যমুখীকে আনাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যখন আমাদের মনকে প্রতারিত করিয়া ঘটনা কৌশল প্রদর্শন করিতেছেন, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "শচীশ" ও "দামিনী"কে ভর করিয়া রূপ ও অরূপের তত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত; আর শরৎচন্দ্র বিবাহিত পার্ব্বতীকে সমস্ত লোক-লজ্জা সমস্ত শঙ্কা ও অপমান ভুলাইয়া বাল্যবন্ধু দেবদাসের মৃত্যু-শয্যা-পাশে উন্মাদিনী অবস্থায় আনাইয়া চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশে উদ্যত।

বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনার সাহায্যে চরিত্রে রং ফলাইয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ জটিল প্রব্লেমের উপর ভর করিয়া চরিত্র আঁকিয়াছেন; শরৎচন্দ্র সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া হৃদয়াবেগের সহিত চরিত্র-বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

বঙ্কিমের চরিত্রগুলি দেশীয় হইলেও, তাহাদের মধ্যে অনেককে আমরা ঘরের করিয়া লইতে পারি নাই, হৃদয়ে রেখাপাত ও আমাদের দুই অক্ষি-পল্লবকে সলিলাভিসিক্ত করিয়াও পরক্ষণেই তাহারা প্রাতস্তারার ন্যায় অবলুপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রসমূহ দেশীয় হইলেও তাঁহার সমস্যাবিজড়িত উচ্চ তত্ত্বের কাছে তাহারা যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার যে চরিত্র-সৃষ্টি-পটুতা নাই—একথা বলি না।

বঙ্কিমের সূর্য্যমুখীতে যে গভীর pathos ফুটিয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের "দামিনী"তেও তাহার বিন্দুমাত্র অভাব নাই; সত্যের অপালাপ না করিয়া বরং বলিতে পারি, সূর্য্যমুখীকে দামিনী অতিক্রম করিয়াছে।—বিচিত্র ঘটনার মধ্যে ঘরের বউ হইয়া সূর্য্যমুখী বিকশিত, কিন্তু সেই ঘরেরই বউ হইয়া জটিল প্রব্লেমের মধ্য হইতে দামিনীর জন্ম। প্রথমা আমাদের কাঁদাইয়াছে, দ্বিতীয়া কাঁদাইয়া আমাদের হৃদয়ে আসন অধিকার করিয়াছে।

শরৎবাবুর চরিত্রগুলি শুধু দেশের নহে, ঘরেরও; ঘরের বলিয়াই এত হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে। সূর্য্যমুখী ও দামিনীর পাশে "সাবিত্রী," "পার্ব্বতী," "বিজয়া" প্রভৃতিও কম রেখাপাত করে না।

সূর্য্যমুখীর প্রাণবস্তু তাহার পাতিব্রত্য—বঙ্কিমের অনবদ্য লেখনী মুখে তাহা অপূর্ব্ব হইয়াছে, কিন্তু আসলে তাহার মূল্য অনেক কম। রমণীর পাতিব্রত্য স্বাভাবিক, তাহাতে আমরা আনন্দিত হইতে পারি, কিন্তু বিস্মিত হইতে পারি না।—বিবাহিত পার্ব্বতী দেবদাসের মৃত্যু বাসরে অঝোরে কাঁদিল; স্বামীর ভালবাসা তাহার সেই বাল্য ও কৈশরের ভালবাসাকে মুছিতে পারিল না; ভালবাসার ইহাও আর এক অভিব্যক্তি, সূর্য্যেমুখীর ভালবাসা এই অভিব্যক্তির পাশে অনেকটা ম্লান বলিয়াই মনে হয়।—কিন্তু তবুও পার্ব্বতী সূর্য্যমুখীকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিল না, বঙ্কিমের যাদুকরী লেখনী তাহাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী করিয়া রাখিল।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের "বড়দিদি" দুর্গেশনন্দিনীর "আয়েষা" চরিত্রকে একটু ম্লান করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।—বিধবা বড়দিদি বাড়ীর অপর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মাষ্টারমহাশয়েরও তত্ত্বাবধান করিতেন; সাক্ষাতে নহে, অসাক্ষাতে। তরুণী বিধবার সেই নিত্য কর্ম্মের ভিতর দিয়া একটা ভালবাসার ছায়া তাহার তরুণী-হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিল—মাষ্টার-মহাশয়ের রোগশয্যাপাশে শেষে সেই ভালবাসা এক অস্পষ্ট এবং এক অব্যক্ত সঙ্গ-লিপ্সার দাবি করিয়া বসিল।

বড়দিদি বাহির হইলে দুই-একজন নিন্দাও করিয়াছিলেন; প্রশ্ন তুলিয়াছেন, বড়দিদির পবিত্র প্রণয় শেষে অমন কামে পরিণত হইল কেন?—বাঙালী সংসারে বড়দিদিদের দিক হইতে ইহা নিয়ম অন্যায় বলিয়া ভাবিয়া লইতে পারি, কিন্তু মানব-মনের দুর্নিবার দাবির যে চিরসত্য অভিব্যক্তি বড়দিদির "বড়দিদিত্ব"কে ছাপাইয়া বিশ্বের দুয়ারে ফাটিয়া পড়িয়াছে তাহাকে কেমন করিয়া অস্বীকার করিব? সে দাবি নিছক গল্পের উপর ভর করিয়া থাকিতে পারে না, মানব-মনের তাহা চিরন্তন ক্ষুধা।

আয়েষার মধ্যেও এই রকম দাবি শিকড় গাড়িয়াছিল—বন্দী জগৎসিংহের রোগশয্যা-শিয়রে বসিয়া দিনের পর দিন সে যখই তাহার সেবা করিয়া যাইতেছিল, তখন ঘুণাক্ষরেও কেহ ভাবে নাই, এই অযাচিত ভালবাসা—"এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর" বলিয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিবে।—কিন্তু বড়দিদি বিধবা, আয়েষা কুমারী; কুমারীর মধ্যে এইরূপ প্রণয়-বীজ অঙ্কুরিত হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে; তবে তাহার বিচিত্র আত্মপ্রকাশ মনস্তত্ত্বের সুন্দর বিশ্লেষণ—এখানে আয়েষা অতিক্রম করিয়াছে।

কিন্তু বিধবার মধ্যেও যে এইরকম ক্ষুধা সঞ্জীবিত হইতে পারে,—তাহা "বড়দিদি" চোখে আঙুল দিয়া দেখাইল। মনস্তত্ত্বের এই বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্র অদ্ভুত নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন—দরদী লেখক বলিয়া তাঁহার যে খ্যাতি—তাহা সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু বড়দিদি আয়েষাকে অতিক্রম করিল কি ভাবে? সুদর্শন যুবক জগৎসিংহের রূপমোহই যেন আয়েষাকে উন্মাদ করিয়াছিল; জগৎসিংহ যদি কুৎসিত হইতেন, তরুণী আয়েষার চম্পক-করাঙ্গুলীতে সেবার সুর বাজিয়া উঠিত

কিনা সন্দেহ। বড়দিদি মাষ্টারমহাশয়ের রূপ চাহে নাই, রূপ ছিল কিনা তাহাও আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই; সে চাহিয়াছিল একটা রক্তমাংসের শরীরকে ভালবাসিতে, তাহার সেবা করিতে, তাহার সাহচর্য্য-পরশে প্রাণটাকে শীতল করিতে।

দুইজনের ক্ষুধা এক হইলেও সেই ক্ষুধা মিটাইতে নবাব-দুহিতার শক্তি ছিল, বড়দিদির ছিল না। সেই শক্তি শাসন ও অর্থএর উপর প্রতিষ্ঠিত; তাহার উপর জগৎসিংহ বন্দী, অসহায়। কিন্তু বাঙালী সমাজের দৃষ্টিকঠিন বেড়াজাল ভেদ করিয়া নিজের দাবিকে চরিতার্থ করিবার ক্ষমতা বড়দিদির ন্যায় নিঃস্ব বিধবার ছিল না; সেই দিক হইতে তাহার বেদনা গভীরতর। রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়েও" যেন এই রকম একটা দাবি অস্পষ্ট ছায়াপাত করিয়াছে। তবে হয়ত তাহাতে কামের লেশমাত্র নাই। ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের প্রণয়িনী খাদিজাও এই দাবির বশবর্ত্তী হইয়া মহম্মদকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেক্সপীয়রের Measure for measure নাটকে দেব-চরিত্র এ্যাঞ্জেলো সুন্দরী ইশাবেলার গুণে প্রথমে মুগ্ধ হইয়া পরে তাহার সাহচর্য্য-কামনা করিল।—মনস্তত্ত্বের দিক হইতে "বড়দিদিতে কোনো দোষ নাই; তাই এতগুলি নমুনা দিলাম।

বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস সমূহ নিছক বাস্তবতার উপাদানে গঠিত নহে, কিছু কল্পনা ঘেষা। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি বেশির ভাগ দুরূহ তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যেন স্বপ্নময় হইয়া উঠিয়াছে। দুইজনের কথা-সাহিত্যে তাই কিছু কৃত্রিমতার ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু শরৎবাবুর উপন্যাসগুলির বাস্তবতার রাজ্যে বাস; হয়ত অপর দুই ঔপন্যাসিকের তুলনায় তাঁহার উপন্যাসরাজি একটু কম আদৃত হইবে। কিন্তু তাঁহার উপন্যাসে কৃত্রিমতার নাম-গন্ধ নাই, তবে উচ্ছ্বাস থাকিতে পারে। অন্তত অন্য দুইজনের অপেক্ষা কৃত্রিমতা অল্প—এ কথা নির্ভয়ে বলা চলে।

অলৌকিক কল্পনাবলে ও বিদেশী সাহিত্য সম্পূর্ণ হজম করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসএর মাল-মসলা যোগাড় করিয়াছেন। হজম করিবার ক্ষমতাও একটা গুণ; তবে তিনি একেবারে আমাদের মনকে প্রতারিত করিতে পারেন নাই—স্থানে স্থানে বিদেশী সাহিত্যের ছাপ প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি তাঁহার বিরাট পাণ্ডিত্য, বিপুল অভিজ্ঞতা ও মনোময় কল্পনার পরিচয় প্রদান করে। যাহা দেখিয়াছেন, যাহা শুনিয়াছেন—তাহাকেই প্রাণবন্ত করিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যাহা প্রত্যহ দেখি, যাহা প্রত্যহ শুনি,—তাহার দিকে মন সহজে টলে না, তাহার আকর্ষণ জনিত আনন্দের রস অনেকটা মরিয়া যায়; কিন্তু সেই রস পূর্ণভাবে শরৎবাবু বিতরণ করিয়াছেন,—তাহা তাঁহার অভিজ্ঞতার সাহায্যে নহে—লিখিবার বিচিত্র কলা-কৌশলে।

বাস্তবিক, শরৎ-সাহিত্যে খুব উচ্চতত্ত্ব না থাকিলেও, তাহার আকর্ষণ উপেক্ষা বা এড়াইবার বস্তু নহে। একেত, যাহা দেখি, যাহা শুনি—সেই পুরাতন তত্ত্ব, তাহার উপর বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের বিপুল প্রতিভা। সাহিত্যের জয়যাত্রাপথে কপাল ঠুকিয়া বাহির হইতে এই একটী লোকেরই দেখিলাম—যাঁহার পাথেও অল্প, পাণ্ডিত্য অপ্রচুর—কঠোর দারিদ্র যাঁহার সঙ্গী।

বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে শরৎ যেন সেতুরূপে দণ্ডায়মান; যাঁহারা শরৎ পড়িবেন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথকেও কিছু কিছু বুঝিবেন। বঙ্কিমের যে সব চরিত্র অস্পষ্ট বা অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের যে সব মনস্তত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য বলিয়া কঠিন ঠেকে—শরৎ-সাহিত্যে সেই সব চরিত্র, সেই সব মন-বিশ্লেষণ অনেকটা স্বচ্ছ অনেকটা পরিষ্কার এবং অনেকটা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

ভালবাসাকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিমের প্রায় সমস্ত উপন্যাসগুলিই রচিত। সেই ভালবাসার রূপও এক, বিভিন্ন নহে। ভালবাসাকেই প্রাণবন্ত করিয়া শরৎবাবুর কথা-সাহিত্যও গড়িয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তাহার রূপ এক নহে, বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসও সেই ভালবাসারই কথা কহে। কিন্তু তাহা এমনি উচ্চস্তরের, মন-বিশ্লেষণের অনবদ্য আলোক-সম্পাতে এমনি দেদীপ্যমান, যাহা শুধু প্রাণকেই তৃপ্তি দেয় না, মনের খোরাকও যোগাইয়া দেয়। মাটীর পৃথিবীকে অবলম্বন করিয়া বঙ্কিম ও শরতের প্রেম-লতিকা প্রধানত তাহাদের ছায়া বিস্তার করিয়াছে; মাটির

পৃথিবীতে থাকিয়াও রবীন্দ্রনাথের পল্লবিনী প্রণয়-মাধুরী ঊর্দ্ধলোকে শতধারায় উৎসারিত, উৎক্ষিপ্ত ও উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের "দামিনী," রবীন্দ্রনাথের "কুমুদিনী," তাঁহার "লাবণ্য," তাঁহার "শচীশ," "নলিনাক্ষ," "নিখিলেশ" প্রভৃতি মানব-মনের বিচিত্র ছবি। মহাকবি সেক্সপীয়রের জগদ্বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যেও মানব-মনের এরূপ উচ্চ অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। চরিত্র-সৃষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে হয়ত রবীন্দ্রনাথের অনেক চরিত্র অনাদৃত হইবে, কিন্তু চরিত্রই সব সময় বড় হইয়া উঠিতে পারে না, তত্ত্ব তাহাকে ছাপাইয়া যায়। নিখিলেশের অমায়িকতায় অনেকে হয়ত হাসিবেন, কিন্তু এটা ভুলিলে চলিবে না, নিখিলেশকে ছাপাইয়া তাহার উদ্দেশ্য উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়াছে—একদিকে ভোগ ও অন্যদিকে সেবা করিবার তীব্র বাসনায় উন্মত্ত "দামিনীর" মধ্যে যে প্রচণ্ড ক্ষুধা, যে অপরিতৃপ্ত বাসনা, যে জমাট অশ্রু ফাটিয়া পড়িয়াছে,—এবং তাহার বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ যে অদ্ভুত প্রতিভার নিদর্শন দেখাইয়াছেন, তাঁহার আগে অন্য কেহ দেখাইয়াছেন কিনা জানি না, পরেও যে কেহ দেখাইবেন তাহা অসম্ভব না হইলেও, দীর্ঘ যুগসাপেক্ষ।

শরৎ-সাহিত্যে আমাদের জাতীয়তা যেমন পূর্ণ ও পরিষ্কার ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, অন্য দুই সাহিত্যিকের উপন্যাসে তাহা তেমন জ্বলন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই বলিয়াই মনে হয়। তবে উপন্যাসের সহিত যদি রবীন্দ্রনাথের গল্প ধরা হয়, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তাহা যখন সম্ভব নয়, তখন একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়—আমাদের সমাজ—আমাদের সংসার—আমাদের বাঙালীত্ব শরৎ-সাহিত্যেই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বড় গল্প হইয়া বঙ্কিম বড় উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ছোট গল্প লইয়া শরতের বড় উপন্যাস। এক একটা তুচ্ছ বিষয় লইয়া শরৎচন্দ্র যে রস-সৃষ্টি করিয়াছেন—এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, অপরজনের উপন্যাসে তাহা বিরল। Aristrocratic Familyকে কেন্দ্র করিয়া রবিবাবুর বেশির ভাগ উপন্যাস; ইতিহাসের বীর, প্রেমিক প্রভৃতিকে ভিত্তি করিয়া বঙ্কিম কথা-সাহিত্য গড়িয়াছেন; সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী-সমাজকে আদর্শ করিয়া শরতের সাহিত্য-সাধনা।

বঙ্কিমের পল্লীচিত্র আমাদের হৃদয়ে দাগ কাটে নাই, কেন না তাহার রূপ আমরা দেখি নাই; রবীন্দ্রনাথের (উপন্যাসে) সেই চিত্র সহরের দুরন্ত কোলাহলে, তাহার বিলাস-তরঙ্গে বিমলিন। শরতের সেই আলেখ্য বাঙ্গলার মাটীতে মিশিয়া সজীব হইয়াছে।—পল্লীগ্রামের নীরব নিস্তব্ধ ছায়ায়মান বনানী-পথে—দীঘির ঘাটে—কৃষকের জীর্ণ কুটীর-প্রান্তে, চণ্ডীমণ্ডপে, পবনান্দোলিত পক্ক শস্যক্ষেত্রে, পল্লীবাসীর দরিদ্র নিকেতনের মৃত্তিকা-প্রাচীরের ফাটলে ফাটলে হাসির যে দামিনী-ঝলক, আনন্দের যে ত্রিবেণী-সঙ্গম, বেদনার যে অলক্ষিত ইতিহাস নিত্য প্রকটিত হইতেছে—তাহাদেরই জীবন্তরূপ শরতের স্বর্ণ-লেখনী-মুখে প্রভাসিত হইয়াছে। সেই পল্লীবাসিনী রমা, সেই সরযূ, সেই মেজদিদি, বেনী ঘোষাল, বৃদ্ধ কৈলাশ প্রভৃতি আমাদের খাঁটী জাতীয় চরিত্র; কোন উচ্চ তত্ত্বের উপর তাঁহারা ভর করিয়া না থাকিলেও, তাহাদের মূল্য আছে; তাহাদের কাছে নবাবনন্দিনী আয়েষা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী বিমলা, লাবণ্যময়ী তিলোত্তমা, মোবারক, রাজসিংহের ন্যায় উদার বীর প্রভৃতি যেন আমাদের চক্ষের সম্মুখ হইতে ছায়াবাজির মত কিছুকাল অপসারিত হয়! "চতুরঙ্গের," দামিনী, "শেষের কবিতার" লাবণ্য প্রভৃতিও যেন ক্ষণকাল তাহাদের দীপ্তি হারাইয়া ফেলে।

দুই চারিখানি ব্যতীত বঙ্কিম ও শরতের অধিকাংশ উপন্যাসই উদ্দেশ্যবিহীন। রবীন্দ্রনাথের বেলায় ঠিক উল্টা; কি কাব্যে কি গল্পে আর কি উপন্যাসে—একটা ইঙ্গিত আছেই। ভাষা ও ভাবধারার সংগঠনে বঙ্কিম তাঁহার সময়ের যুগকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, শরৎ অপারগ হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নবযুগের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন।

বঙ্কিমের ভাষা গম্ভীর ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ; শরতের ভাষা হালকা, রবীন্দ্রনাথের ভাষা কোমল ও গম্ভীর। প্রথমের নারীচরিত্রগুলি অধিকাংশ পুরুষোচিত কঠোরতায় মণ্ডিত; এমন কি, সাধারণ পুরুষও যাহা করিতে সচরাচর সাহস করে না, তাঁহার নায়িকারা কিন্তু তাহাই করে। দ্বিতীয়ের

রমণী-চরিত্রগুলি কোমলতা ও তেজস্বিতার সংমিশ্রণে গর্ব্বিত। তৃতীয়র নায়িকারা সংযমের আবরণে তেজময়ী; কোমলতা ও কাঠিন্যের সম্মেলনে অদ্ভুতভাবে মূর্ত্তিমতী।

বঙ্কিমের পুরুষ-চরিত্র বেশীর ভাগই বীরপ্রেমিক; দ্বিতীয়র নিরীহ প্রেমিক; রবীন্দ্রনাথের নিরীহ অথচ তেজস্বী; প্রেমিক অথচ প্রত্যাশী নহে।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম—এইবার তাহার একটা সারাংশ দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। যাহা বলিলাম—তাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত মতই প্রকাশ করিয়াছি।—নিম্নে তিন লেখকের প্রধান প্রধান বিশেষত্বগুলি দেওয়া হইল:—

১। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি বেশীর ভাগ ঘটনা প্রধান; রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্বমূলক; শরৎচন্দ্রের হৃদয়াবেগে পূর্ণ।

২। বঙ্কিমের উপন্যাসে পাণ্ডিত্য; রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা; শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

৩। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা দেশ-কালকে ছাপাইয়া বিশ্বের সহিত সংশ্লিষ্ট; বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা কালকে অতিক্রম করিলেও দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ; শরৎচন্দ্রের ভাবধারা কালকে অতিক্রম না করিয়া দেশের সমাজের সঙ্গে বিজড়িত।

৪। অন্য দুই লেখকের তুলনায় আমাদের জাতীয় চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে বেশী স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

৫। বঙ্কিমে যাহা অস্পষ্ট এবং রবীন্দ্রনাথে যাহা দুর্ব্বোধ্য, শরৎ-সাহিত্যে তাহা কিছু কিছু স্পষ্ট এবং বোধগম্য হইয়াছে।

৬। বঙ্কিমচন্দ্রের পুরুষ-চরিত্র অধিকাংশই বীরপ্রেমিক; যেমন জগৎসিংহ, মোবারক, রাজসিংহ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি। শরৎবাবুর নায়করা নিরীহ প্রেমিক, যেমন সতীশ, উপেন্দ্র, রমেশ, চন্দ্রনাথ, দেবদাস ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের পাত্রগণ নিরীহ অথচ তেজস্বী, প্রেমিক অথচ প্রত্যাশী নহে; যেমন নিখিলেশ, অপূর্ব্ব, নলিনাক্ষ, শচীশ প্রভৃতি।

৭। বঙ্কিমবাবুর নারী-চরিত্র পুরুষোচিত কঠোরতায় মণ্ডিত, যেমন, বিমলা, দরিয়া, শ্রী, গিরিজায়া, শান্তি প্রভৃতি। শরৎবাবুর—কোমলতা ও কাঠিন্যের সংমিশ্রণে গঠিত—যেমন, সাবিত্রী, মেজদিদি, বিজয়া, ষোড়শী, কিরণময়ী ইত্যাদি। রবিবাবুর পাত্রিগণ সংযমের আবরণে তেজময়ী, কোমলতা ও কঠোরতার সম্মেলনে বিচিত্রভাবে মূর্ত্তিমতী; যেমন, কুমুদিনী, ললিতা, দামিনী, বিমলা, লাবণ্য ইত্যাদি।

৮। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের প্রাণবস্তু প্রধানত প্রেম, তাহার রূপ প্রায় এক। শরৎবাবুরও তাহাই কিন্তু নানাভাবে উদ্ঘাটিত; রবিবাবুরও তাহাই কিন্তু তাহা মন-বিশ্লেষণের অনবদ্য আলোক-সম্পাতে বিচিত্র।

মনা ভনা

—মরিস্ মেটারলিঙ্ক্

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[তিন অঙ্কে সমাপ্ত নাটক]

ভানা। হাঁ।

প্রিঞ্জিভেল। সে তার স্বামীকে ভালবাসে ?...সত্যই প্রাণের চেয়ে ভালবাসে ?

ভানা। হাঁ, তাই।

প্রিঞ্জিভেল। তোমার পায়ে শুধু ওই বহিরাবরণ খানাই তো ?

ভানা। হাঁ।

প্রিঞ্জিভেল। শিবিরের বাইরে ওই সব খাদ্য বোঝাই গাড়ী আর ছাগল ভেড়ার পাল দেখেছ কি ?

ভানা। দেখেছি।

প্রিঞ্জিভেল। ও'খানে দু'শ গাড়ী বাছাই করা শস্য আছে; আর দু'শ, খানা গাড়ী পশুদের আহার, ফলমূল মদ প্রভৃতিতে বোঝাই। এ'ছাড়া ত্রিশগাড়ী বারুদ, আর ছোট পনের গাড়ী বন্দুকের গুলি। ছ'শ বলদ আর বারশ ভেড়া এই গাড়ীগুলোর চারপাশে জড় করা হয়েছে। পিসায় যাবার জন্য তৈরী হয়ে এরা তোমার আদেশের অপেক্ষা, করছে।...তুমি কি ও'দের রওনা হওয়া দে'খতে চাও ?

ভানা—হাঁ।

প্রিঞ্জিভেল। শিবিরের দোরে এস তাহলে ..

[দ্বারের পর্দ্দা তুলিয়া প্রিঞ্জিভেল ইঙ্গিতে তাহাদের আদেশ করিতেই একটা বিপুল ব্যাপারের অস্পষ্ট কোলাহল শোনা যাইতে লাগিল। বড় বড় মশাল জ্বলিয়া উঠিল এবং ইতস্তত আন্দোলিত হইতে লাগিল। চাবুক আস্ফালনের সঙ্গে সঙ্গে ভেড়া ও বলদ প্রভৃতি পশুদিগের বিশিষ্ট স্বর ও গাড়ীর চাকার শব্দ শোনা গেল। নক্ষত্রখচিত রাত্রের আঁধারে মশাল জালিয়া এই যে বিপুল রসদভার ধীর মন্থর গতিতে পিসার দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল, প্রিঞ্জিভেল ও ভানা দ্বারে দাঁড়াইয়া নিস্পন্দভাবে কিছুক্ষণ তাহাই দেখিল।]

প্রিঞ্জিভেল। তোমার দয়াতেই আজ রাত্রি থেকে পিসাকে আর ক্ষুধার তাড়না সহ্য ক'রতে হ'বে না।...... এইবার সে আবার অজেয় হয়ে উঠল ...এবং সে জয়ের আশার শেষ রেখাটুকুও নিঃশেষেই তার চোখের ওপর থেকে মিলিয়ে নিয়েছিল, সেই কল্পনাতীত জয়ের গৌরবও কালই হয়তো সে লাভ করতে পা'রবে।...তুমি খুসি হয়েছ তো ?

ভানা। হঁ।

প্রিঞ্জিভেল। শিবিরের দরজা এখন তা'হলে বন্ধ করে দিই ?. দেখি, তোমার হাতখানা দেখি ..এই সবে সন্ধ্যা এখনও তেমন শীত পড়েনি বটে; তবু মনে হয় রাত্রে খুব ঠাণ্ডা পড়বে।...তোমার কাছে লুকানো কোন অস্ত্র-শস্ত্র নেই, কিম্বা কিছু বিষ ?

ভানা। পায়ের জুতো আর বহির্ব্বাস ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই।...যদি সন্দেহ হয়, তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পার।

প্রিঞ্জিভেল। নিজের জন্য আমি লেশমাত্র ভীত নই। ...তোমার জন্যই আমার ভয় ..

ভানা। আমি আমার স্বদেশ বাসীর প্রাণের মূল্য সকলের চেয়ে বেশী বলেই মনে করি...

প্রিঞ্জিভেল। ভালই!...হয়তো তুমি ঠিকই করেছ... এস এইখানে বস।...এই যোদ্ধার আসন যেমন কর্কশ আর অপরিসর, তেমনি কঠিন।...একেবারেই তোমার অযোগ্য।...আচ্ছা, এই বাঘের চামড়াখানার ওপর বস... নারীর স্পর্শলাভ করা কখন তো এর ভাগ্যে ঘটেনি।... পশুলোমের এই ঢাকাটা দিয়ে পা দুখানা চাপা দাও।...এক যুদ্ধ জয়ের রাত্রে আফ্রিকার একজন সর্দ্দার বন বিড়ালের এই চামড়াখানা আমাকে উপহার দিয়ে ছিল...।

[বহির্ব্বাসে সযতনে শরীর আচ্ছাদন করিয়া নির্দ্দেশগত ভানা আগুনের ধারে বসিল।]

গ্রিজিভেল। আলোটা তোমার চোখের ওপর প'ড়ছে সরিয়ে দেব কি ?

ভানা। না; কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

গ্রিজিভেল। [আসনের পাদমূলে বসিয়া ভানার একখানি হাত ধরিয়া]

নিয়োভানা। [ভানা চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল] ভানা, ভানা আমার !—আমিও তো তোমায় ওই নামেই ডা'কতাম। কিন্তু আজ তোমার নাম উচ্চারণ ক'রতে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উ'ঠছে।·· ও নাম বোধ হয় এমন গোপনে, এমন সযতনে, এমন দৃঢ়ভাবেই বুকের মাঝে জুবে রেখেছিলাম যে বুঝি হৃদয় না ভাঙ্গিলে তার আর বাইরে আসবার কোন উপায় নেই।···ওইটুকুই তো আমার প্রাণ; ওইটুকুই তো শুধু এখনও আমার অবশিষ্ট আছে।···ওই নামের প্রতি অক্ষরে প্রাণটা আমার ভরা আছে; মনে হয়, বুঝি প্রতি শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে'টা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।···অতি সন্তর্পণে প্রতিনিয়ত ওই নাম উচ্চারণ করে আজ আমার ভয় ভেঙ্গে গেছে, আজ ও নাম আমার অতি পরিচিত হয়ে উঠেছে।···নিস্ফলেই দীর্ঘদিন ধরে যে প্রিয়তমার আরাধনা করে আসা যায়, তা'র কানে উদ্বেল হৃদয়ের অব্যক্ত, অস্ফুট প্রেমবাণীটি অন্ততঃ একবারও গুঞ্জন করবার যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, দীর্ঘদিনের প্রতিপলে তেমনি তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আমি তোমার নাম জপ্ করে এসেছি।···আমার মনে হয়েছিল, বুঝি নামোচ্চারণের উপযোগী হয়েই আমার অধর গঠিত হয়ে গেছে।···আমার মনে হয়েছিল যে সেই পরম ইপ্সিত মুহূর্ত্তটিতে তারা এমন কোমলতার সঙ্গে, এমন নম্র, মধুর মধুবাতি মধুরভাবে, এমন গভীর আবেশ কম্পিতস্বরে ওই নাম উচ্চারণ করবে যে তাই শুনে আমার মানসী আমার অন্তরের অসীম প্রেমের, অনির্ব্বান্ দাহের খবরটুকু অনায়াসেই উপলব্ধি ক'রতে পারবে।...কিন্তু আজ এ যেন তার কঙ্কাল···এ' যেন সে নয়।..আমার ব্যথা বেদনা, আমার দুঃখ এমন করেই আজ ত'াকে বিকৃত করে তুলেছে, আমি যেন তা'কে ঠিক চিনতে পারছি না।...যে অর্ঘ্য, যে শ্রদ্ধা আমি তা'র মধ্যে সঞ্চিত করে রেখেছিলাম আজ যেন তারাই আমার' সব বল অপহরণ করে আমার কণ্ঠরোধ ক'রছে···

ভানা। কে তুমি ?···তুমি কে ?

গ্রিজিভেল। তুমি আমায় চিন্‌তে পারছ না ?··· আমায় দেখে তোমার কোন সুদূর অতীতের বিস্মৃত কথা স্মরণ হচ্ছে না ?···সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কত বড় বড় ঘটনাও মানুষ ভুলে যায়।···কিম্বা, আমার চোখেই হয়তো এটা নিতান্ত বড় বলে বোধ হয়ে ছিল।—হয়তো এটা ভুলে যাওয়াই মঙ্গল।—না, আর আমি পাবার আশা করব না; কাজেই নিরাশ হওয়ার দুঃখও আমায় বেশী ভোগ করতে হবে না। একজন দীন, অতিদীন হতভাগ্য ছাড়া আজ আর আমি তোমার কেউ নই।—একদিন যা আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ কাম্য ছিল, আজ মুহূর্ত্তের জন্য তারই দিকে লোলুপ নয়নে চেয়ে আছি।—নিতান্ত অসুখী এক দাবদগ্ধ জীব— সংসারে আজ সে কিছুই চায় না; কি সে তার চাওয়া উচিত তাও হয়তো ঠিকমত জানেনা।—কিন্তু তবু যদি সম্ভব হয়, তোমার যাওয়ার আগে সে তোমায় জানাতে চায়, তুমি তার কাছে ক'তটা ছিলে ?—না আমরণ থা'কবে।

ভানা। তুমি আমায় চেন ?···কে তুমি ?

গ্রিজিভেল। যেহেতু আপনার আনন্দের, আপনার উৎসের পানে লোকে যেমন মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে, তেমনি করে সে এখন তোমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, তাকে তোমার স্মরণ হচ্ছে না ?

ভানা। না,···অন্ততঃ আমি মনে করতে পারি না···

গ্রিজিভেল। না, তুমি ভুলে গেছ।···আমিও ঠিকই মনে করেছিলাম যে তুমি নিশ্চয় ভুলে গেছ।·· প্রথম যখন তোমায় আমি দেখি, তখন তোমার বয়স আট বছর, আমার বারো···

ভানা। কোথায় দেখেছিলে ?

গ্রিজিভেল। ভিনিসে···জুনমাসে···এক রবিবার।··· আমার বাবা স্যাকরা ছিলেন।···তিনি তোমার মায়ের জন্য একছড়া মুক্তোর মালা নিয়ে গিয়েছিলেন। তোমার মা যখন সেটা দেখতে দেখতে তার প্রশংসা করছিলেন, আমি বেড়াতে বেড়াতে বাগানে ঢুকলাম।···সেইখানেই আমি তোমায় প্রথম দেখি।···একটা পুকুরের ধারে, লতাকুঞ্জের মাঝে···তোমার একটি ছোট্ট সোনার আংটি জলে পড়ে

গিয়েছিল।…তুমি তীরে বসে নিরুপায় হয়ে কাঁদছিলে।… আমি তৎক্ষণাৎ জলে লাফিয়ে পড়লাম।…নীচে একখানা পাথরের ওপর আংটিটা চক্‌চক্ করছে দেখতে পেয়ে আমি সেটা নিয়ে এসে তোমার হাতে পরিয়ে দিই।..তোমার আংটি উদ্ধার করতে গিয়ে আমি নিজেই প্রায় ডুবে গিয়েছিলাম আর কি।…আংটি পেয়ে তোমার মুখে হাসি ফুটে উঠল; তুমি আমায় চুম্বন করলে।

ভানা। সে তো একটি সুন্দর মত ছেলে…তার নাম গিয়ানেলো।…তুমিই কি গিয়ানেলো?

প্রিজ্জিভেল। হ্যাঁ।

ভানা। কি আশ্চর্য।…কে তোমায় এখন দেখলে চিনতে পারবে?…তার ওপর তোমার মুখ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢাকা…আমি শুধু তোমার চোখ দুটোই দেখতে পাচ্ছি…

প্রিজ্জিভেল। [ক্ষতের উপর হইতে কাপড় সরাইয়া দিয়া] এই আমি ব্যাণ্ডেজ সরিয়ে দিলাম।…এখন চিনতে পার কি?

ভানা। মনে হয় যেন পারি।…অন্ততঃ ওই…এখনও তোমার মুখে শিশুর মত সরল হাসিটি রয়ে গিয়েছে কিনা।… কিন্তু তুমি দেখছি, আহত হয়েছ।.. এখনও যে রক্ত পড়ছে।

প্রিজ্জিভেল। এতো আর আমার প্রথম আঘাত নয়।…কিন্তু তুমিও যে আহত…

ভানা। ব্যাণ্ডেজ ভাল বাঁধা হয় নি।…এস আমি ঠিক করে বেঁধে দিই। [গালের উপর দিয়া কাপড়টা জড়াইয়া দিয়া] গত যুদ্ধে আমি অনেক আহতেরই শুশ্রূষা করেছি।…ঠিক, ঠিক, আমার স্মরণ হচ্ছে বটে।.. আমি যেন আমার চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছি।…সেই স্নিগ্ধ শীতল লতাবিতান, সেই গোলাপের হাসি, সেই আলোকভরা চাঁপার কলি.. যখন সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে পথের বালি তপ্ত হয়ে উঠত, একাধিকবারই যে আমরা সেই বাগানে খেলা করেছি।

প্রিজ্জিভেল। মোট বারোবার।…আমার হিসাব আছে। কোন দিনের খেলার কথাই আমি ভুলিনি।…আর সেই সময় তুমি যে যে কথা বলেছ, তার প্রতিটি আমার হৃদয়ে গাঁথা আছে।

ভানা। তারপর মনে হচ্ছে, একদিন আমি তোমার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।…কারণ, তোমার শিষ্টতা, তোমার অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের জন্য, আর ছোট রাণীটির মতই তুমি আমাকে শ্রদ্ধা সম্মান করতে বলে আমি তোমাকে খুবই ভালবাসতাম।…কিন্তু তুমি আর ফিরে আসনি…

প্রিজ্জিভেল। আমার বাবা আমাকে আফ্রিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে আমরা একটা মরুভূমির মাঝে দিগভ্রান্ত হই…তারপরে, প্রথম আরবরা, তারপর তুর্কীরা, তারপর স্পেনের লোকেরা আমায় বন্দী করে।…এই তো আমার জীবন।…যখন আবার আমার ভিনিসে ফেরার সৌভাগ্য হল, ততদিনে তোমার মা বাবা গিয়েছেন।… একদিনের সেই সুন্দর বাগানখানা তখন আগাছায় ভরা জঙ্গল।…আমি বৃথাই তোমার অন্বেষণ করতে লাগলাম।… যতদিন না আমি তোমার খবর পেয়েছিলাম…আর তার জন্য তোমার ওই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কাছে আমি একান্ত ভাবেই ঋণী; কারণ, ও'রূপ একবার দেখলে লোকে আর জীবনে কখন ভুলতে পারে না।…

ভানা। আমি তোমার কাছে আসা মাত্রই কি তুমি আমায় চিনতে পেরেছিলে?

প্রিজ্জিভেল। আজ রাত্রে আমার শিবিরে যদি দশ হাজার তোমারই মত সুন্দরী নারী, তোমারই মত মুখ নিয়ে এবং একই সজ্জায় সজ্জিত হয়ে আসত, সেই দশহাজার সহোদরার আপন আত্মীয়েরাও যদি তাদের পৃথকভাবে চিনতে না পারত, আমি অনায়াসেই উঠে দাঁড়িয়ে তোমার হাত ধরে বলতে পারতাম, "এই সেই!"…সত্যই, এটা বড় আশ্চর্য্য নয় কি, যাকে মানুষ নিজের প্রাণের চেয়ে ভালবাসে, এমন করেই সে মূর্ত্তি তার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে যায়।.. আমার বুকের মাঝে তোমার ছবি এমনই প্রাণবান, এমনই সজীব, যেন তা দিনে দিনে বেড়ে উঠেছে, দিনে পরিবর্ত্তিত হয়েছে।…কাল যেমন ছিল, আজ তেমন নেই।.. অন্তরের দেবী আমার দিনে দিনে শোভায়, সৌন্দর্য্যে ফুল্ল, বিকশিত হয়ে উঠেছিল।.. শিশু যেমন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নূতনতর রূপ, নূতনতর সৌন্দর্য্যের অধিকারী হয়, আবার মানস প্রতিমার ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি।…কিন্তু আজ যখন আমি প্রথম তোমায় দেখলাম, আমার সন্দেহ হল, আমার চোখ বুঝি আমায়

ছলনা করছে।···আমার স্মৃতি, আমার কল্পনা, অমন ঐকান্তিকভাবে তোমার রূপের সাধনা করলেও অত উদ্দামতা অত দুঃসাহস তার কোনকালে হয়নি।···তীব্রোজ্জ্বল দৃপ্ত যে রূপের শিখা আমার চোখে দিপ্তোদ্দীপ্তি হানল, অতরূপে তোমায় মণ্ডিত করতে তার সাহস হয়নি। গোধূলির রহস্যময় আলো আঁধারে উপবনের মাঝে একটি সুন্দর ফুল দেখার স্মৃতিটুকু বুকে ধরে প্রদীপ্ত দীবালোকে শত সহস্র হাস্যময় ফুলের বনে হঠাৎ এসে পড়লে বিভ্রান্ত পথিকের যেমন অবস্থা হয়, আমারও আজ তেমনি অবস্থা হয়েছিল।··· তুমি এসে দাঁড়াতেই আমি আবার আমার সেই চিরপরিচিত যুগ্মভ্রুধনু দেখতে পেলাম, সেই চোখ, সেই নিবিড় কেশের রাশি।·· একান্তমনে আমি সে মুখের পূজা করে এসেছি, তোমার সেই দিব্যোজ্জ্বল মুখে আমি যেন তোমার জ্যোতির্ময় আত্মারই বিকাশ দেখলাম।···দিনে দিনে, বর্ষে বর্ষে একান্ত সন্তর্পনে স্নেহরসে সঞ্জীবিত করে রাখলেও, কল্পনার শ্রেষ্ঠ কুসুমে সজ্জিত, অর্চ্চিত করলেও আমার যে ধ্যানের মূর্ত্তির সত্য সৌন্দর্য্যের বহু নিম্নে পড়েছিল; তোমার মুখের দীপ্ত রূপের পাশে সে মূর্ত্তি নিমিষেই ম্লান হয়ে গেল।···

ভানা। হাঁ, সেই বয়সে সে রকম উদ্দামতা সম্ভব, সে রকম প্রবলভাবেই তুমি আমাকে ভালবেসেছিলে বটে;···তার ওপর, বিরহে আর দীর্ঘদিনের ব্যবধানে প্রেমের তীক্ষ্ণতা, প্রেমের ভাস্বরতা ক্রমেই বেড়ে যায় বলে···

প্রিজ্জিভেল। অনেকেই বলে বটে, তারা জীবনে শুধু একবারই ভালবেসেছে। কিন্তু কথাটা খুব কম ক্ষেত্রেই সত্য।···আপনাদের অনাশক্তি কিম্বা আকাঙ্খা ঢাকবার জন্যই, একনিষ্ঠ প্রেমিকের জীবনের যে দুঃসহ দুঃখ, সেই দুঃখেরই তারা দাবী করে।···ফলে, প্রকৃত মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা যখন তাদের জীবনের গভীরতম মর্ম্মান্তিক বেদনাকে ভাষায় প্রকাশ করতে চায়, লঘুচিত্ত প্রেমিকের নিত্য ব্যবহারে যে সমস্ত শব্দ নিতান্ত অর্থহীন হয়ে গেছে, তাদেরও সেই সমস্ত পুরানো কথারই সাহায্য নিতে হয়।··· আর, আপনার অজ্ঞাতসারেই তাদের স্রোতী সেই হৃদয় ছেঁচা পবিত্র ভাষাকে নিতান্ত অলস গল্প কাহিনী বলে ভুল করে তার সত্যকার মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হয়।···

ভানা। তোমার ভয় নেই, আমি তা করব না।··· জীবনের সেই প্রথম সুখ প্রভাতে প্রেমের আকর্ষণ যে কি তীব্র আমি তা বুঝি।···তবে আমার নিজের বয়স তেমন বেশী না হলেও বলতে পারি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বস্তুরই সমাধি হয় বলেই হয়তো তাকে ত্যাগ করতে হয়।···

কিন্তু, ভাল, ভিনিসে ফিরে তুমি যখন আমার সন্ধান পেলে, তখন কি করেছিলে বল দেখি ?···যে নারীকে তুমি এমন করে ভালবাসতে, তাকে দেখবার একবার চেষ্টা মাত্র করলে না ?···

প্রিজ্জিভেল। ভিনিসে আমি খবর পেলাম যে তোমার মা মারা গিয়েছেন; তোমাদের সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আর যার কাছে তুমি রাণীর মত আদরে, সুখে থাকতে পাবে, পিসার এমন এক মহাধনী, সম্রান্ত লোককে তুমি বিবাহ করতে উদ্যত হয়েছ।···আমি তখন পথের ভিক্ষুক; না ছিল আমার কোন বাড়ী, না ছিল আমার একটা দেশ।···আমি তোমায় কি দিতে পারতাম ?···ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে প্রেমের জন্য নিয়তি নির্দ্দিষ্ট আত্মবিসর্জ্জন করতে হল।···ওঃ, কতদিন আমি ওই সহরের পাঁচিলের চারপাশে উন্মত্তের মত ঘুরে বেড়িয়েছি।···প্রাণপণ বলে, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দ্বারের লোহার গরাদে চেপে ধরেছি; পাছে তোমায় দেখতে পাবার উন্মাদ আকাঙ্খার অসহ্য তাড়নে প্রলয়ের ধূমকেতুর মত তোমাদের দাম্পত্য-সুখের আকাশে উদয় হয়ে অগ্নিময় পুচ্ছের আঘাতে নিমেষেই তা পুড়িয়ে ছারখার করে দিই।···ভাড়াটে সৈনিক হিসাবে আপনার দক্ষতাগুণে ছুটো তিনটে যুদ্ধের পরই আমি বিশেষ বিখ্যাত হয়ে উঠলাম।···যদিও আর কোন আশা নেই, তবু আমি অটল ধৈর্য্যে সময়ের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।···শেষে ফ্লোরেন্স আমাকে পিসা আক্রমণে নিয়োগ করল···

ভানা। মানুষ প্রেমে পড়লে কত দুর্বল, কত ভীরুই না হয়ে ওঠে!···তুমি যেন ভুল বুঝো না।···আজ আমি তোমায় এতটুকুও ভালবাসি না; তা ছাড়া, কোনদিন ভালবাসতে পারতাম কিনা, তাও আজ নিশ্চয় করে বলতে পারি না।···তবু আমার অন্তরে যে প্রেম আছে, এই দেখে সে আর্ত্তনাদ করে উঠছে যে, যে ভক্ত অমন অসীম, বিশাল, উদ্বেল প্রেমের ভান করে, সেই প্রেমের বলেও সে এই সামান্য, নিতান্ত তুচ্ছ কাজটুকুর বেশী আর কিছু করতে সাহসী হল না···

প্রিজ্জিভেল। সাহসের অভাবেই যে কাজে বাধা পড়েছিল, তা নয়!···আর অগ্রসর হতে হলে এমন কিছুর প্রয়োজন হত, যা তুমি বুঝতে পারবে না।···তখন আর অন্য কোন উপায় ছিল না।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদক: শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

ভোরের অশ্রু

শেফালী দত্ত

চাঁদের দেশে কালো ছায়ার কূলে
উজ্জ্বল ভায় একটি ছোট তারা,
তাহার পানে চেয়ে মনের ভুলে
কুমুদিণীর আঁখি পলক—হারা।

দরদ ব্যথায় ভরা কোমল মন
প্রেম-ডুরিতে বাঁধতে যেন চায়
লক্ষ যোজন দূরে ধ্যানের ধন
হায় গো কারে সোহাগ সে জানায়!

চোখের চাওয়ায় মিট্‌ল নারে তৃষা
কোথায় ওগো অস্ততারার দেশ?
ছায়ায় ঢাকা অন্ধতম—নিশা
তাইতো হেন দীর্ঘশ্বাসের রেশ।

ডুকরে কেঁদে কয়, 'গো নিরুপম'
বিষাদ-মাখা নয়ন দুটি তুলে,
তোমার পাওয়া ধ্যানের স্বপন মম
তাইতো কাঁদি এ দুনিয়ার কূলে।

বসত তব মেঘের বুরুজ পার
জ্যোৎসনাতে ছড়ায় যেথা রেণু,
হাসির দেশে শুধুই ফুলের হার
কেবল বাজে দীর্ঘ চাঁদের বেণু।

মাটির সনে থাকি' মাটির দেশে
দীর্ঘ নিশীথ তন্দ্রা-হারা কাটে
সকল ভুলি' তোমায় ভালোবেসে
'দহন জ্বালায় পরাণ মম ফাটে।'

এমনিতর ব্যাকুল-করা সুরে
গাইল বালা প্রেমের মরণ-গান
বুকের পীতম রইল যদি দূরে
মিছেই তবে সজল—অভিমান!

ঘোর নিশুতি আঁধার কিনারায়
দীর্ণ হ'ল গোপন মনের তল
দীঘির নীরে ঝরার মূর্চ্ছনায়
চোখ দুটি সে 'অশ্রু' ছলোছল্।

রঙ্গমহল নিব্‌ল অকস্মাৎ
ছবির দেশে মিলিয়ে এল ছায়া ঃ
হাতের কুলায় মিল্‌ল নারে হাত
জোয়ার এসে ভাসিয়ে নিল কায়া।

রইল শুধু নীল আকাশের তলে
ঝলসে-যাওয়া বুকের দরদ-ভার
রচ্‌বে সেকি প্রাণ কমলের দলে
স্নিগ্ধ-প্রলেপ,—স্মৃতির মণি-হার?

ত্রিবেণী

—শ্রীঅখিলকুমার ভট্টাচার্য্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

ঘরের কোনে টেলিফোন আবার উঠল বেজে এমনি সময়ে। অসীম বিরক্ত হয়ে উঠলো—এ যেন তার বাদ সাধা। সকাল থেকেই মনটা আজ ভালো নয়—চিত্ত-ক্লিষ্ট, শুভ্রার অপমান মনের মাঝে আগুন জেলে দিয়েছে এবং সে অপমান বহ্নির জ্বালা স্নিগ্ধার অশ্রুজলে যখন স্নিগ্ধ হয়ে আসছে এমনি সময় আবার বাধা। শেয়ার মার্কেটের লোহার দর নিয়ে কিংবা ম্যানেজিং ডাইরেক্টরদের এমার্জেন্সি মিটিং নিয়ে এখন তার মাথা ঘামাবার মত মনের সতেজতা নেই।

ভালো লাগে না আর। জীবনের প্রথম বসন্ত প্রভাতে শুধু এই টাকা আর টাকা—কি হবে তার এই সিন্ধুক ভরা অর্থে—বাড়ীতে—কারে, ব্যাঙ্কের সুদে?—তার মতন বয়সের তরুণ যুবকরা বি-এ, এম-এ পাশ করে তার কাছেই ধন্না দেয় তার ফার্ম্মে একটা চাকরির প্রত্যাশায়।

থাকগে শেয়ার মার্কেট—দূরহোক ম্যানেজিং ডাইরেক্টরদের এমার্জেন্সি মিটিং।

সে এখন চুপ করে শুয়ে থাকবে—স্নিগ্ধা বরং এখন একটা রবীন্দ্রনাথের গান করুক—সে অর্দ্ধনিমিলীত নেত্রে তাই এখন শুনতে থাকুক।

রবীন্দ্রনাথের গান—হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের গানই। রবীন্দ্রনাথের গানই দুঃখের—ব্যথার—ক্লিষ্টতার—বিরহের—বিদ্রোহের একমাত্র সান্ত্বনা।

কিন্তু টেলিফোন তখনও ক্রিং ক্রিং করে বেজে চলেছে। স্নিগ্ধা বললে—কে ফোন করছে?—

অসীম উদাস ভাবে উত্তর দিলে—কে আবার শেয়ার মার্কেটের কোন মাড়োয়ারী দালাল কিংবা অফিস থেকে।

স্নিগ্ধা জিজ্ঞেস করলে—ধরবো?

অসীম বললে—তুমি?—না।

কিন্তু এবারে আর অসহ্য। মনের যে মুহূর্ত্তকে সে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে বার বার তার প্রবল বাধা ওই টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দ। অসীম ডাক দিলে বোয়!—

কুর্ত্তি পরা চাপরাশ আঁটা বয় এসে সেলাম জানালে—সাব।

অসীম আদেশ দিলে—টেলিফোনসে বোল দেও সাব কোঠি মে নেহি হ্যায়, কোন রিং করতে উসকো নাম ভি পুছলেনা—

আদেশ প্রতিপালিত হোল এবং বয়ের মুখে অসীমা নাম শুনেই অসীম ব্যস্ত এসে রিসিভারটি ধরলে।

ফোনের মধ্যে কথাবার্ত্তা চললো—কি বললেন পি, কে, ফাইভ এইট নাইন—সেভেনটি এইট বাই ফাইভ বালীগঞ্জ রোড—আচ্ছা আজ বিকেলের দিকে—নিশ্চয়ই যাবো।

বালীগঞ্জ রোড থেকে অসীমা ফোন করেছে—কাল রাতে সে এখানে এসেছে স্কুলে ক'দিন ছুটি পেয়ে—এক আত্মীয়ার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছে—কলকাতায় কটা জরুরি কাজ আছে তাই। দু'একদিন থেকেই আবার সে ফিরে যাবে কর্ম্মক্ষেত্রে পূর্ব্ববঙ্গের সেই দিগন্তলীন গারো পাহাড়ের কোলে নীল ছায়াচ্ছন্ন দেশে—ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্রের ধারে টিনের চালাওয়ালা বাংলোর মাঝে। অসীমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আজ বিকেলের দিকে অসীমের আসা চাই-ই তার কাছে বালীগঞ্জ রোডে। সুবিধে হলে তারা একটু বেড়িয়েও আসবে গঙ্গার দিকটায় থেকে কিংবা ইডেনগার্ডেনে।

স্নিগ্ধা কিন্তু অকস্মাৎ অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেছে। সে অসীমা সম্বন্ধে এত তার কৌতূহল ছিল—কেমন সে দেখতে, কথায় তার মধু মাখানো আছে যার জন্যে অসীম এতখানি আগ্রহ—সেই অসীমার সম্বন্ধে সে একটি প্রশ্নও করলে না।

ফোনের আলাপ পরিচয়ের একপক্ষের কথাগুলি সে নীরবে শুনে গেল। রিসিভার ছেড়ে দিয়ে অসীম তার কাছে আবার ফিরে এলে সে শুধু দৃষ্টিটাকে বেশী করে নীচে মেঝের দিকে নামিয়ে দিলে। চোখের কোনে রুদ্ধ অশ্রুর আবেগ হয়ত বা উথলে উঠেছিল, অভিমান হয়ত বা একটু গাঢ়তর হয়েছিল—কিন্তু অসীম সেদিকে বিশেষ নজর দিলে না।

অসীমাকে সে শুধু জিজ্ঞেস করলে—তোমার কি কোন কাজ আছে? অসীমার তরফ থেকে কোনই প্রত্যুত্তর শোনা গেল না।

এবারে অসীম কণ্ঠস্বরে খানিকটা কৃত্রিম কোমলতা টেনে এনে অনুরোধ জানালে—একখানা গান শোনাবে? রবীন্দ্রনাথের গান?—

কিন্তু স্নিগ্ধা এবারে বিদ্রোহ জানালে। অসীমের অনুগ্রহ লাভের প্রচেষ্টায় অনেক লাঞ্ছনাই সে সহ্য করেছে। সে চালাক মেয়ে; তাই সমস্ত লাঞ্ছনাকেই ভবিষ্যতের আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করেছে। অসীমের বাড়ী-গাড়ী-ঐশ্বর্য্য, এর মোহ বড় অকিঞ্চিতকর নয়—বিশেষতঃ সেই সব নারীর কাছে যাদের জীবিকা অর্জ্জন করতে হয় নিজের পরিশ্রম লব্ধ অর্থের দ্বারা যাদের জীবনের কোমল অনুভূতি-গুলি যন্ত্রের সামিলই হয়ে গেছে এবং যাদের জীবনের বসন্ত প্রভাত বিগত প্রায়, রূপ-সৌন্দর্য্যকে যাদের প্রকাশ করতে হয় নানা কৃত্রিম উপায়ে। স্নিগ্ধা তাই হিসেব করে অসীমের প্রতি অনুরাগ দেখায়—তার মান, অভিমান, বিরহ বিদ্রোহ সবই হিসাব করা—ব্যবসাদারী।

কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা থাকে। আঘাতের পর আঘাতে বাড়ীর পোষা বিড়ালটি পর্য্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অসীমাও তাই তার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করে ফেললে।

বল্লে—গান শোনাবার আপনাকে অনেক লোকই আছে—আপনার কাছে চাকরিই না হয় করি পেটের দায়ে তাই বলে—

কথাটি আর শেষ হল না। স্নিগ্ধার দু'চোখের কোন বেয়ে প্রবল ধারায় অশ্রু এল নেমে যেন শ্রাবনের বর্ষণ ধারা।—স্নিগ্ধা তা আঁচল দিয়ে চাপতে চাপতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর অসীম—অসীম দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মতন—কিং কর্ত্তব্যম বিমূঢ় হয়ে।

জীবনে খুব বেশী মেয়ের সহচর্য্যে সে আসে নি। একটু প্র্যাকটিক্যাল গোছের লোক সে। অল্প বয়স থেকেই সে নেমেছে ব্যবসায়—চিনেছে অর্থ—শেয়ার মার্কেট আর ব্যাঙ্কিং; সুতরাং তার মতন লোকের পক্ষে এ হেন প্রেমের মনস্তত্ব বিচার করবার ক্ষমতা নেই। যদিও কবিতা সে পড়ে—সাহিত্যকেও করে সমাদর। তবে দারিদ্র্যকে সে ঘৃণা করে না—দারিদ্র্য সম্বন্ধে তার বড় তীব্র অনুভূতি। নিজের পায়ের পর নির্ভর করেই সে আজ উঠেছে। বাড়ী—গাড়ী ফার্ম এবং বিপুল সম্পত্তির অধিকারী।

আঠার বছর বয়স থেকে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে সে প্রবেশ করেছে বাস্তবের আঙিনায়—রূঢ় সত্য এই জীবনের পথে। সাবান—তরল আলতা আর চায়ের ক্যানভাসিং থেকে আরম্ভ করে আজ সে হার্ডওয়ার মার্চ্চেন্ট—শেয়ার হোল্ডার। লোকে বলে ভাগ্য—সে বলে পুরুষকার।

আত্মীয়-স্বজনের কাছে বঞ্চিত হয়ে সে যখন একলা এই জনতা বহুল মহানগরীর রাজপথে নেমেছিল তখন চোখের সামনে তার একটি মাত্র স্বপ্ন ছিল—সে হচ্ছে এই 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'। তাই জীবন পথে আজও সে হিসেবী, ট্রেনে চাপতে গেলে প্রথমে তৃতীয় শ্রেণীর টিকেটই কাটে।—

অসীমের ফ্রয়েড কিংবা হ্যাভলক এলিস পড়া নেই—তাই সে জানে না নারীর মনস্তত্ব। স্নিগ্ধার আকস্মিক নাটকীয় প্রস্থান এবং অশ্রুজলের কোন কারণই সে আবিষ্কার করতে পারলো না। কিন্তু তবুও সে ব্যথা পেল—ব্যথা পেল স্নিগ্ধার অশ্রুজলে।

অসীম বাইরে এসে স্নিগ্ধার খোঁজ করলে। সিঁড়ির ধারে ওয়েটিংরুমে কিংবা ছাদের ঘরে। না, স্নিগ্ধার ছায়া কোথাও নেই। সে চলে গেছে।

অসীম ফিরে এলো আবার তার শয়ন কক্ষে। অত্যন্ত ক্লান্তি এবং গাঢ় অবসাদ যেন সে অনুভব করছে। সকাল থেকেই কেমন যেন সে আজ বিভ্রান্ত। সে এখন একটু শান্তি চায়।

অসীমার কথা তার মনে পড়লো। আজ বিকেলের এনগেজমেণ্ট। কিন্তু তাহলে আজ তার অনেক কাজের ক্ষতি হবে। তা হোক গে—কাজ—আর কাজ—শুধু এই নীরস কাজের চাকায় তার দেহ মন নিষ্পেষিত।

ফোন আবার উঠলো বেজে। অসীম রিসিভার তুলে নিয়ে শুনলে অফিস থেকে তার পার্টনার ফোন করছে। অসীম আজ ছুটি নিলে—বন্ধুকে—পার্টনারকে অনুরোধ জানালে আজকে যেন সে নিজেই কাজ ম্যানেজ করে নেয়।

তারপর সে তার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো।—

ধীরে-ধীরে অসীমার চিন্তাই তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললে।

অসীমার সঙ্গে তার প্রথম আলাপ কথা এবং ট্রেনের একটানা গাড়ীর মাঝে নির্জ্জন একখানি ইণ্টার ক্লাশ কামরায়; সেই রোমাঞ্চকর আলাপ এবং চিত্তের স্পন্দন। দুধারে শুধু মাঠের পর মাঠ—টেলিগ্রাফের পোষ্ট আর সাঁকো!

অসীমার সঙ্কোচহীন ব্যবহার—অসীমের বেশ লাগে।

তারপর ময়মনসিংএ কয়েকটি দিন।—অসীমার হাতের মোচার চপ আর ওমলেট—তার জীবনের একটি নতুন অনুভূতি।—নদীর ধারে দীর্ঘ তটরেখা—তার পথ দিয়ে দিগন্তের পানে দু'জনে বেড়িয়ে চলা আর অবিশ্রান্ত আলাপ কয়েকটি দিনের কয়েকটি চিত্র তার অর্থকীট নিঃশেষ করা জীবনের পরম রঙিন স্বপ্ন।

অসীম ভুলে গেল শুভ্রার অপমান—ভুলে গেল স্নিগ্ধার অশ্রুজল। অসীম আর অসীমা—পরম আবেগময়ী আবেষ্টনী।

চোখের কোণে তার নিদ্রার আবেশ ঘনিয়ে আসে। একটু দূরে একটা কোকিল ডেকে চলেছে। শহরের কোলাহলের মাঝেও অসীমের কানে ভেসে আসছে তার মিষ্টি ডাক—কু-উ-উ কু-উ-উ-

(ক্রমশঃ)

গল্প

শ্রীচরণেষু

—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী

ভাড়াটে বাড়ী।…পুরাণো সেকেলে ধরণের ব্যারাকের মত করে গড়া।…চারপাশের ঘরগুলিতেই ভাড়াটে আছে।…ছোট্ট ছোট্ট পরিবার, তাদের জনবলের অভাব ঢেকে রেখে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকেই মাসী, পিসী, ও দিদি সম্পর্ক পাতিয়ে স্বল্প আয়ে দিন কাটিয়ে দেয়।…

সেখানে অনিমাও এসে এক নতুন সম্পর্ক পাতিয়ে তাদেরি একজন হয়ে দাঁড়ালো।…বাড়ীর সবাই আশ্চর্য্য হয়ে যায় এই ভেবে যে স্বামী বর্ত্তমান থাকতে ও বাড়ীভাড়া থেকে আরম্ভ করে সংসারের যাবতীয় কাজ সেই করে আর তার স্বামী তা দেখেও এত স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় কি করে? এই তো বেতের মত লিক্‌লিকে তার দেহখানি, যেন সর্ব্বদাই কাঁপছে অথচ তার আর কাজের আদি অন্ত নেই।…

সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই অনিমা উঠে, আগের দিনের সব এঁটো বাসন পত্র কলতলায় ধুতে আরম্ভ করে দেয়।… খুব সকালেই না মেজে ফেললে পরে কলের তলাতে এত ভীড় জমে যাবে যে তখন কলের জল তোলে কার সাধ্যি। তখন কলের জল তোলা নিয়ে এক প্রলয় কাণ্ড সুরু হয়ে যাবে। সারা বাড়ীতে একটা মাত্র কল।… কার আগে কে জল নেবে তা মীমাংসা করতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাবে।…অনিমা বাসন-কোসন মেজে যখন উপরে গেল তখনও বিনয়ের ঘুম ভাঙ্গে নাই। অনিমা বিনয়কে গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললে—"হ্যাঁগা, ওঠো বেলা হয়ে গেছে।" বিনয় ধাক্কা খেয়ে জেগে গেল, বললে, "এত সকালে ডাকাডাকি কচ্ছো কেন?"

"সকাল আর কোথায়, অনেক বেলা হয়ে গেছে যে?"

"আচ্ছা উঠছি" বলে গা মোড়া দিয়ে সে এমনভাব করলো যেন সে এক্ষুনি উঠবে। "ত্যাখো, ষ্টোভের উপরে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে গেলাম, তুমি উঠে চাটা করে ফেলো আমি ততক্ষণে স্নানটা সেরে নিই" বলে অনিমা নীচে স্নানের ঘরে ঢুকে পড়লো।

বেলা হয়ে গেছে।…পূব দিকটায় নবীন উষার রূপ ফুটে দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে।…তবু কিন্তু এই ব্যারাকের মত বাড়ীটাতে আলো এসে পৌঁছায় নাই।… অনিমা স্নান সেরে উপরে গিয়ে দেখে জল তেমনি ফুটছে, তক্তাপোষের উপরে বিনয় তেমনই ঘুমুচ্ছে। অনিমা আবার ডাকলে "হাঁ গা, ওঠো না গো?" ডাক শুনে এবার বিনয় উঠে পড়লো।…তখনো আলোটা জ্বালানো রয়েছে। সে উঠেই বললে—"খুব বেলা হয়েছে?"

"হবে না? বেলা আর কার কথায় বসে থাকে?" তারপর পেয়ালাতে চা ঢালতে ঢালতে অনিমা অতি মৃদু কণ্ঠে বিনয়ের সুরে বললে, "ত্যাখো তোমাকে একটা কথা বলছি, রাখবে ত? নতুন বাড়ীতে এসেছি, এখন তুমি একটু ভাল হয়ে চল। আবার এখানেও যদি তেমনি গণ্ডগোল হয় তবে আর কোথায় যাবো? কে আমাদের যায়গা দেবে? ও ছাই কি না খেলেই নয়? মানুষ যে তোমার কথা বলে কথা শুনায় আমার ভারী লজ্জা লাগে।" বিনয় বলে "আমিও তা বুঝি অনিমা। আচ্ছা চেষ্টা করে দেখবো কথা রাখতে পারি কি না।"

"কেন পারবে না চেষ্টা করলেই পারবে।

বিনয় চা খেয়ে গেল বাজার করতে আর অনিমা গিয়ে ঢুকলো রান্নাঘরে।

দুপুর বেলা সেলাই শেখাতে অনিমার বাইরে যেতে হয়। সে দু'জনকে দুপুর বেলা সেলাই শেখায়। যাবার সময় সে সাবধান করে যায় বিনয়কে সে যেন ঘর দোর আগলে রাখে। সারা দুপুর বিনয় তাই করে।…সন্ধ্যার আগেই অনিমা ঘরে এসে সাংসারিক কাজ কর্ম্মে মন দেয়।

ঘর ঝাট-পাট দেয়, রোদের কাপড়গুলিকে ঘরে এনে সাজিয়ে সাজিয়ে আল্‌নায় রাখে আর বিনয় বেড়য় বাইরে তার কাজে।···

বিনয় একটা খবর কাগজের অফিসে রাত্রে কম্পোজিটারের কাজ করে।···কাজ করতে করতে সে অনেকবার ভাবে অনিমার কথা।···সে কোন দিন অনিমার কথা রাখে নাই। অন্ততঃ আজকের দিনটাতে সে কিছুতেই তার কথা অবহেলা করবে না। সে চেষ্টা করবে যাতে না খেয়ে পারা যায়। অনিমা সত্যি বলেছে সে চেষ্টা করলেই পারবে। সত্যি সে পারবে।···

ক্রমে রাতের গভীরতা বাড়তে থাকে। ছুটি হতে তখনো প্রায় দু'ঘণ্টা বাকী আছে।···এখনই সে ঝিমুতে সুরু করেছে, হাতের কম্পোজের টাইপগুলি এলোমেলো হয়ে পড়ছে। বিনয় ঠিক বুঝলো যে তার নেশার সময় হয়েছে। তাই সে যেন আর স্থির থাকতে পারছে না।··· বিনয় আর বসে থাকতে না পেরে "দূর ছাই বলে" সে উঠে পড়লো।

এত রাতেও বিনয় ফিরে না দেখে অনিমার আর কিছুই বুঝতে বাকী থাকে না।···বাড়ীর অন্যান্য সবাই যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত তখনো কিন্তু অনিমার চোখে ঘুম নেই।··· সে অশান্তিতে ঘরের ভিতরে ছুটাছুটি করতে থাকে।··· খানিকক্ষণ পরে দেখে বিনয় টলতে টলতে এসে দরজায় ঘা দিল "অনিমা, অনিমা দরজা খোল। এত সকালেই বাড়ীর সদর বন্ধ করে ফেললে বাবা? মানুষ কি আর বাইরে যাবে না?" বিনয়ের কথা শুনে ভিতর থেকে একজন খুব জোর গলায় বললে---"এত রাতে কে চেঁচাচ্ছে? কে মাতলামী কচ্ছে?" বেশী গোলমালে বাড়ীর সবাইয়ের ঘুম ভেঙ্গে যাবে এবং একটা কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি হবে ভেবে অনিমা ছুটে এসে নিজেই দরজা খুলে বললে, "আগে ভিতরে এস।" অনিমাকে দরজায় দাঁড়াতে দেখে প্রথমটায় সে একটু কেমন থ' হয়ে গেল। তাই ভয়ে ভয়ে বললে---"আমি আজ খাইনি বুঝলে অনিমা? তবে কি না---" তার আর কথা শেষ হতে পারলো না।···অনিমা মুখের কথাটিকে টেনে নিয়ে এক ধমকানি দিয়ে বললে---"তোমার আর বকতে হবে না---ভিতরে এসো।" কিন্তু বিনয়ের পা তখন এমনি ভাবে টলছিল যে সচেষ্টায় হেঁটে যাওয়া তো দূরের কথা দাঁড়িয়ে থাকাই তার দুঃসাধ্য ছিল। অনিমা তাকে ধরে একরকম জোর করেই টেনে ভিতরে এনে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিল।···উপরে ঘরে গিয়েও বিনয় আবার বলছে "আমি মাতাল হইনি। এই ছাখো আমি হাতের কর গুনতে পারি। শুনবো? এই এক, তিন, ছয়, শত। না, না হ'ল না। ভুল হয়ে গেল। আচ্ছা আবার শুনবো? একের পরেই হল তিন, তিনের পরেই হল---নাঃ একটা গেছে বাদ পড়ে।" তার এই মাতলামী দেখে অনিমা এক ধমকানী দেয় "চুপ কর।" সত্যি সে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে ধমকানী খেয়ে। আবার আরম্ভ করে "ছাখো অনিমা আমি কড়ি কাঠগুলি ঠিক গুণে ফেলবো। আচ্ছা, কড়ি কাঠগুলি বাঁকা বাঁকা হয়ে গেছে কেন? সকালবেলা দেখে গেলাম বেশ আছে আর এখনই বাঁকা? বা রে! এত সকালে বিকেলে মানুষের মত দু'রকম হতে পারে না---কি?" এমনি বিড় বিড় করতে করতে সে নিদ্রাদেবীর কোলে আত্মসমর্পন করে দেয়।···

পরদিন সকালবেলা বাড়ীর সবাই একজোট হয়ে বিনয়কে যথেষ্ট গালাগাল দিল।···তাদের কথার বিরুদ্ধে জবাব দিতে গিয়ে অনিমা অযথা অপমানিত হয়ে এল।···এ বাড়ীতে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই অনিমা লক্ষ্য করেছিল তার প্রতি দু'টি লোকের কু-নজর ছিল। কিন্তু আশাসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটাতে সে নিষ্ফল ক্রোধে তারা জ্বলছিল, এবার সুযোগ পেয়ে সে ঝাল মেটানোর জন্যে তারা এগিয়ে এল।···তারা জোর গলায় বললে, "ভদ্রলোকের বাড়ীতে মাতলামী চলবে না। এখানে মাতালের যায়গা নেই। আবার যদি মাতলামী করে তবে আমরা ধরে আচ্ছা করে মার দিয়ে দেবো।" কথা শুনে অনিমা নীরব হয়ে গেল। এখনো অপমানিত হতে যা বাকী আছে এদের কথার উত্তর দিতে গিয়ে সেটুকুও পূরণ করতে সে আর চাইলো না। সে ভগবানের পায়ে নিজের দুরদৃষ্টের কথা জানিয়ে অনেক অশ্রু বিসর্জ্জন করলো। বিনয়ও সবই শুনলো। কিন্তু কিছুই সে বললো না। বলবার ক্ষমতাও তার ছিল না। সে যে সমস্ত ক্ষমতা অক্ষমতার বাহিরে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিদিনের মত আজো বিনয় বাইরে বেরিয়ে গেল নিজের কাজে।···রাত্রি অনেক হ'ল তবু সে ঘরে ফিরে না।···অনিমা আজ আর শান্ত হ'ল না, সে স্থির হয়ে বসে আছে আজকের ফলাফলটা কি দাঁড়ায় তা দেখবার জন্যে।···সে ভাবে তার স্বামীর কথা: কি সৃষ্টি ছাড়া মানুষ সে এই বিনয়, কিছুতেই যেন এর ভয় নেই। সমস্ত অপমান, অনাদর, অবহেলা এ সবকেই অনায়াসে যেন করায়ত্ত করে ফেলেছে। অনিমার নিজের অতীতের দিনগুলির কথাও মনে হ'ল। তার বিবাহিত জীবনের

প্রথম দিনগুলি, তার পর থেকেই এ দুঃখের সুরু এবং তার এই পরিণতি। কত প্রলোভনের ভিতর দিয়ে সে এগিয়ে এসেছে। তার এই লাবণ্যময় দেহটার উপরে কত লোকে লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছে কিন্তু তাকে মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত করতে পারে নাই। সে জানতো—স্বামী দেবতা; তারি চরণ ভরসায় এ পৃথিবীর সব কটা দিন কাটিয়ে দিতে হবে। হিন্দু নারীর না-কি তাই আদর্শ।

রাত গভীর হয়েছে।..পথ ঘাটগুলি ক্রমে জনবিরল হয়ে উঠছে।...মাঝে মাঝে বায়স্কোপ অথবা থিয়েটার থেকে ফেরৎ লোকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মুখর অনেকগুলি গলা শুনা যাচ্ছে।..অধিক রাতের হাওয়া উন্মোক্ত পার্ক এবং *জনহীন রাস্তার বুকের উপর দিয়ে এসে জানালার গরাদে* গরাদে ধাক্কা খায়। জানালায় ন্যস্ত অনিমার অনাবৃত দেহে সে হাওয়া লেগে তাকে চিন্তা থেকে সচকিত করে দেয়। সে আবার গায়ের ও মাথার কাপড়টাকে টেনে দেয়।... কোথায় কোন্ একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটার ঘণ্টা বেজে গেল।...তবু বিনয় ঘরে ফিরে না দেখে অনিমা চিন্তিত হ'ল।..থানা, পুলিশ, মোটর চাপা ইত্যাদির চিন্তায় তার বুকটা টিপ টিপ করতে আরম্ভ করলো।... খানিক্ষণ পরে অনিমা দেখে তার স্বামী সেই মূর্ত্তিমান বিনয় টলতে টলতে এসে হাজির হয়েছে।' 'এতক্ষণ পর্য্যন্ত যার চিন্তায় ঘুমাতে পারে নাই, যার অমঙ্গল চিন্তা তাকে অস্থির করে রেখেছিল বিনয়কে এ অবস্থায় দেখবামাত্রই অবজ্ঞায় ও ঘৃণায় তার মনখানি রুখে দাঁড়ালো।..সে একটুও নড়লো না সেখান থেকে, মনে মনে বললো—"আমি পারবো না দোর খুলতে, যা হবার হোক।" বিনয় এসে সদর দরজায় খুব জোরে জোরে ঘা দিতে লাগলো আর ডাকলো "অনিমা! অনিমা!!" অনিমা তার ডাক শুনলো। শুনে সে বললে "অনিমা মরেছে। পারবো না আমি দোর খুলতে।" বিনয় দরজায় ঘা মারতে মারতে বললে—"পাজি ব্যাটারা দরজা খোল্ শীগ্গীর—নইলে এখখুনি আমি দরজা ভেঙ্গে ফেলবো। আবার বলে কিনা আমাকে মারবে। বেশতো আমি মদ খাই তাতে তোদের কি? তোদের বাপের জায়গায় খাই? আমার ইচ্ছে আমি খাবো। একশ' বার খাবো, দু'শবার খাবো। খেতে খেতে দোকানের সব মদ খেয়ে ফেলবো—তাতে তোদের বাবার কি?" যে বিনয় সজ্ঞানে কত শত গালাগালি ও অপমান সহ্য করেছে সেই কিনা আজ মদের নেশায় কত বকে যাচ্ছে, কত গালাগালিও করছে। কিন্তু সবাই তো তার অনিমা নয় যে মুখ বুজে এত ঝক্কি সহ্য করবে। তার গালাগালি ও হল্লাতে বাড়ীর সবাইয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সবাই ছুটে এল তাকে তাড়া করে। সবাইকে এভাবে তেড়ে আসতে দেখেও অনিমা কোন ব্যস্ততা দেখালো না, সাড়া শব্দ করলো না, নড়লোও না। সে চুপটি করে বসেই রইলো।... ভাবলো যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে—হোক্ যা হবার। দরজা খুলতে এগিয়ে এল সেই দু'জন অনিমার রূপ যৌবনের উপরে যাদের একটু সুনজর ছিল এবং যাকে হাতের মুঠোয় না পেয়ে নিষ্ফল ক্রোধে আজ সকালবেলা অনিমাকে অপমান করতে ছাড়ে নাই। দরজা খুলেই বললে "কিরে মাতাল হ'য়ে হল্লা কচ্ছিস্ কেন, গালাগালি দিচ্ছিস্ কেন?" বিনয়ও আজ যেন গালাগালিতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। "করবো না, তাতে তোদের কি? তোদের পয়সায় খাই না তোদের বাপের পয়সায় খাই?" বাপের নাম করে কথা বলতেই তারা দু'জনে চটে লাল হ'য়ে গেল প্রথমতঃ ঘুম ভাঙ্গানোর অপরাধেই সে মস্ত বড় অপরাধী তাতে আবার মাতাল হয়ে গালাগাল দিচ্ছে। তাই তারা বললে "দ্যাখ্, ফের মাতলামী করবি তো তোকে মেরে হাড় গুড়া করে ফেলবো।" "বিনয় কথা শুনে এগিয়ে গেল কাছে "মার দেখি, মারতো?" কাছে যেতেই এমনি জোরে এক ধাক্কা মারলো যে ধাক্কা খেয়ে সে ছিটকে পড়ে গেল। পাশের এক দেওয়ালে লেগে বিনয়ের মাথাটা কেটে ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত বেরুতে আরম্ভ করলো।..সে দিকে বিনয়ের কোন হুস্ নেই। সে কম্পিত পদে আবার টলতে টলতে উঠে গেল মারতে। অনিমা উপর থেকে এত গোলমাল শুনে আর স্থির থাকতে পারলো না; সে ছুটলো নীচুতে।...সিঁড়ি দিয়ে পাগলের মত ছুটতে ছুটতে নীচে এসে দেখে সকলে বিনয়কে ধরে খুব মারছে আর বিনয় মাটিতে পড়ে অব্যক্ত ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে।... রক্তে তার সারাটা গায়ের জামা কাপড় ভিজে গেছে।... অনিমা ছুটে আসতেই তার দিকের লোক সব তাকে পথ ছেড়ে দিল।..সে চীৎকার করে বললে "মার্—তোরা মার্, ওকে একেবারে মেরে ফ্যাল্।"

অনিমা বিনয়ের এই অপ্রকৃস্থ ভাব লক্ষ্য করেছিল আর কিছু বললে সে যে একটা অস্বাভাবিক কিছু করে ফেলবে তাও সে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু দিনের পর দিন এভাবে বিনয়কে নিয়ে সে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আর যেন সে পারছিলো না। সে অতি দুঃখেই বারবার একথা বলতো। "মাতা বসুন্ধরা তুমি দ্বিধা হও।" কিন্তু আজ আর সে কিছু না বলে পারলো না। সে আবার বললে "মারের ভয় দেখাচ্ছো, মার দেখি কেমন?" সে অনেক খুঁজেও তার লাঠিখানা পেল না কিন্তু টেবিলের উপরে দেখতে পেল কাচের "কাগজ চাপাটা।" বিনয় সেটিকে হাতে নিয়েই "এই দ্যাখ্ মারতে পারি কি না পারি" বলে সজোরে ছুড়ে মারলো অনিমার মাথায়। সেটা তার মাথায় লাগতেই সে "মাগো!" চীৎকার করে মাথাটা হাত দিয়ে চেপে ধরলো।...দেখতে না দেখতেই তার দেহ লতাখানি লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে।...



মহীশূরের বিদুরাশ্বথ নামে এক গ্রামে কংগ্রেস পন্থীরা জাতীয় পতাকা সহ এক সভা করে, দেশীয় সরকার সে সভা ভেঙে দেবার জন্যে অন্য উপায় না পেয়ে শেষে গুলী বর্ষণ করে। ফলে একত্রিশ জন হত ও বহু আহত হয়।

যথাযথ 'তীব্র বিক্ষোভ' ও 'বেসরকারী তদন্ত' চলছে!

* *

উড়িষ্যায় অস্থায়ীভাবে জনৈক সিভিল কর্মচারীকে গভর্ণরের পদে বাহাল করার কথা হচ্ছিল—সেখানকার কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল তাতে আপত্তি জানান, কারণ উক্ত কর্ম্মচারীটি তাঁদের অধীনস্থ হিসেবে কাজ করছিলেন। ভারত সরকার প্রথমতঃ এ-সব আপত্তি কানে তুলতে চাননি। শেষকালে যখন মন্ত্রীরা ইস্তফা দেবেন বলে উঠে দাঁড়ালেন তখন পূর্ব্বাদেশ বাতিল করা হল।

কংগ্রেসের ইজ্জৎ বাঁচল!

* *

মন্ত্রী যদি বলতে হয় তো বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী—

নিতুই নব! আজ গণ্ডা গণ্ডা জবাহরলালকে পকেটে পুরছেন, কাল শত শত কংগ্রেসের সঙ্গে সিঙ্গলহ্যাণ্ডেড লড়াই করছেন, পরশু সরস্বতীর পদ্ম বনে ঢুকে তাকে ছত্রনছ শ্রীহীন করছেন, আরেকদিন পার্কের মাঝে দাঁড়িয়ে সিংহ ব্যাঘ্রের গর্জ্জন ছাড়ছেন, অন্য একদিন গভর্ণরের মতের বিরুদ্ধে তাল ঠুকে দাঁড়াচ্ছেন, কোন দিন বা খেলার মাঠে ফুটবল লাগাচ্ছেন। কখনো বা ঝাড়া মাথায় গলায় পচা আমের মালা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে চাইছেন।

একঘেয়ে দিনগুলার এইটাই পরম লাভ!

* *

যুক্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মিঃ পন্থ বলেছেন যে দেশের অগণিত অধিবাসী জীবন-মৃত হয়ে পড়ে আছে—তাদিকে সজীব ও উচ্চতর জীবনের আদর্শে উৎসাহিত করবার দায়িত্ব পালনে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

দেশের চারদিকে অনশন ধর্ম্মঘটের হিড়িক দেখেও আদর্শের উচ্চতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ।

* *

আসামের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ শাল্ তাঁর বার্ষিক রিপোর্টে উক্ত প্রদেশের খৃষ্টান মিশনারীদের সম্বন্ধে কতকগুলি সত্য মন্তব্য করে খৃষ্টানজনোচিত কাজ করেছেন।

* *

এই সব ছদ্মবেশী শয়তানরা সরলহৃদয় পার্ব্বত্য জাতীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নামে তাদের ধীরে ধীরে স্বধর্ম ও আচারভ্রষ্ট করে ক্রমে ক্রমে নিজেদের সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি করে।

পাদ্রীদের কাণ্ড দেখলে স্বয়ং পবিত্রতাও লজ্জায় অধোবদন হবেন।

* *

বোম্বায়ে 'শ্রী'জিন্না ও 'মৌলানা' গান্ধীর মধ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিষয়ে মোলাকাৎ হল; রোমে মুসোলিনী ও হিটলারের হল কোলাকুলি।

আলীপুরের মানমন্দির কোন খবর প্রকাশ করে নি!

* *

প্রকাশ যে একদল রিপোর্টার গান্ধি-জিন্না মোলাকাতের সময়ে হাজির হওয়ায় গান্ধিজী বলেছিলেন, "ওদের কে আসতে দিলে? ওরে গুলী করে মারো!"

কথাটা যে ভাবেই বলা হোক ভাবছি, মুনিদেরও মতিভ্রম ঘটে!

* *

জবাহরলাল এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বলেছেন যে পৃথিবী এখন যুদ্ধ ও বিপর্য্যয়ের সীমায় এসে উঠেছে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের চেয়ে তিনগুণ বেশী ব্যয় হচ্ছে সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের পিছনে। আন্তর্জাতিক নীতির যেটুকু অবশিষ্ট

ছিল তা ঘুচে গেছে। ফ্যাসিজ্‌ম্ পৃথিবীর বুকে যে নির্লজ্জ পাশবিক গুণ্ডামীর প্রচলন করবার আকাঙ্ক্ষা করছে মাঞ্চুরিয়া, ইথিওপিয়া, স্পেন ও অষ্ট্রিয়া সেই নববিধানের রক্তরঞ্জিত সাক্ষী দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষ ভবিষ্যতের কথা ভেবেও শুধু দর্শক রূপে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

'তীব্র' প্রতিবাদ সভা করুক!

* *

ইদানীং জাপানীরা চীনাদের হাতে হেরে যাচ্ছে বলে কাগজে খবর আসছে।

শান্তিনিকেতনের চীনা অধ্যাপক ভারতের অগ্নিগর্ভ বাণী নিয়ে স্বদেশে হাজির হয়ে গেছেন!

* *

বঙ্কিম-জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান নানাস্থানে হয়ে গেল। যেখানেই বন্দেমাতরম সঙ্গীত গীত হয়েছে কাগজের মারফৎ জানান হয়েছে "বন্দেমাতরম্ (সম্পূর্ণ)..."

ক্রিকেট খেলায় যেমন 'L. B. W. (new)' লেখা হয়—!

* *

সারা ভারতের মেড়ো, ভাটিয়া, গুজরাতিরা এসে বাংলা ও বাঙালীর অর্থ সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিচ্ছে, তাতেও নিস্তার নেই—বাঙালী মেয়েদের দিকেও তাদের দৃষ্টি পড়েছে। প্রতিদিন কাগজে বিবাহের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে এই সব বেয়াদপদের দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত হতে হয়।

বিয়ের নামে কর্ম্মস্থলে ২।৪টা 'মেয়েমানুষ' রাখবার ফন্দি!

* *

বৈদেশিক ধনী ব্যবসায়ীরা মেক্সিকোয় অর্থের জোরে নানাবিধ অপকর্ম্ম করে সেদেশের সমূহ ক্ষতি করেছিলেন, জনসাধারণ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে নানা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করছিল। এই বৈদেশিকদের মধ্যে বৃটিশ ও আমেরিক্যান তেলের কল-কারখানার কর্ত্তারাই ছিল প্রধান। প্রেসিডেন্ট কার্ডেনাস এদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে যুক্তি সঙ্গতভাবে ক্ষতিপূরণ করা ভিন্ন তিনি আর কিছু করতে পারেন না।

এইরূপ সুদৃঢ় পদাঘাতে—!

* *

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে কয়টি বিশেষ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছিল সেই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার বাঙলা সরকারের আনুকূল্যে হস্তান্তরিত করেছেন। এর ফলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাঙলা সরকারের ইচ্ছা বা খেয়ালই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

'বাঙলার বাঘের' সেই 'ফ্রিডম্ ফার্ষ্ট, ফ্রিডম সেকেণ্ড, ফ্রিডম্ অল্‌ওয়েজ'-এর সমাধি রচিত হল!

* *

অষ্ট্রীয়ার জনৈক বিদুষী মহিলা ভারত-ভ্রমণ করে ভারতের নারী ও পর্দাপ্রথা সম্বন্ধে বলেছেন যে, যে-সমস্ত পাশবিক শক্তি পাশ্চাত্যের নারীত্বকে ধ্বংস করে ফেলেছেন সেইগুলি থেকে ভারতের নারী সমাজকে রক্ষা করবার জন্যে পর্দা প্রথার সৃষ্টি।...ভারতবাসী ভারতের নারীকে পর্দার পিছনে নির্জ্জনতার মধ্যে পৃথক করে বৃহৎ পরিবারের সুচারু আবেষ্টনের মধ্যে শান্তিতে রেখেছে।...একমাত্র স্বাস্থ্যের দিক দিয়েই পাশ্চাত্য জীবন অনেক ভাল।

সোনাতনী টিকি এতে সগর্ব্বে আন্দোলিত হবে!

* *

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুয়ার কংগ্রেস বা কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের কাছে রুদ্ধ ছিল—বর্ত্তমান লাটের আমলে এই স্বেচ্ছাচার নীতি শিথিল হওয়ায় কয়েক মাস আগে জবাহরলাল ও আধুনা গান্ধিজী সীমান্ত প্রদেশে গিয়ে দুর্দ্ধর্ষ পাঠানদের সঙ্গে আলাপ করে এসেছেন। প্রাণ দেওয়া নেওয়া যাদের দৈনন্দিন ব্যাপার বলে শুনি সেই দুরন্ত পাঠানরা না-কি দলে দলে অহিংসব্রত গ্রহণ করেছে!

অতঃপর সরকারের সীমান্ত সৈনিকদের জন্য বরাদ্দ অর্থব্যয় না মঞ্জুর করে দেওয়া হোক!

অর্চ্চনা

৩৫ বর্ষ | বৈশাখ—১৩৪৫ | ৩য় সংখ্যা

ভারতের জাতীয়-সঙ্গীত

—শ্রীকমলাকান্ত বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ডাঃ জয়ন্ত কুমার দাশগুপ্ত প্রণীত "A critical study of the life and novels of Bankim chandra" গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র STATESMAN লিখিয়াছেন,—"BANDE MATARAM is to day India's national anthem and Bankim ranks with de Lisle *as one of the great anthem writers,"* যে সঙ্গীত দেশের শ্রেণীধর্ম্মনির্ব্বিশেষে কোটি কোটি কণ্ঠে গগন-পবন বিদারিত করিয়া পাঞ্চজন্যনিনাদের ন্যায় এককালে সমুত্থিত হইয়াছিল তাহা সাধারণ সঙ্গীত নহে আর তাহার রচয়িতাও সাধারণ রচয়িতা নহেন। বঙ্কিম কোন্ সময় 'বন্দে মাতরম সঙ্গীত রচনা করেন তাহা আমাদের অবিদিত ; হয়ত আমরা ইহা ১৮৭৯ সালে বা তৎপূর্ব্বে পাইয়া থাকিব। এই সঙ্গীত রচিত হইবার পূর্ব্বে বা পরে স্বদেশানুরাগব্যঞ্জক সঙ্গীত আমরা যে আর কখনও পাই নাই তাহা নহে। তথাপি এই সঙ্গীত জাতীয়-সঙ্গীতের মর্য্যাদালাভ করিল কেন এবং এই সঙ্গীত রচয়িতাই বা জাতীয়-সঙ্গীত রচয়িতার পদগৌরব লাভ করিলেন কেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বঙ্কিম যখন 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত রচনা ও প্রচার করেন তখন ভারতের জাতীয়-জীবন নিস্তরঙ্গ জলধিতলের ন্যায় ধীর স্থির অচঞ্চল ছিল। এই সঙ্গীত "আনন্দমঠ" এর সহিত প্রচারিত হইবার পর বিংশতি বা তদূর্দ্ধ বৎসর পর্য্যন্ত জাতির সুপ্তসংবিৎ উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই—জাতির আত্মশক্তি উপলব্ধির কোন প্রেরণাই আনে নাই। অতঃপর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া দেশোদ্ধারের ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য দিকে দিকে যে আয়োজন হইল তাহার বীজমন্ত্র হইল 'বন্দে মাতরম্'—এতদিন 'বন্দে মাতরম্' এর মধ্যে যে অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল তাহার উদ্দীপনা জাতির বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত জড়তা অবলোপে হিম-যবনিকার ন্যায় লোকচক্ষুর অগোচরে অপসারিত করিল এবং এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া দিকে দিকে নবজাগ্রত জাতির অভিযান চলিল—জাতির স্তিমিত জীবন-জলধিবক্ষে যে চাঞ্চল্য এতদিনে উদ্বেল হইয়া উঠিল তাহার ঘাত প্রতিঘাত সমগ্র দেশকে যে ভাবে আন্দোলিত করিয়াছে তাহার ইতিহাস কাহারও অবিদিত নাই।

যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। বঙ্কিমের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল,—"একদিন দেখিবে, বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, এই গান লইয়া বাঙ্গালা উন্মত্ত হইয়াছে—বাঙ্গালা মাতিয়াছে।" দূরদর্শী কবির বাণী আজ বর্ণে বর্ণে সার্থক হইয়াছে, তাই বঙ্কিম আজ ঋষিপদবাচ্য—তাঁহার 'সঙ্গীত' আজ আর সুললিত শব্দসমষ্টিমাত্র নহে, ইহা 'মন্ত্র' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। এ মর্য্যাদা এ দেশের আর কোনও কবির ভাগ্যে জুটে নাই, কোন কবির সঙ্গীত এ মর্য্যাদা

লাভও এ দেশে আর করে নাই—তাই বঙ্কিম আজ STATESMAN এর ভাষায় "a great anthem writer" ও 'বন্দে মাতরম্' "India's national anthem. বাঙ্গালা মাতিয়াছে সত্য, কিন্তু সে কেবল নিজেই মাতে নাই, ভারতের সমস্ত দিগ্‌দেশকে মাতাইয়াছে। দেশপ্রেমের যে পবিত্র হোমানল বঙ্গে প্রথম প্রজ্জলিত হইয়াছিল তাহার উদগ্র উদ্দীপনা সমগ্র দেশকে অধিকার করিতে ছুটীয়াছিল 'বন্দে মাতরম্' কেবল বাঙ্গালীরই জাতীয় জীবনের বোধন মন্ত্র নহে, ইহা বহু স্থলেই ভারতের জাতীয়-চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সাম্প্রাদায়িকতা ভারতের জাতীয়-জীবনে সম্প্রতি যেরূপ বিষ বিসর্পিত করিয়া চলিয়াছে তাহার পরিণাম নিতান্ত ভয়াবহ। পরস্পর অন্তকলহে ইন্ধন যোগাইয়া কোন জাতি কোনদিন বিজাতীর অধিনতাপাশ লইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ সাক্ষ্য নাই। আমাদের মধ্যে পরস্পর যতই অনৈক্য ও ব্যবধানের সৃষ্টি হইবে দেশের মুক্তি সংগ্রাম পদে পদে ততই ব্যাহত হইবে। গত পহেলা এপ্রিল ভারতের সর্ব্বত্র প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নাম দিয়া যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে এই অনৈক্য ও ব্যবধান যাহাতে স্থায়ী হয় তাহারই স্থূল ব্যবস্থা হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সাম্প্রাদায়িকতা যে আমাদের মরণাস্ত্র বই আর কিছু নহে ইহা বুঝিয়া চলিবার দিন আসিয়াছে।

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত আমাদের জাতীয় জীবনে এক অচ্ছেদ্য পরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছে—ইহা আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে তাহার মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। কংগ্রেস যে তাহা অবগত নহে তাহা নহে, কেননা ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গত ২৮এ অক্টোবর 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব-গ্রহণকালে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল,—"The song and the words 'Bande Mataram' were considered seditious by the British Government and were sought to be suppressed by violence and intimidation. At a famous session of the Bengal Provincial Conference held in April 1906, under the presidentship of Mr. A. Rasul, a brutal lathi-charge was made by the police on the delegates and volunteers and the 'Bande Mataram' badges worn by them were violently torn off. Some deligates were beaten so severly as they cried 'Bande Mataram' that they fell down senseless. Since then, during the past 30 years, innumerable instances of sacrifice and suffering all over the country have been associated with 'Bande Mataram' and men and women have not hesitated to face death even with that cry on their lips. The song and the words thus became symbols of national resistance to British Imperialism in Bengal specially, and generally in other parts of India. The words 'Bande Mataram' became a slogan of power which inspired our people, and a greetings which ever reminded us of our struggle for national freedom."

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ক' কএকজন অদূরদর্শী স্বার্থান্বেষী হিন্দু বিদ্বেষভাবাপন্ন সাম্প্রাদায়িকতাবাদী মুসলমানের অসার অভিযোগ ও অযথা আপত্তির উপর নির্ভর করিয়া কংগ্রেস জনমত উপেক্ষা করিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন,—"Taking all things into consideration therefore the Committee recommend that wherever the 'Bande Mataram' is sung at national gatherings only the first two stanzas should be sung, with perfect freedom to the organisers to sing any other song of an unobjectionable character, in addition to, or in place of, the 'Bande Mataram' song." যে 'বন্দে মাতরম্' গান ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে নানা সভা-সমিতি শোভাযাত্রায় কংগ্রেসের সভ্যগণ গত ত্রিংশপূর্ব্ব বৎসর সমস্বরে গাহিলেন এবং নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পর ক'একটী প্রদেশে তাঁহারা মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া শাসন কার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলে আইন-সভার বৈঠকেও যাহার ঝঙ্কার উঠিল তাহার

প্রতি সহসা তাঁহাদের এই অবজ্ঞা জ্ঞাপক মনোভাব দেখাইয়া তাঁহারা জাতির দেশাত্মবোধকে যে ভাবে অবমানিত করিয়াছেন তাহা ১৯০৫ সালে জনমত উপেক্ষা করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে ভাবে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন একমাত্র তাহার সহিতই তুলনীয়।

ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করিয়াই কংগ্রেস যে ক্ষান্ত হইবেন এরূপ মনে হইতেছে না—ইহাকে নির্ম্মূল করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। কেননা, সেদিন BOMBAY CHRONICLE লিখিয়াছেন,—"The Congress has been making use of only the first two stanzas and recently the Working Committee has appointed a sub-committee to go into the whole question of the retention of the stanzas or their substitution by any better ones to suit the needs of a national song." কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত কি 'ফরমাইস মাফিক' তৈয়ারী করা যাইতে পারে? স্বদেশানুরাগপূর্ণ গীত মাত্রই কি জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হইতে পারে? যে সঙ্গীত শাসকের কঠোর নির্য্যাতনে শক্তিলাভ করিয়াছে এবং গায়কের অকুণ্ঠিত আত্মদানে প্রাণবন্ত হইয়াছে তথা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা কি আইনের নিষেধ ঘোষণা করিয়াও সংহার করা যাইতে পারে?

এক্ষনে আমরা ইহার বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি অভিযোগ আনয়ণ করা হইয়াছে এক এক করিয়া তাহার আলোচনা করিব। ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রধানতঃ চারিপ্রকার :—(১) ইহা ইসলাম-বিরোধী; (২) ইহা পৌত্তলিক-ভাবাপন্ন; (৩) ইহা অহিংসাদ্যোতক নহে এবং (৪) ইহার ভাষাগত আপত্তি।

(১) 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটী ইস্লাম বিরোধী হইল কিসে তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। যদি এই অভিযোগ সত্য হইত, তাহা হইলে "পয়াম্," "মদিনা", "হিন্দ্", "আদবি দুনিয়া", "রিয়াসত", "আজিজ্-উল-মুল্ক্" প্রভৃতি সাময়িক প্রতিপত্তিশালী মুসলমান পত্রগুলি "ইস্লাম ধর্ম্মের দৃষ্টিতে 'বন্দে মাতরম্' নির্দ্দোষ জাতীয় সঙ্গীত এ অভিমত প্রকাশ করিত না। অভিন্ন, খিলাফৎ ও অসহযোগ-আন্দোলনের যুগে মুসলমান নেতৃগণের সম্মুখে এই সঙ্গীত অসংখ্যবার গীত হইয়াছে—সহস্র সহস্র হিন্দু দেশ-সেবকের ন্যায় মুসলমান দেশসেবকগণও এই সঙ্গীত উচ্চারণ করিতে করিতে অমানুষিক নির্য্যাতন ও পরিশেষে সুদীর্ঘ কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, কই তখন তো এ সঙ্গীতের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ কেহ আনে নাই যে এই সঙ্গীত ইস্লাম বিরোধী, অতএব ইহা নিষিদ্ধ হউক।

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটী "আনন্দমঠ" উপন্যাসের সহিত অনুস্যূত—এই উপন্যাসখানি মুসলমান বিদ্বেষপ্রসূত, অতএব ইহার অন্তর্ভুক্ত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটী ইসলাম বিরোধী, এরূপ অভিযোগও শুনা গিয়াছে। বঙ্কিম মুসলমান বিদ্বেষ লইয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন—ইহা কিরূপে স্বীকার করিব? "রাজসিংহ" নামে বঙ্কিমের যে আর একখানি উপন্যাস আছে তাহার উপসংহারে "গ্রন্থকারের নিবেদন" স্বরূপ তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেই মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার মনোভাব সুপ্রকট। সেক্সপীয়রের "Macbeth" নাটকে লেডী ম্যাক্বেথ হননচিন্তায় উন্মত্ত বলিয়া সেক্সপীয়রকে যদি হত্যাকারী বলা না চলে, মহাকবি মিল্টনের "Paradise lost" মহাকাব্যে শয়তান সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছে বলিয়া মিল্টনকে যদি ঈশ্বর-দ্রোহী বলা না চলে, বঙ্কিমের উপন্যাসে ("আনন্দমঠ") ভবানন্দ মুসলমান বিরোধী বলিয়া বঙ্কিমকে, মুসলমান বিরোধী বলা চলিবে কিরূপে? সেক্সপীয়রের "Merchant of venice" প্রকাশিত হইবার পর দিন শতাব্দীর উপর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইহুদীগণ ইহাকে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে শুনা যায় নাই, তবে মুসলমান বন্ধুগণের "আনন্দমঠ" বন্ধ করার হেতু কি? "আনন্দমঠ" যে দুর্ভিক্ষ উপলক্ষ করিয়া রচিত তাহা ১৭৬৯-৭০ সালের ঐতিহাসিক সত্য। ইংরাজ বাঙ্গালার দেওয়ানি পান ১৭৬৫ সালে, কিন্তু রাজা তখনও মুসলমানেরই ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন এই দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুকবলিত হয়। কিন্তু সরকার যেরূপ

কঠোরতার সহিত রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন তাহাতে রাজস্বের পরিমাণ বিশেষ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষুধার্ত্তগণ যদি এরূপ সরকারের উচ্ছেদসাধনে তৎপর হয়—তাহা কি একান্ত অস্বাভাবিক? "বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং" 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটীতে "রিপুদলবারিণীং" বলিয়া যে সমাসবদ্ধ পদটি রহিয়াছে তদ্দারা একটী শত্রুপক্ষের অস্তিত্ব আশঙ্কা করিয়া মুসলমানগণ যদি উহা তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে মনে করেন, তবে তাহা নিতান্তই অযৌক্তিক। "আনন্দমঠ" উপন্যাসে যে যুদ্ধের কাহিনী আছে তাহা ইংরাজদিগের (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি) সৈন্যগণের বিরুদ্ধে করা হইয়াছিল। অতএব "রিপুদল" কথাটিতে যদি কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিতই থাকে তবে ইংরাজদিগের সৈন্যগণই সেই "রিপুদল"। বঙ্কিমের-সময়ে বিহার ও উড়িষ্যাসহ বঙ্গের সমগ্র জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি—গীতে বঙ্গজননীর এই সাত কোটি পূজারীর উল্লেখ আছে। "সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে"—এই সাত কোটির মধ্যে অহিন্দুগণকেও ধরা হইয়াছে। অতএব সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা গেল "আনন্দমঠ" ও তৎসংলগ্ন 'বন্দে মাতরম্' গান মুসলমান বিদ্বেষ হইয়া রচিত—এ অভিযোগ সর্ব্বৈব অমূলক।

(২) 'বন্দে মাতরম্' এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ—ইহা পৌত্তলিক-ভাবাপন্ন। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত জননী জন্মভূমির বন্দনাগীতি। দেশকে মাতৃরূপে জ্ঞান করিয়া তাহার বন্দনাগীতি করা যদি পৌত্তলিক হয়, তাহা হইলে জাতীয় পতাকার সম্মুখীন হইয়া নতশিরে তাহাকে অভিবাদন করা কি তদধিক পৌত্তলিকতার পরিচায়ক নহে? ঋগ্বেদে মহর্ষি অত্রি ধ্যাননেত্রে পৃথিবীদেবীর রূপাবলোকন করিয়াছিলেন—ঋগ্বেদে পৃথিবীদেবীর রূপবর্ণনায় যে সব বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে বঙ্কিম তাহার অনেকগুলি ব্যবহার করিয়াছেন (যথা ঋগ্বেদে 'মাতরম্' 'ভূমিন্' 'পৃথিবীম্' 'যুবতিম্' ইত্যাদি)—বঙ্কিম ধ্যানযোগে মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপটী, পৃথিবীদেবতার সেই অপূর্ব্ব রূপটি, বেশ ধরিতে পারিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মাতৃভূমি অবশ্য জড়পদার্থ—কিন্তু জড় বলিয়া যে কিছু নাই, সমস্ত চৈতন্যময়, এই মহনীয় সত্য আচার্য্য জগদীশ অংশতঃ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন; ইহা কিন্তু অভিনব আবিষ্কার নহে, এই সত্য ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত ওতপ্রোত। অলঙ্কার শাস্ত্রে Prosopopoeia বলিয়া একটা কথা আছে। যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে Alma-Mater জ্ঞান করা পৌত্তলিক ভাবপ্রসূত না হয়, তাহা হইলে জন্মভূমির উপর মাতৃত্ব-আরোপ কিরূপে পৌত্তলিক-ভাবোদ্দীপক হইতে পারে? কবি সার মহম্মদ ইক্‌বাল তাঁহার "নয়া শিবালা" কবিতায় বলিয়াছেন—মাতৃভূমির প্রতি ধূলিকণা তাঁহার উপাস্য মূর্ত্তির মত। ইহাতে কি উক্ত কবিতাটী পৌত্তলিক কবিতা বলিয়া বুঝিতে হইবে? মহাকবি মিল্টন তাঁহার অমরকাব্যে "Hail, holy light! offspring of Heav'n first-born" ইত্যাদি বলিয়া আলোকের যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন সেজন্য তাঁহার "Paradise Lost" মহাকাব্যখানি পৌত্তলিক কাব্য বলিয়া ধরিতে হইবে? রবীন্দ্রনাথকে পৌত্তলিক বলিয়া কেহ কখনও শুনে নাই, কিন্তু তাঁহার "বাল্মীকি-প্রতিভা" নাটকে কালী বিষয়ক ক'একটি গান থাকায় বইখানি কি পৌত্তলিক বই বলিতে হইবে? "আনন্দমঠ" উপন্যাস 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' বা 'বন্দে মাতরম্' গান দুইটী সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া বইখানি কি পৌত্তলিক-পুস্তক হইয়া গেল? মুসলমানগণ যখন বিদেশীয় সাহিত্যে Saturn, Mammon, Muses, Cupid, Hercules, Proteus প্রভৃতি নানা দেবদেবতার আখ্যান পাঠ করেন তখন তাহা নিঃশব্দেই করিয়া যান, কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' গীতে

"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং"

দেখিয়া অধুনা এত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন কেন? মসজিদের সম্মুখে বাদ্য নিষেধকল্পে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শ্রী' ও পদ্ম প্রতীকের উচ্ছেদসাধনকালে তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে যে হিন্দু-বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন, এ ক্ষেত্রেও কি সেইরূপ মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিতেছেন না? যে কবি এই গান রচনা করিয়াছেন তিনি পৌত্তলিক তো কোনোদিনই নহেন, উপরন্তু 'বন্দে মাতরম্' গানে কোন পৌত্তলিক ভাবপ্রাণদনও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। 'বন্দে মাতরম' গানে জন্ম-

ভূমিকে "দুর্গা," "কমলা", ও "বাণী" রূপে উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী শক্তি, সম্পদ্ ও জ্ঞানরূপেই অঙ্কিত করিয়াছেন। আর যখন তিনি বলিতেছেন—"তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"—তখন বহু দেববাদের স্থান কোথায়? "আনন্দমঠ" এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচ্ছেদে তিনি চিকিৎসকের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—"তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতনধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক—কর্ম্মাত্মক নহে"। ইত্যাদি আশা করি এই আলোচনার পর 'বন্দে মাতরম্' গান পৌত্তলিক ভাবাপন্ন—এ অপবাদ আর দেওয়া চলিবে না।

(৩) 'বন্দে মাতরম' গানের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ—ইহা অহিংসদ্যোতক নহে। এই সঙ্গীতে "দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে," "রিপুদলবারিণীং' ও "দশপ্রহরণধারিণী" এই ক'একটি শব্দপ্রয়োগ দেখিয়াই কি এই অভিযোগ? "খরকরবাল" ও "দশপ্রহরণ" যদি হিংসার ভাব উদ্রেক করে, তবে হইলে বৃটিশ পার্ল্যামেণ্ট Speaker-এর সম্মুখভাগে শান্তিশৃঙ্খলারক্ষার স্মারকস্বরূপ যে ধাতুনির্ম্মিত মুদ্গর স্থাপিত থাকে তাহাও তো সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের মনে হিংসার ভাব আনিয়া দিতে পারে? কিন্তু এরূপ কল্পনা মূঢ়তার পরিচায়ক এবং একান্ত হাস্যোদ্দীপক মুদ্গর যদি পার্ল্যামেণ্ট ভবনে শৃঙ্খলানুবর্ত্তনের স্মারকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে দেশমাতৃকার করে "খরকরবাল" ও "দশপ্রহরণ" শক্তির প্রতীকস্বরূপ কল্পিত হইতে পারিবে না কেন? রবীন্দ্রনাথ চিরকাল অহিংসায় উপাসক, কিন্তু তিনিও লিখিয়াছেন—

(ক) 'ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
ললাটে নেত্র আগুন বরণ।'

(খ) 'তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে
লুকায় অশনি।'

এই ছত্রগুলি যদি হিংসার উদ্দীপক না হয়, তাহা হইলে 'বন্দে মাতরম্' গানে হিংসার অবকাশ কোথায়? ইংরাজকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির শান্ত সৌম্য মূর্ত্তিটীর ধ্যান করিতেই ভালবাসিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহার 'Peel castle' সম্বন্ধীয় কবিতায় প্রকৃতির সাময়িক বীভৎস শ্রী যেরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে প্রকৃতির হিংসার কোনও ইঙ্গিত নাই। সময়ে সময়ে প্রকৃতি ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্র ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত জলপ্লাবনে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেও প্রকৃতির অন্তঃস্থলে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত। জননী জন্মভূমির প্রহরণধারণ তদ্রূপ হিংসামূলক নহে—তিনি প্রকৃতির ন্যায় তাহা অহিংসভাবেই ব্যবহার করিবেন,' কেননা মাতৃমনে হিংসার কোন স্থান নাই। বাহুবল ও অস্ত্রবলকে বিলোপ করিয়া এ জগতের কোথাও কোনও রাষ্ট্রের অবস্থানের কথা শুনা গিয়াছে? কিন্তু শক্তির অর্থ হিংসা নহে—অমঙ্গল বিনাশন ও আভ্যন্তরীণ শক্তিরক্ষার্থই শক্তির প্রয়োজন। অতএব দেখা গেল 'বন্দে মাতরম্' গান হিংসাত্মক—এ অপবাদ অযৌক্তিক।

(৪) 'বন্দে মাতরম্' গানের বিরুদ্ধে আর এক অভিযোগ ইহার ভাষা সম্বন্ধীয়। এই গানে "রিপুদলবারিণীং", "দুর্গা", "কমলা"—"বাণী" ও তাহাদের বিশেষণগুলি সম্বন্ধে আপত্তি উঠিয়াছে। "রিপুদল" পদটীর দ্বারা যে মুসলমানদিগের প্রতি কটাক্ষ করা হয় নাই, 'দুর্গা'-'কমলা'-'বাণী' শব্দত্রয়ের দ্বারা যে পৌত্তলিকতা সূচিত হয় নাই, "দশপ্রহরণধারিণী" ও 'ভুজৈর্ধৃতখরকরবালে' সমাসবদ্ধ পদদ্বয় দ্বারা যে জননীর কোন হিংস্রভাব প্রকটিত হয় নাই—তাহা 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের বিরুদ্ধে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযোগ আলোচনাকালে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটীর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ গত ২৯এ অক্টোবর তারিখে এক পত্রে কংগ্রেস-সভাপতিকে লিখিয়াছেন'—"To me, the spirit of tenderness and devotion expressed in its first portion, the emphasis it gave to the beautiful and beneficient aspects of our Motherland, made special appeal, so much so that I found no difficulty in dissociating it from the rest of the poem and from those portions of the book of which it is a part, with all the sentiments of

which, brought up as I was in the monotheistic ideals of my father, I could have no sympathy." কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে ও ব্রহ্ম-সঙ্গীতে শিব, শঙ্কর' শঙ্করী, শম্ভু, বিষ্ণু, মহেশ প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধে কি বলেন? যদি এই শব্দগুলি সত্ত্বেও তাঁহার একেশ্বরবাদ পৌত্তলিকতার স্পর্শযুক্ত থাকিতে পারে, তবে 'বন্দে মাতরম গানে দুর্গা-কমলা-বাণী শব্দত্রয় প্রয়োগ আপত্তিকর হইতে পারে কিরূপে?

যে যুগে এই সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল তখন বিহার ও উড়িষ্যা বাঙ্গালার সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল এবং সমগ্র বঙ্গ প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি। পরে ইহাকে সমগ্র ভারতের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য 'সপ্তকোটি' স্থলে 'ত্রিংশকোটি' এবং দ্বিসপ্তকোটি' স্থলে 'দ্বিত্রিংশকোটি' করা হয়—ইহাই যখন সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা। সাত কোটিই হউক আর ত্রিশকোটিই হউক—উভয় সংখ্যার মধ্যেই মুসলমান জনসংখ্যা ধরা হইয়াছে। বর্ত্তমানে অবশ্য ভারতের জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, সে হিসাবে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সাথে সাথে অনবরত যা'র কণ্ঠ ও ভুজসংখ্যার নির্দ্ধারণকল্পে গানটীতে অন্ততঃ এই দুই স্থলে পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বোধ-উদ্রেক করার নিয়ম আছে। উদাহরণস্বরূপ, কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার "Daffodils" সংক্রান্ত কবিতায় লিখিয়াছেন—

"Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance."

এখানে 'ten thousand' বলিতে অসংখ্য বুঝাইতেছে, সেইরূপ জাতীয় সঙ্গীতে 'ত্রিংশকোটি' বা 'দ্বাত্রিংশকোটি' 'কোটি কোটি' অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে।

'বন্দে মাতরম্' গানটি ক'একটী সুললিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পদের সমাবেশ—এই মিশ্র ভাষার অন্তর্নিহিত ভাবটী কিন্তু অতি সুমধুর, অতি মনোমোহকর, অতি দেশ-প্রীতি-উদ্বোধক। আমরা ভাবের উপাসক—ভাষা তাহার বাহক। ভারতের আর্য্যভাষা সংস্কৃত, বঙ্গভাষা তাহা হইতে সমুদ্ভূত। এই দুই ভাষার ন্যায় সুসমৃদ্ধ সুমধুর প্রাণস্পর্শী ভাষা এ দেশে আর নাই। যদি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় 'বন্দে মাতরম্' গান রচিত বলিয়া অভিযোগ উঠে যে ইহা জাতীয় সঙ্গীত হইতে পারে না, তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে ভারতের জাতীয় ভাষা তো কিছুই নাই, তাহা এ ক্ষেত্রে ভারতে প্রচলিত শত শত ভাষা ও উপভাষায় মধ্যে কোনটি জাতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইবে? ভারতের lingua franca বলিয়া যখন কোনও ভাষাই নাই, তখন জাতীয় সঙ্গীতের জাতীয় ভাষা বলিয়া কোন কথা এখন উঠিতে পারে না, বিশেষতঃ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে—ইহার বিরুদ্ধে ভাষাগত কোনও অনুযোগ, অভিযোগ এখন উঠিতেই পারে না। ভাবের দিক্ দিয়াও ইহাতে অন্যান্য দেশের জাতীয় সঙ্গীতের ন্যায় শত্রুভীতি; নব-জয়োল্লাস, অন্য জাতির প্রতি ঈর্ষা, ঘৃণা আক্রমণের ইঙ্গিত-উৎসাহ, দর্পের প্রবলতা প্রভৃতি আপত্তিকর ভাব কিছুই নাই। এ ক্ষেত্রে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ বা উচ্ছেদসাধন কি অভিযোগ-কারীদিগের কুচক্র নহে?

আয়োজন মোর হবে কি সফল ?

শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

মধুপুর হ'তে এসেছে আমার যাবার নিমন্ত্রণ,
বারতা এনেছে লিপি-দূতী ব'হে নীরবে হেথায় আজ'
অতীতের স্মৃতি নূতন করিয়া জাগে অন্তর-মাঝ,
মায়াবিনী আশা বলে, "কর ত্বরা যাত্রার আয়োজন।"

আয়োজন মোর হ'বে কি সফল সুদূর পথের প্রিয়া ?
সফল হ'বে কি সখী-দরশন শুভ্র চাঁদিনী রাতে ?
ব'সে র'ব দোঁহা মুখ চেয়ে তটিনীর কিনারাতে,
উথলিবে প্রীতি আঁখিতে আমার তব আঁখি নিরখিয়া।

নিরখিয়া তব আপেল-বিজয়ী, দারু কপোলের শোভা...
তারায় তারায় কল-গুঞ্জন চলিবে আকাশ পথে,
চাঁদের কিরণ নদী-সৈকতে নামিবে রূপালী রথে...
পান করিবারে, বিদেশিনি, তব রূপ-সুধা মনোলোভা।

মনোলোভা শুধু নহে রূপ তব, অন্তর সুধাময়,
বিকশিত হ'ল মোহনীয় প্রেম সেথা লোক-অগোচরে,
খুলিবারে চাও ভাণ্ডার যা'র মীনকেতনের শরে,
ওগো মায়াবিনি, অতিথি তা'রে কি পারিবে করিতে জয় ?

ব্যর্থ জীবন

শ্রীউমা চরণ ধর

ব্যর্থ জীবনের শেষে মনে পড়ে আজ—
শত আশা আকাঙ্ক্ষার প্রথম জীবন—
ইন্দ্রধনু স্বর্ণমৃগ মোহনীয়া সাঁজ—
কল্পনার কামনার কিশোর যৌবন।
তারপর কর্ম্মস্রোত অবিরাম গতি
কভু বক্র কভু ক্রুর কভুবা সরল
সাথে সাথে চলিয়াছে অজেয়া নিয়তি
নতশির করি সর্ব্ব কর্ম্ম বুদ্ধি বল
করিব ভেবেছি এক করিয়াছি আর
ভুলভ্রান্তি শত ত্রুটি দুর্বুদ্ধি অপার—
জানিতে পারেনা রোগী - ভিষক কখন
অজ্ঞান করিয়া অঙ্গ করেছে ছেদন
আজিকের আমি দেখি অতীতে চাহিয়া,
ব্যর্থতায় সবদিক গিয়াছে ভরিয়া।

গল্প

দুয়ার কোরনা বন্ধ

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

অলোকা শিপ্রা আর মন্দা তিন বোন। অলোকা বেথুন কলেজের ফিলজফির প্রোফেসার, শিপ্রা স্কটীশ চার্চ কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ে, আর মন্দা ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশানে টেন্‌থ ক্লাশে পড়ে। আগে ওরা নিজের নিজের কলেজ হষ্টেলে থাকতো, কিন্তু অত দূরে দূরে থাকলে তিন বোনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় খুব কম, সেই জন্য ওরা সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে একটী বাড়ীর কয়েকটি ঘর ভাড়া করে ঝি বাঁধুনী ইত্যাদির সঙ্গে থাকে। ওদের মা গৌহাটীতে ভাইয়ের বাড়ীতে থাকেন, মৃত্যুর সময় স্বামী সামান্য যা কিছু রেখে গেছিলেন সেই অর্থে তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে তিনি মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিচ্ছিলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা অলোকার এইবার একটী মনের মত ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেন, আর তাঁর ভাইরাও এ বিষয় তাঁকে যথেষ্ট সচেতন করে দিচ্ছিল, কিন্তু মেয়ে ধনুর্ভঙ্গ-পণ করে বসে আছে সে বিয়েই করবে না।—

অলোকারা যে বাড়ীতে থাকত তার নীচের তলায় এতদিন ভাড়া ছিলেন একজন স্কুল মিস্‌ট্রেস। মহিলাটি ওদের তিন বোনকে ভারী ভালোবাসতেন। পর হলেও তিনিই ওদের অভিভাবিকার মত থাকতেন, কিন্তু তিনি ঢাকায় একটী ভালো কাজ পাওয়াতে কয়েকদিন হ'ল সেখান থেকে চলে গেছেন। তিনি চলে যাবার প্রায় এক হপ্তা পর পর্য্যন্ত মন্দার চোখে জল রইল। শিপ্রা বললে, চল দিদি এই বড়দিনের ছুটিটা কোথাও বাইরে গিয়ে কাটিয়ে আসা যাক এখানে থাকতে আর ভালো লাগছে না"—মন্দা বললে, "মার কাছে চলনা বড়দি"? অলোকা বোনেদের গায় হাত বুলিয়ে বললে, "তাত এখন হয়না বোন, সামনেই মন্দার পরীক্ষা, তারপর আমার হাতে এখন একটী ম্যাট্রিকের ছাত্রী রয়েছে ওকাজ কামাই করা চলবে না। তারপর মামা লিখেছেন—সামনের মাসে আমাদের টাকা কিছু কম পাঠানো হবে, কারণ মার চিকিৎসায় নাকি অনেক খরচ হচ্ছে"।

শিপ্রা বললে, "তবে চল দিদি কাল ডায়মণ্ডহারবার গিয়ে পিকনিক করে আসা যাক"

অলোকা বললে "বেশ"—ঠিক সেই সময় বাইরে জুতোর শব্দ শুনতে পেয়ে শিপ্রা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "ওই মাষ্টার মশাই এসেছেন, কাল ত আর গান শেখা হবে না ওঁকে আসতে বারণ করে দিই বড়দি" অলোকা মৃদু হেসে বললে, "বেশ ত দে"।

তার দিন কয়েক পরের কথা—

বড়দিনের ছুটিতে সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ। অলোকা গেছে মার্কেটে কয়েকটী প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে, আর মন্দা নিজের ঘরে পরীক্ষার জন্য পড়ছে আর শিপ্রা হাতে একটা সেলাই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। সেই সময় ওদের দরজায় একটী থার্ডক্লাশ ছাকড়া গাড়ী এসে দাঁড়াল, আর তার পিছনে দুই গরুর গাড়ী বোঝাই গৃহস্থালীর যাবতীয় জিনিষ। প্রথমে গাড়ী থেকে নামলেন একটী আধাবয়সী ভদ্রলোক তাঁর পিছনে একটী-প্রৌঢ়া, একটী তরুণী আর তিনটী ছোট ছেলে।—শিপ্রা বুঝল এঁরাই নীচের তলায় আজ থেকে ভাড়া এলেন। মেয়েটিকে দেখে তার মন আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল সে ছুটে গিয়ে মন্দার কাছে বললে, "এই শিগগীর দেখবি চল কারা সব এসেছে"—মন্দা তখন একমনে থিওরেমের করোলারী মুখস্থ করছিল, হঠাৎ বাধা পেয়ে সে ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠল।—শিপ্রা কিন্তু ওকে ছাড়ল না। হাত ধরে টেনে বারান্দায়—নিয়ে গেল।

তার দিন দুই তিন পর, একদিন ভরা দুপুর বেলা দুই বোনে যুক্তি করে নীচেকার বাসিন্দার সঙ্গে আলাপ করতে গেল।—

বাড়ীর গৃহিনী উঠানে যেখানে ছাদের বেড়া ডিঙিয়ে একচিলতে রৌদ্র এসে পড়েছিল সেখানে পিঠ দিয়ে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন। আর তাঁর পাশে বসে সেই মেয়েটি একটি কার্পেটে আসন বুনছিল। দুই বোনের পায়ের শব্দে তাঁরা মুখ তুলে ওদের দিকে এমন অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন যে বোনেরা ত অপ্রস্তুতের একশেষ।—কোনও রকমে মনের ভাব গোপন করে শিপ্রা বললে, "আমরা ওপর তলায় থাকি, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলুম"।

গৃহিণী চারুলতা বললেন, "তা বেশ ত, কই তোমাদের মাকে ত দেখতে পাচ্ছি না"—

শিপ্রা যখন দেখলে যে এরা ওদের বসতে বললে না তখন সে নিজেই পাটির এক পাশে বসে পড়ে বললে, "আমাদের মা দেশে থাকেন, এখানে আমরা তিন বোন কলেজে পড়ি"।

বিস্মিত কণ্ঠে তিনি বললেন, "ওমা, তোমাদের সঙ্গে কোনও পুরুষ মানুষ থাকে না, একলা থাক তোমরা"?

চারুলতার ব্যবহারে মন্দা এতক্ষণ মনে মনে ভীষণ অস্বস্তি অনুভব করছিল। এইবার রেগে বলে উঠল, "দেখুন, পুরুষ সঙ্গে না থাকলে কি আমরা এক পাও চলতে পারিনা? তারা যদি স্বাধীনভাবে পৃথিবীতে অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারে তবে আমরাই বা পারবো না কেন? তবে সীমার বাইরে যাওয়া উচিৎ নয়।—আজকাল প্রগতির দোহাই দিয়ে আমরা যা' করছি তাকে স্বাধীনতা না বলে, স্বেচ্ছাচারিতা বললে কিছুমাত্র দোষ হয় না। তবে এটা আশা করা যায় যে, এমনি করেই আমরা একদিন পথ খুঁজে পাবোই, কারণ একটা ভালো কিছু গড়ে ওঠার আগে, প্রথমে সেখানে একটা প্রলয় না হলে, সে সৃষ্টিই ব্যর্থ হয়ে যায়"—

শিপ্রা বললে "আমাদের সমাজ এত রক্ষণশীল বলেই, অন্য দেশের তুলনায় আজ আমাদের দেশ এত পিছিয়ে রয়েছে। একটা জাতি গড়ে তুলতে হলে, প্রথমে চাই সুসন্তান, সেই সুসন্তান যারা দেশকে উপহার দেবে, তারাই যদি অন্ধকারে পড়ে থাকে তবে আমাদের দেশের উন্নতি সুদূর পরাহত—"

ওদের কথা শুনে গীতা ত হেসে খুন। শেষে হাসি চাপতে না পেরে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সেখান থেকে ছুটে চলে গেল।

চারুলতা বললেন, "আমরা ত মা লেখাপড়া জানি না মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ কাজেই তোমাদের কথার কিছুই জবাব দিতে পারলুম না। আচ্ছা—"রোজ বিকেলে যে দেখি একটী ছেলে আসে সে তোমাদের কে হয়?"

শিপ্রা বললে, "তিনি আমাদের কেউ হন না, গানের মাষ্টার"—

চারুলতার মুখ কঠিন হয়ে উঠল তিনি শুধু গম্ভীর ভাবে বললেন "হুঁ" কিছুক্ষণ পর বললেন, "তা তোমাদের মা এখানে কেন থাকেন না?"

রাগে মন্দার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। শিপ্রা ধীর ভাবে অতি সংক্ষেপে ওদের সাংসারিক অবস্থা তাঁর কাছে বললে। "সমস্ত শুনে তার মনটা একটু নরম হল, কিন্তু সন্দেহ দূর হল না"।

শিপ্রা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আজ যাই মাসীমা, কাল আপনারা যাবেন আমার দিদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব"—

শিপ্রা ও মন্দার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও দুই পরিবারের মধ্যে আন্তরিক ভাবে আলাপ জমে উঠল না।

হঠাৎ একদিন শিপ্রা আবিষ্কার করল কমলের নাকি গীতাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—। অলোকা মৃদু হেসে বললে, "দূর পাগল, যার মা মেয়েকে আমাদের সঙ্গে মিশতে দিতে ভয় পায়, তারা কি তোদের মাষ্টারের সামনে মেয়েকে বার হতে দিতে পারে"?

শিপ্রা বললে, "হ্যাঁ। দিদি আমি নিজের চোখে দেখেছি, মাষ্টারমশাই কাল যখন বাড়ী যাচ্ছিলেন তখন গীতা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইছিল।"

মন্দা বিরক্ত হয়ে বললে, "যে যা করছে করুক না ছোড়দি তাতে তোমার অত মাথা ব্যথা কেন?"

শিপ্রা তখন অগত্যা চুপ করে থেকে বোনের তিরস্কার মেনে নিল, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা যখন কমল গান শেখাতে এল, তখন সুযোগ বুঝে সে বললে—"আচ্ছা মাষ্টার মশাই নীচে যাঁরা থাকেন তাঁদের সঙ্গে কি আপনার আগে থেকে আলাপ ছিল? কমলের মুখটা শুকিয়ে উঠল, সে বললে, "না আগে আলাপ ছিল না তবে সেদিন যাবার সময় হঠাৎ পকেট থেকে আমার রুমালটা পড়ে যায় সেই সময়

ওই বাড়ীর সীতাদেবী দেখতে পেয়ে সেটা আমায় কুড়িয়ে দেন, সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার ভাব হয়"।

"ওঃ" বলে শিপ্রা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, তারপর মাথা ধরার ছল করে সেদিনকার মত গানের আসর ভেঙ্গে দিল।

সেদিন শিপ্রা অলোকাকে বললে, "দিদি মেট্রোতে একটা ভালো ছবি এসেছে, চল দেখে আসি"?

অলোকা বললে, "আমার ত ভাই যাওয়া হবে না, এখন কামাই করা ভালো দেখায় না"

শিপ্রা বললে, "তবে আমি আর মন্দা যাই"

মন্দা শুনে বললে, "না ভাই ছোড়দি, আমার এখন এক একটী মুহূর্ত্ত অতি মূল্যবান, এখন সময় নষ্ট করতে আমি রাজি নই"—

তখন শিপ্রা বললে, "তবে মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে যাবো দিদি"?

একমিনিট চুপ করে থেকে অলোকা বললে, "বেশ যাস্"

পরের দিন বিকেলে শিপ্রা খুব যত্ন করে সাজল। প্রসাধন জিনিষটার মধ্যে একটা সত্য আনন্দ গোপন থাকে, সেটা মানুষ তখনই জানতে পারে যখন সে একান্ত নিজের তৃপ্তির জন্যই সাজে। আমাদের শিপ্রাকে ধরেছে সেই রোগে। সে ঘুরে ফিরে যতবার আয়নার সামনে যায় মনে হয় তার অন্য একটা শাড়ী পরলে যেন এর চেয়েও ভালো দেখাতো। এইখানেই ত মনের সঙ্গে আমাদের বাধে গোল, সে কি চায় বুঝতে না পেরে ভুল করে তার পাওনা মেটাতে গিয়ে শেষে আমরা সাজি ফকির।

ঠিক সেই সময় কমল এসে হাজির হল। যখন ওরা নীচের উঠান দিয়ে যাচ্ছে, তখন শিপ্রা স্পষ্ট শুনতে পেল, রান্নাঘর থেকে চারুলতা বলছেন—"ওই দেখ এই ভরা সন্ধ্যেবেলা সতী মেয়েদের কীর্ত্তি, ছিঃ ছিঃ লজ্জায় মরে যাই"—কথাটী শুনে ও সেদিকে চোখ ফেরাতেই দেখল জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সীতা, আর কমলের দৃষ্টি তারই মুখের উপর গিয়ে পথ হারিয়েছে। ওদের সেই ভাব দেখে লজ্জায় দুঃখে শিপ্রার চোখে জল এসে গেল। আর চারুলতার কথাগুলি তার বুকে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। ছিঃ ছিঃ কি নোংরা মন তাঁর, উঃ, দিদি যদি একথা শুনতে পায়? সে মনে মনে কেঁপে উঠল, আর কমলই বা কি নিষ্ঠুর, বেশ ত সীতাই যদি ওর এত প্রিয়জন হয় তবে সে ওর সামনে না হয় আর নাই বেরুবে, গান ওর যথেষ্ট শেখা হয়েছে।

Interval এর সময় হঠাৎ শিপ্রার দিকে চেয়ে কমল চোমকে উঠে জিগ্যেস করলে, "শিপ্রা কাঁদছ কেন"?

শিপ্রা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, "কই কাঁদছি না ত? চোখটা হঠাৎ ভীষণ জ্বালা করে উঠল তাই বোধ হয় জল পড়ছে"

ওর কথা কমল বিশ্বাস করল না। ক'দিন থেকে সে শিপ্রার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছিল। একবার ওর মনেও হয়েছিল, হয়ত শিপ্রা ওর প্রতি অনুরাগিনী, কিন্তু অলোকার কথা মনে হতেই সেই মুহূর্ত্তে কথাগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল। ওরে বাস্ অলোকার চোখের দিকে তাকায় কার সাধ্য? যদিও সে কোনও দিন রাস্তায় ঘাটে পুরুষদের সঙ্গে ঝগড়া করেনি, বা তাদের মারতেও যায়নি, কিন্তু তবুও, রোমান্টিক স্বপ্নে বিভোর তরুণের দল তার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে ভয় পায়। কিন্তু অলোকা অসঙ্কোচে বন্ধুর মত তাদের সঙ্গে মেশে তবু সকলেই মনে মনে করে ওকে শ্রদ্ধা আর ভয়। সেই হেন অলোকার বোন শিপ্রা তারপক্ষে একটা মাষ্টারের প্রেমে পড়া কি সোজা কথা?

হঠাৎ কি ভেবে সে শিপ্রার হাতখানি নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলে। হঠাৎ ওর মাথায় একটা দুষ্টু খেয়াল চাপল। সে বললে, "শিপ্রা এ শোটা আর না দেখে আমার বাড়ী যাবে, অনেকদিন থেকে ভাবছি তোমায় কয়েকটী কথা বলব, কিন্তু সময় আর স্থান অভাবে বলতে পাচ্ছিনা—"

এমন অতর্কিত ভাবে কমলের স্পর্শ পেয়ে শিপ্রা ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠল। সে হতভম্ব হয়ে গেল, না পারল ওর হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে, আর না পারল ওর কথার কোনও জবাব দিতে। এমনিতরোই হয়ে আসছে, দেশে দেশে, কালে কালে, যুগে যুগে। কুমারী জীবনে প্রথম পুরুষের স্পর্শ মানুষকে এই রকমই বিহ্বল করে তোলে। কলকাতার সহরে বিখ্যাত মেয়ে অলোকা

সোম, সেই তারই বোন, শিপ্রা সহজে যারা কারো কাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে না, সেই শিপ্রার বিবেক তীব্র ভাবে ওকে বললে, "ছিঃ ছিঃ মানুষের মন, এমনই স্বপ্ন বিলাসী বটে এরই মধ্যে তুমি ভুলে গেলে, কিছুক্ষণ আগের চারুলতার বিদ্রূপ ; এরই মধ্যে ভুলে গেলে তুমি অলোকা সোমের বোন, আর সেই ভুলেরই জের টেনে তুমি কিনা একটী খেয়ালী যুবকের বিলাসের স্রোতে নিজের লজ্জা-সম্ভ্রম সমস্ত ভাসিয়ে দিতে বসেছ ?

কয়েক মুহূর্ত্ত কোথা দিয়ে চলে গেল কেউই জানতে পাবল না হঠাৎ শিপ্রা কমলের হাত থেকে নিজের হাতটী সজোরে ছাড়িয়ে নিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললে, "কি করছেন আপনি দেখছেন না চারদিকের লোক কিরকম অসভ্যের মত এইদিকে তাকিয়ে রয়েছে ?"

শিপ্রার অঙ্গসুরভি কমলকে তখন মাতাল করে তুলেছিল, আবেশ বিহ্বল কণ্ঠে সে বললে, "শিপ্রা লক্ষ্মীটী চল আমার সঙ্গে"—

উঠে দাঁড়িয়ে শিপ্রা বললে, দেখুন কমলবাবু "সুনামটা মেয়েদের জীবনের চেয়েও প্রিয় ও মূল্যবান জিনিষ কিন্তু আপনাদের সমাজের কল্যাণে তার ওজন আজ ঠিক কাঁচের বাসনের সমান, একবার ভাঙলে জীবনেও আর জোড়া লাগার আশা নেই।"

ছবি দেখানো তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল শিপ্রা আর শেষ দেখার জন্য অপেক্ষা না করে সোজা বাইরে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসল। কমলও মুখ নীচু করে ওর পিছু পিছু গিয়ে বাইরের সীটে বসল।

পরের দিন সকালে শিপ্রা চায়ের টেবলে বসে বললে, "দিদি আমি আর গান শিখবো না"

অলোকা বিস্মিত হয়ে বললে, "কেন রে হঠাৎ কি হল" ?

শিপ্রা বললে, "না কিছু হয় নি, এবারে ইচ্ছে আছে বি, এর রেজাল্ট খুব ভালো কোরবো"—

অলোকা মনে ভাবলে ও বুঝি টাকা বাঁচানোর জন্য গান শেখা ছেড়ে দিচ্ছে তাই সে অনেক রকমে বোনকে বোঝালে যে—"আমি যতদিন আছি তোদের টাকার কথা ভাবতে হবে না"—

কিন্তু শিপ্রা সেই যে না বলেছে তাকে আর কেউ হুঁ। করাতে পারল না। এর ভেতরের আসল কারণ কেউ জানল না, শুধু শিপ্রা আর কমল ছাড়া।

একদিন দুপুরে শিপ্রা কলেজের ফেরৎ বাসের জন্য ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় কমল সেখানে এসে উপস্থিত হল। ওকে দেখে শিপ্রার বুকের ভেতর কেঁপে উঠল, কি জানি, আজ আবার কি মনে করে এসেছে। কমল ওর সামনে এসে চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললে, "শিপ্রা তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে, শোনবার সময় হবে কি তোমার" ? আবার সেই পুরানো কথা, রাগে শিপ্রার সমস্ত শরীর জলে উঠল, ও তীব্র কণ্ঠে বললে, "দেখুন কমলবাবু এইটুকু শুধু আপনাকে মনে রাখতে অনুরোধ করি, যে আমি আপনার সীতার টাইপের মেয়ে নই"—

কমলের মুখ বেদনায় অপমানে কালো হয়ে গেল, সে ম্লান স্বরে বললে, "দেখ শিপ্রা আমিও মানুষ ভদ্রলোকের ছেলে, কিন্তু তোমার মত নিষ্ঠুর আমি আর কোথাও দেখিনি"—

তার গলার ভাঙা স্বর শুনে আর মুখের করুণ ছবি দেখে, শিপ্রার মন চঞ্চল হয়ে উঠল, হাজার হলেও সে ত মেয়ে। দয়া আর ক্ষমা যে তাদের প্রধান ধর্ম্ম। কমল চলে যাবার জন্য পিছন ফিরেছিল ও ডেকে বললে, শুনুন কমলবাবু আপনার এখন কথা বলবার সময় হবে কি ?"

কমল প্রথমে থতমত খেয়ে গেল, তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে নিয়ে বললে, "বেশ তবে চল ওই মাঠের মধ্যে গিয়ে বসা যাক"।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে শিপ্রা বললে, "চলুন"। একটী বেঞ্চে ওরা দুজনে গিয়ে বসল। কি করে কথাটী আরম্ভ করা যায়, কমল মহা ভাবনায় পড়ল। বার দুই তিন ও শিপ্রার দিকে চাইল, কিন্তু শিপ্রা তখন স্থির দৃষ্টিতে একটী পড়ন্ত রোদের সোণা মাখা নারিকেল গাছের দিকে চেয়েছিল। অনেক কষ্টে বুকে বল সংগ্রহ করে সে ডাকলে "শিপ্রা"—শিপ্রা বললে, "বলুন" কমল বললে—"শিপ্রা তুমি মিছে মনে একটা ভুল ধারণা পোষণ করে রেখেছ। সীতাকে আমি ভালোবাসিনা সেই আমার সঙ্গে সেধে ভাব করতে আসে ; শিপ্রাকে নীরব দেখে

সে বলতে লাগল, "তুমি আমার কাছে গান শেখা বন্ধ কোরনা, তোমায় না দেখতে পেলে সত্যিই আমি বাঁচবনা"।

শিপ্রা নীরবে সেই নারিকেলের পাতার দিকে চেয়ে রইল। তার মনের মধ্যে যে তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছিল মুখের ভাবে সে তা প্রকাশ পেতে দিল না। মন তার দুহাত বাড়িয়ে কমলাকে গ্রহণ করতে চাইছে। কিন্তু শিক্ষা সভ্যতা তার মূলে হানছে কুঠার। ওর চোখের সামনে প্রথমে ভেসে উঠল চারুলতার ছবি, আর তার বিদ্রূপ বাণী, তারপরই সীতা কমলের সঙ্গে গোপনে তার আলাপ— তারপরই অলোকা সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী অলোকা, তার দিদি অলোকা।

মুহূর্তে সে নিজের মনকে শক্ত করে নিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললে—"না কমলবাবু আমার গান শেখা আর হবে না। তার জন্য হয়ত আপনার সীতার সঙ্গে দেখা হওয়ার অসুবিধে হবে, কিন্তু আমি যে কথা বলেছি তা ফেরানো আমার পক্ষে অসম্ভব। পারেন ত আমায় ক্ষমা করবেন"। তার উত্তরে কমল স্তব্ধ হয়ে গেল ও কি এই ব্যবহার প্রত্যাশা করেছিল শিপ্রার কাছে? মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। এই বারে সে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলল, শিপ্রার কথার পাল্টা সুরে বললে, "দেখ শিপ্রা অত অহঙ্কার ভালো নয়, তুমি আজ জোড় করে অস্বীকার করছ যে তোমার মনে আমার প্রতি লেশমাত্রও অনুরাগ নেই, কিন্তু আমি বলছি আছে। মনের সঙ্গে এরকম লুকোচুরী খেলা ভালো নয়, এতে নিজেকেই ঠকতে হয় বেশী। মাতালের ঠোঁটের কাছ থেকে মদের পেয়ালা কেড়ে নিলে তার মনের অবস্থা কি রকম হয় জানো? শিপ্রার প্রতি একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে সে তড়িৎ বেগে সেখান থেকে চলে গেল।

তার কয়েক দিন পর, সকাল বেলা অলোকারা চা খাচ্ছিল, এমন সময় সীতার একটী ভাই ছুটে এসে ওদের জিগ্যেস করলে, "এখানে দিদি আছে?" অলোকা বললে, "না, কেন কি হয়েছে?" "সে কোথায় হারিয়ে গেছে" বলে সে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। তিন বোন ত অবাক, শুধু শিপ্রার বুকটা একটু মোচড় দিয়ে উঠল। ওর মনে একটা সন্দেহ উঁকী মেরে মিলিয়ে গেল। তার মিনিট কতক পরে চারুলতা উপরে এসে বললেন, হ্যাঁ মা, আমার সীতাকে দেখেছ"?

অলোকা বললে, না মাসীমা সেত অনেক দিন থেকে আর আসে না"।

চারুলতা মেঝের উপর বসে পড়ে বললেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে সীতাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক দিন থেকে বলছিল মা আমি শিপ্রাদির সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখতে যাবো, উনি বলেছিলেন, তোমাদের সঙ্গে একদিন পাঠিয়ে দিতে, তা মা ভরসা করে আমি পাঠাতে পারিনি। কারণ ওই সব ছবি দেখলে, মেয়েদের স্বভাব ঠিক থাকে না"। শেষে কি তাই হল মা? আমার মেয়ে হয়ে আমার মুখে কালী দিল,—রাগে দুঃখে তিনি নিজের চুল ছিঁড়তে লাগলেন।

ঠিক সেই সময় কমলের বাড়ীর একটী চাকর এসে লম্বা সেলাম ঠুকে বললে, "এখানে বাবু আছেন"? তিন বোনে আশ্চর্য্য হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। লোকটীকে দেখে কোনও সুখবরের আশায় চারুলতা উৎসুক হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু তার প্রশ্নে তিনি দমে গিয়ে বললেন, "এখানে কোনও কমল নামে লোক থাকে না"—

চাকরটী আশ্চর্য্য হয়ে বোনেদের দিকে তাকাতে অলোকা বললে, না তিনি এখানে আর কাজ করেন না, আসেনও না। কেন তিনি কোথায় গেছেন"?

চাকরটী বললে, কাল রাতে তিনি রোজকার মতই খেয়ে শুয়েছিলেন, কিন্তু, আজ ভোর থেকে তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। দেখি অন্য জায়গায় সে চলে গেল।

বেলার পর বেলা বেড়ে যেতে লাগল। সীতার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না, ওদিকে কমলেরও না। এর মধ্যে সেই চাকরটি আরও দুবার এসে খোঁজ করে গেছে।

ক্রমে ব্যাপারটি সকলের চোখের সামনে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। একসময় অলোকা বললে, "সীতা মেয়েটি স্বভাব আমি ভালো করে জানিনা, তবে কমলবাবুকে যতদূর জানি তার চরিত্র ভালো বলেই জানতুম।" মন্দা বললে, "অতিরিক্ত শাসন করলে শেষে ওই হয়, সীতারও হয়েছে তাই"—শিপ্রাকে নীরব দেখে ওরা দেখল তার মুখ মড়ার মত সাদা, আর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে অলোকা না ধরলে ও তখনি পড়ে যেত।।

ইতিহাস

—শ্রীঅমিয়কুমার বাগচী

[*"The history of the human race is the history of a growth. It can no more be taken to pieces than the human* frame can be taken to pieces who would think of making anything of the body without knowing whether it possessed a circulation, a nervous system, or a skeleton. History is a living whole. If the organ be removed it is nothing but a lifeless mass what we have to find in it is the relation and connection of the parts we must learn how age develops into age, how country reacts upon country, how thought inspires action and action modifies thought."]

—*Fredrick Harrison.*

অতীতের বিরাট পর্দ্দার আড়ালে যে সমস্ত অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল, তাদের নিদর্শন আমরা পাই ইতিহাসের পাতায় পাতায়। একটা দেশের উত্থান-পতনের কাহিনী সুসংবদ্ধ ভাবে লিখে রাখে ইতিহাস··· এবং তার জন্যেই ইতিহাসের স্থান এত উঁচুতে। লুপ্ত অতীতের মূকবাণী কে বহন করে একমাত্র ইতিহাস। কত শত শত সম্রাট প্রভাতের শুকতারার মত ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়ে চিরদিনের মত লুপ্ত হয়ে গেছেন, আজ তাঁদের স্মরণ করবার মত কোন স্মৃতি চিহ্নই নেই ; আছে কেবল ইতিহাসের পাতায় তাঁদের প্রত্যেকের অল্পবিস্তর কাহিনী।···আজ তাঁদের অস্তিত্বের সাক্ষী দিতে হাজির হয়েছে সামান্য খানকয়েক মসীকলঙ্কিত পাতা। দুর্দ্ধর্ষ বীর আলেকজাণ্ডার, শিবাজী, সিজার, পিটর বহুদিন হোল কালের করাল কবলে আত্মসমর্পন করেছেন, তাঁদের প্রতিভার প্রদীপ্ত পরিচয় আজ সবই প্রায় লুপ্ত, যা পাওয়া যায় তাদের অবস্থাও ভয়াবহ। এখন যদি তাঁদের আবির্ভাব সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ হয়, সে সন্দেহ দূর করতে হলে এক ইতিহাসেরই শরণ নিতে হয়···তা-না হলে বিপদ বাড়ে।

মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়ে যে সকল অমর আত্মা যুগযুগান্তর ধরে জন্মের জয়যাত্রা পথে অগ্রসর হয়ে পৃথিবীকে ধন্য করে গেছেন, তাঁদের সেই কীর্ত্তিকাহিনীকে মূর্ত্তরূপ দান করে, ইতিহাস তাঁদের অমরত্বের জয়টিকা পরিয়ে দিয়ে আপন বুকের মণিকোঠায় লুকিয়ে রেখেছে অনন্তকাল ধরে।

অতীতের অবলুপ্ত গরিমার ক্ষীণ রশ্মিকে সযত্নে বুকে নিয়ে ভবিষ্যের সন্তান-সন্ততিদের বুকে সেই ক্ষীণ রশ্মি সংযোগে দাবানল তৈরি করবার জন্য এসেছে ইতিহাস। নির্জ্জীব জাতির ছিন্ন জীবন বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মন্ত্রের আবাহন মন্ত্র ধ্বনিত করতে, অসহায় জাতিকে সান্ত্বনা দিতে, কর্ম্মপথে অগ্রসর হবার প্রেরণা জানাতে, মরণের শ্রীহীন গ্রাস থেকে মহান আত্মাকে রক্ষা করতে বরাভয় রূপে এসেছে ইতিহাস। ভগ্নপ্রায়, উদ্দীপনাহীন জীবনে ইতিহাসের মতন এমন উৎসাহ দাতা আর কেউই নেই।

বর্ত্তমানের সকল কিছুকে অস্বীকার করে শুধু অতীত-কাহিনী স্মরণ করে চোখের জল ফেলা অর্থহীন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ কথাও আমাদের ভোলা উচিত নয়, বর্ত্তমান ভবিষ্যতের সমস্ত রঙীন আলোর পেছনেই অতীতের বৈরাগীর একতারা বাজে, তাই আজকের এবং আগামী কালের রূপ এত সুন্দর—এত মনোহর। অতীতের লীলা বর্ত্তমানের মধ্যে সর্ব্বদাই বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়, একটু লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটি বোঝা যায়। অতীত না হলে, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমানের চলবার উপায় নেই। অতীতের প্রেরণাই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে সঞ্চারিত হয়ে তাকে প্রাণবন্ত করে।

নেপোলিয়ন হতে চাইলেন আলেকজাণ্ডার। মুসোলিনী হতে চান দুর্দ্ধর্ষ সিজার। এমন উদাহরণ ইতিহাস খুললেই হাজারে হাজারে মিলবে। যাদের অতীত বলে গর্ব্ব করবার কিছু নেই তাদের মত হতভাগ্য জাত পৃথিবীতে নেই। মৃতপ্রায় জাত যখন বিলাসে পঙ্গু হয়ে আপন সত্তা হারিয়ে ফেলে তখন কবি এসে প্রেরণা দেয়, কিন্তু এ প্রেরণা সে পায় কোথা ? ইতিহাসের পাতা থেকে। কবি তার বর্ণনা কৌশলে, সুরের মাধুর্য্যে সেই বহু প্রচলিত

কাহিনীকে এমনি প্রাণবন্ত করে, যা প্রত্যেকের শিরায় শিরায় নব-যৌবনের হিল্লোল বহায়। গ্রীস্‌কে জাগাবার জন্যে "বায়রণ" এই ইতিহাসের স্মরণ নিয়েছেন, ডন জুয়ানের জলদস্যু কর্ত্তৃক বন্দী গ্রীকের বীণার তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে আঘাত দিয়ে তিনি মহা-জাগরণের গান সমস্ত গ্রীস্‌কে শুনিয়েছেন—

"Must we but weep o'er days more blest ?
Must we but blush ? Our fathers bled.
Earth ! render black from out of thy breast
A remnant of our spartan dead !
Of the three hundred grant but three
To make a new Thermopylae"

এমনি গান আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে প্রচুর পরিমাণে শুনেছি। দ্বিজেন্দ্রলালকে চারণ বলা চলে…কারণ তিনি বাঙলা কবিদের মধ্যে সব চাইতে বেশি অতীতের প্রেরণা এনে জাতীকে গড়তে চেয়েছিলেন"—অশোক যাহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ" কিম্বা "যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই না মা সেই ধন্য দেশ।" এ সব অমর বাণী বাঙালী কোনদিন ভুলবে না।

এই অতীতের জয়গান গেয়েছেন রাজপুতনার চারণের দল, স্কটল্যাণ্ডের সীমান্ত প্রদেশবাসী মিন্‌স্ট্রালের দল। স্কট ছিলেন এই চারণ দলের একজন। ইতিহাসকে তিনি ভালবেসেছেন বুক দিয়ে…তাই দেশকে সেই অতীতের সোনার স্মৃতির সঙ্গে জাগাবার জন্যে তিনিও day of the Last Minstrel এর সেই অভাগা চারণের মত বন্ধুর স্কটল্যাণ্ডের প্রতিস্থানে আপনার তেজদীপ্ত গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। স্কচ্‌রা আজও ভোলেনি—

"Breathes there the man with soul so dead,
Who never to himself hath said,
This is my own my native land" ইত্যাদি।

অতীত ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। এই অতীতের জয়গান বিশ্বের সব কবিই গেয়েছেন, আমাদের কবিবর রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তার সত্যিই তুলনা হয় না। অল্প কথায় তিনি এর কল্পনাতীত রূপ দিয়েছেন :—

"হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও
গোপনে গোপনে।"

ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশ তাদের অতীত কাহিনী সোনার সুতোয় গেঁথে রেখেছে। অতীত কাহিনী সংগ্রহ করবার জন্যে যাঁরা জীবন মন সমর্পন করেছেন, তাঁদের পুত্র কন্যার ভার গ্রহণ করতে সে দেশের সমাজ সর্ব্বদাই প্রস্তুত…এবং যথেষ্ট গৌরবান্বিত। এই অনুসন্ধানের জন্যে মানুষ জীবনের মায়া ত্যাগ করে অনিদ্রায় অনাহারে বন্ধুর পথ পেরিয়ে চলে, সামনে মৃত্যুকে দেখেও কর্ত্তব্য কাজ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে না। অতীত মানুষের মনে এমনি নেশাই আনে। এই নেশা মানুষ কে সাহারার দুর্দ্দান্ত মরুবক্ষে, মিশরের প্রাচীন প্রস্তরাদির ভেতর, তিব্বতের দুরন্ত লামাদের কবলে, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর খবরাখবর জানবার জন্যে উন্মাদের মত ছুটিয়ে নিয়ে যায়।

যদি কেউ তার বাপমার পরিচয় দিতে অপারগ হয় আমরা যেমন তাকে লজ্জা দিতে ছাড়ি না, তেমনি যে জাত তার নিজের পুর্ব্বকাহিনী বলতে পারে না তাদের বিদ্রূপ করতেও আমরা কসুর করি না। হারানো দিনের কথা শোনবার আগ্রহ মানুষের ছোট অবস্থা থেকেই হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে…তাই তাকে ঠাকুরমার কিম্বা দিদিমার গল্প জড়িয়ে রূপকথার চমকপ্রদ কাহিনী শুনতে দেখি। কাহিনীটির মধ্যে সত্য মিথ্যে কি পরিমাণে আছে সে বিচারের শক্তি তার তখন থাকে না, তবে সে যে তৃপ্তি পায় তার একমাত্র কারণ, তার মনে অতীতের সহচর্য্য লাভ করবার তীব্র বুবুক্ষা কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করে বোলে। হাজার হাজার বছর আগে সত্যিই কোন রাজকুমার "গজমোতির" মালা বুকে দুলিয়ে অগ্নিপাহাড়ে ক্ষীর সমুদ্র পেরিয়ে রাজকুমারীর সন্ধানে গিছল কিনা, সে সেসব না ভাবলেও, এটুকু তার শিশু মন না ভেবে পারে না যে তারই মত একজন অনেক অনেক বছর আগে একজনকে পাবার জন্য এমনি কষ্টই করেছিল। হয়ত এ ধারণাটা তার মনে খুব সুস্পষ্টরূপে দেখা দেয় না…তবে দেখা দেয়ই, এবং দেয় বলেই সে গল্প শুনতে শুনতে অমন তন্ময় হয়ে যায়…অনেক সময় সেই এলোমেলো ভাবনার মধ্যে সে ঘুমিয়েও পড়ে। প্রেমের শক্তি বা সৌন্দর্য্য বোঝবার মত মনের অবস্থা তার নয়…তবু সে যা শোনে তাকেই সে সত্য বলেই গ্রহণ

রূপে আপনা হতে রূপ দিয়ে তৃপ্তি পায়। সৃষ্টি করবার প্রেরণা মানুষ ছোট অবস্থা থেকে এমনি ভাবেই আয়ত্ত করে। সে ভাবে যেখানে দিনের রবি সারাদিনের কাজ শেষ করে ক্লান্ত করুণ দৃষ্টির চাউনিতে সমস্ত পশ্চিম দিগন্তকে রঙীন করে দিয়ে বিদায় নেয়, সেখানে সন্ধান করলে হয়ত আজও রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখা যেতে পারে, ভীষ্মের শরশয্যা, কর্ণের চাকা তোলবার ব্যর্থ চেষ্টা, কৃষ্ণের মোহন রূপ, সবই হয়ত দৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়তে পারে। এই সব অবান্তর ভাবনাতে সে পাগল হয়ে পড়ে, অনাবশ্যক চোখের জল ফেলে, কিন্তু এই সব অবান্তর ও অবাস্তব ঘটনাই তাকে মানুষ করে···তাকে কবি ও আবিস্কারক গড়ে তোলে। তাকে একদিকে শেলি অপর দিকে মাঙ্গোপার্ক, একদিকে কীটস, বায়রণ অপরদিকে লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যানলি-ওয়েনের মধ্যে দাঁড় করায়।

মানুষ তার জীবনপঞ্জি প্রতিদিন লেখে। এই লেখার মধ্যে সে অশেষ আনন্দ পায়···যদি সে তা না পায় তাহলে সে প্রতিদিন একই ভাবে লিখিতে পারে না। এ আনন্দ আর কিছুই নয়, তার জীবনে প্রতিদিনে অতীতের যে প্রভাব, তাকেই তার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে তাকে সে নিজের কাছে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। সে তার প্রতিদিনের মরা আমিকে আপনার ক্ষুদ্র কলমের সাহায্যে খাতার পাতায় বাঁচিয়ে রাখতে চায়···যাতে যে কোন-দিন সে তার সংসর্গ লাভ করতে পারে। এ-ছাড়া "জীবনপঞ্জি" লেখবার আর একটি কারণ মানুষ তার থেকে আপনার ক্রম বিস্তার লক্ষ করে। একটি জীবনপঞ্জি যেমন একজন মানুষের ক্রম-বিকাশের পরিচয় দেয়, তেমনি একখানি ইতিহাস একটি জাতের ক্রম বিকাশের ব্যাখ্যা করে। এমনি সব সামান্য ব্যাপারের দিকে একটু লক্ষ রাখলে বুঝতে কষ্ট হয় না মানুষ অতীতকে কত নিবিড় ভাবেই না ভালবাসে।

হিমালয়কে দেখে মানুষ যে সব কারণে মুগ্ধ হয় তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট কারণ হচ্ছে এই যে,—"তুমি বিরাট··· তুমি বহু যুগ ধরে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর অশেষ পরিবর্তন দেখেছ এবং আরও দেখবে।" মানুষ ভাবে হিমালয়ের বুকে যেন অদৃশ্য কালিতে সমস্ত অতীতের কাহিনী লেখা আছে, এ কাহিনী অনেকেই পড়তে পারে, যারা পারে তাদের কাছে হিমালয় আরও সুন্দর আরও মহান্ বলে মনে হয়। শুধু হিমালয় কেন, পিরামিড, তাজমহল, অজান্তার চারুকলা, সবই তাদের মুগ্ধ করে···কারণ তারা এ সবের মধ্যে 'অতীত সাক্ষী'র সন্ধান পায়।

পলাশীর মাঠে দাঁড়িয়ে আমাদের চোখ জলে ভরে আসে, কারণ এখানে আমাদের মধ্যে অতীতের লীলা খেলা চলে, সেই আমাদের কানে কানে বলে—"এই সেই প্রান্তর যেখানে বাঙার শেষ স্বাধীনতা সূর্য্য মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে" ভাগীরথীকে দেখে মনে হয়—"এ সেই পতিতপাবনী মা সুরধনী, যিনি "ব্রহ্মকমণ্ডলুউচ্ছলিধূর্জটিজটিল জটাপর ঝরিয়া" পড়িয়া, পরে "অম্বর হইতে সম শতধারে জ্যোতি প্রপাত তিমিরে" হয়ে "ধরায় হিমাচল মূলে" আসিয়া নমিলেন।

এক কথায় বলা চলে পৃথিবীতে মানুষ যে কোন জিনিষের মধ্যেই আকর্ষিত হোক না কেন, তার মধ্যে অতীতের স্পন্দন আছে। দিল্লির মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে মানুষের মন এই অতীতের বুকেই আপনহারা হয়ে পড়ে। সেখানে সে "পুর সুন্দরীর সুন্দর নিক্কণ" যা "ভগ্ন প্রাসাদে ঝিল্লি স্বনে" অনন্ত কাল ধরে ধ্বনিত হয়ে "নিশার গগনকে" ব্যাকুল করেছে তারই পরশ পায় বলেই সে অতীত স্মৃতির ভগ্নাবশেষের ওপর দাঁড়িয়ে এমনি আপন হারা হয়ে থাকে।

যুবক তার কৈশর জীবনের কথা, প্রৌঢ়তার যৌবনের প্রদীপ্ত দিনগুলি স্মরণ করে, বৃদ্ধতার ফেলে আসা সমস্ত জীবনটি লক্ষ করে গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। অতীতকে মানুষ এমনি ভালবাসে, অতীত মানুষের কাছে চিরদিনই সাত রঙা রামধনুর মত মনোরম। আমরাই কথা বলতে বলতে ছোটদের অনেক সময় বলি—"আমাদের সময় যা ছিল।" হয়ত আমাদের সময় কিছুই ছিল না, হয়ত যা ছিল তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তবু ঐ টুকু পুরুকাহিনীর ক্ষীণ রশ্মিতে নিজেদের উদ্ভাসিত করতে, ও অপর পক্ষে কনিষ্ঠদের বিস্ময়ে স্তব্ধীভূত করে দিয়ে, এক অহেতুকি আত্মপ্রসাদ লাভ করতে লজ্জা বোধ করি না।

অতীতকে উজ্জ্বল করবার প্রবৃত্তি মানুষের চিরকালের। রাজপুতনার সামন্তরাজদের অনেকের অবস্থা এখন খুবই

শোচনীয় হয়ে পড়েছে, কিন্তু তবু যদি তাঁদের ভগ্ন প্রাসাদের কক্ষগুলি অনুসন্ধান করা যায় সেখানে পূর্ব্বপুরুষদিগের ব্যবহৃত অস্ত্র-সস্ত্রাদি উজ্জ্বল অবস্থায় দেখা যাবে। পূর্ব্ব-পুরুষের জন্যে গৌরব অনুভব করাটা সব জাতের অস্থি-মজ্জাগত অভ্যাস। সিজরের জন্যে ইটালী; আলেকজান্দারের জন্যে গ্রীস; নেপোলিয়নের জন্যে ফ্রান্স; এলিজাবেতের জন্যে ইংল্যাণ্ড; আজও গৌরব যথেষ্ট অনুভব করে।

ইতিহাস বলতে আমরা কী বুঝি…এখনও সে আলোচনাটা করা দরকার। এ সম্বন্ধে মনীষি ব্যক্তিদের মত প্রকাশ করার আগে নিজেদের ধারণাটাই বলা বিশেষ দরকার।

মানুষ সামাজিক কিম্বা রাজনৈতিক যে কোনদিক দিয়েই যখন পৃথিবীর সঙ্গে নিজের পরিচয় সূত্রটা দৃঢ় করে…তখন সেই পরিচয় সূত্রটাই আমাদের ইতিহাসের কাজ করে। ব্যাপারটা পরিস্কার হোল না…সুতরাং সেই চেষ্টাই করা যাক। যে কোন মানুষের জীবনই ইতিহাস পদবাচ্য হতে পারে…যদি দেখা যায় সেই মানুষের মধ্য দিয়ে সে সময়কার দেশ আপনাকে প্রকাশ করতে পেরেছে। "ডি-ভ্যালেরা," "লেলিন," "সান্‌ইয়াৎসান্‌," 'মুসোলিনী,' 'হিটলার' প্রভৃতি মহামানবদের জীবনী ইতিহাস পদবাচ্য…কারণ এদের জীবন চরিত্রের মধ্যে আমরা আয়ারল্যাণ্ড, রাশিয়া, চীন, ইটালী ও জার্ম্মানীর পরিচয় পাই। কিন্তু জীবন চরিত ও ইতিহাস একশ্রেণী নয়…তাদের প্রভেদ বোধ হয় সবাই জানেন। মিচিগান বিশ্বালয়ের সুবিখ্যাত প্রফেসার B. A. Hindsdale ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর "How to study and learn History"র আরম্ভেই বলছেন—"In the broadest Sense history is the story of man living in Social relations in the world, as traced in various records and memorials. More narrowly it is the story of man living in the higher social relations that continue the civil state or civilization"……………..এ সম্বন্ধে Dr. Arnold বলছেন :—the biography of a political Society or common wealth" প্রফেসারের উক্তির সঙ্গে আমাদের উক্তির তফাৎ নেই।

ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ইতিহাস রচনা হয় না। ইতিহাসের খুব prominent figure এর স্থান আছে… অর্থাৎ যাকে প্রকাশ করলে সমস্ত দেশের ব্যাপারটা প্রকাশ পেতে পারে। সব ক্ষেত্রে রাজাই যে prominent fiigure হন এমন নয়।…Charles I এর রাজত্বে Cromwell কিম্বা Milton; হ্যানোভার বংশীদের রাজত্বে প্রধান মন্ত্রীরা অনেক জায়গায় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রধান আসন পেয়েছেন। অনেক সময় ঘটনাও প্রধান আসন গ্রহণ করে…অবশ্য যদি সেই ঘটনার ভেতর দিয়ে দেশের তদানিন্তন অবস্থা বেশ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। French Revolution উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে, এরি ভেতর দিয়ে সে সময়কার France কথা কয়েছে; অনেক সময় রাজা থাকা সত্বেও প্রধান আসন তাঁর অধিনস্থ ব্যক্তিরাই পেয়েছেন, যেমন Cardinal Richeleau, Prince Von Auto Bismark পেয়েছেন। বর্ত্তমানে মুসোলিনী যেমন পাচ্ছেন।

ইতিহাস যে কী…সে সম্বন্ধে কেউই প্রায় একমত নন, বিখ্যাত সিসেরো ইতিহাসকে বলেছেন :—"The witness of times, the light of truth, and the mother of life" ডায়োডোরাস বলছেন :—"a handmaid of providence, a priestess of truth and a mother of life," ডায়োনিসাস বলছেন :—"History is philosophy teaching by example" Guizot বলেন—"History is a great school of truth, reason and virtue." Morley বলছেন :—"It is the precent that really interests us; it is the present that we seek to understand and to explain. I do not in the least want to know what happened in the past, except as it enables me to see my way more clearly through what is happening today. I want to know what men thought and did in the thirteenth Century, not out of any dilettante or idle antiquarian curiosity, but because the thirteenth century is at the root of what men think and do in the nineteenth.. Carlyleএর মতে :—History as it lies at the root of all

science, is also the first distinct product of mens spiritual nature, his earliest expression of what can be called thougt···Let us search more and more into the past, let all men explore it as the true fountain of knowledge, by whose light, conciously or unconciously employed, can the present or the future be interpreted or guessed at.

Professor Seely বলেন :—"History should not merely gratify the reader's curiosity about the past but modify his views of the present এমন আরও অনেক মনীষিদের অভিমত তুলে দেয়া যায়, কিন্তু তার এখানে কোন প্রয়োজন নেই। Morleyর মতামতের শেষ দিকটা এবং Professor Sellyর অভিমতটায় আমি পাঠকদের মনযোগ আকর্ষণ করি। Moroly বলছেন "ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাস পড়ব কেবলমাত্র মনের কৌতুহল মেটাবার জন্যে নয়···কারণ সেটা উনবিংশ শতাব্দীর মানুষের ধারণার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে বলে"। কথাটি তিনি খুবই সুন্দর করে বলেছেন···এখানে তিনি ইতিহাসকে আর এক চোখে দেখেছেন···এরকম দৃষ্টি খুব কম লোকেরই আছে···এখানে ইতিহাস স্রষ্টা···উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীকে সে সৃষ্টি করেছে তার ত্রয়োদশ শতাব্দীর কর্ম্মপ্রেরণায়···এখন সেটা ভাল কী মন্দ···সে আলোচনা করতে হলে চাই ত্রয়োদশ শতাব্দীর সম্বন্ধে সত্যকার জ্ঞান···এবং এই জ্ঞান আহরণ করতে গেলে আমাদের ফিরতে হবে ইতিহাসের সন্ধানে, সুতরাং এখানে যদি carlyleএর মত বলে বসি যে ইতিহাস প্রায় সব কিছুরই মূলে রয়েছে তাহলে সেটা খুব অন্যায় বলা হবে কী? এ সম্বন্ধে আরো কিছু বলবার ছিল, কিন্তু আমার সময়ের সঙ্গে পাঠকের ধৈর্য্যের দিকেও নজর দিতে হয়েছে, সুতরাং সে চেষ্টা এখন থাক।

Professor সিলি যে অভিমতটি প্রকাশ করেছেন সেটিও খুব সুন্দর···'ইতিহাস কেবলমাত্র অতীতের কৌতুহল মেটায় না, বর্ত্তমানকে দেখবার যথেষ্ট সহায়তা করে' এটা ঠিক তাঁর বাণীর হুবহু অনুবাদ না হলেও এতে ভাবটি ধরা পড়েছে। বর্ত্তমানকে বিচার করবার জন্যে অর্থাৎ বর্ত্তমানের সত্যিকারের রূপ প্রত্যক্ষ করবার জন্যে একজনের যে দৃষ্টির প্রয়োজন সে দৃষ্টি সে পায় এই ইতিহাস থেকে···কারণ এই ইতিহাসই তার জ্ঞান চক্ষু খুলে দেয় তার 'ক্রম-বিবর্দ্ধন' সম্বন্ধে আত্ম চেতনা এনে দেয়··· এরপর যখন সে আপন যুগের পানে চায় সেটা তার কাছে তখন আর তেমন অন্ধকার থাকেনা অর্থাৎ থাকা সম্ভব নয়।

একটা জিনিষের উল্লেখ এখানে বিশেষ প্রয়োজন সেটা এই যে, সব দেশের এবং সকল কালের ইতিহাস রচনার ধারা এক নয়। আমাদের হিন্দু রাজারা যখন ভারতে রাজত্ব করতেন তখন ইতিহাস লেখার মোটেই রেওয়াজ ছিলনা, তখন ইতিহাসের নাম দিয়ে তাঁরা যা লিখে গেছেন সেগুলি কাব্যছাড়া আর কিছুই নয়। হিন্দুর রাজত্বের যে সমস্ত বিবরণ আমরা পাই তার অনেকাংশ আমরা সেই যুগের নাট্যকারদের রচনা থেকে কিম্বা প্রস্তর শিল্প থেকে পাই। Court papers বা সরকারি দপ্তর, যার সঙ্গে আমরা মুসলমান যুগে বিশেষ ভাবে পরিচিত হই, তার অস্তিত্ব হিন্দু রাজত্বের সময় ছিল না।

যদি সে সময়কার পরিব্রাজকরা কষ্ট স্বীকার করে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে না যেতেন তাহলে হিন্দুরাজাদের সম্বন্ধে আমাদের আরও অন্ধকারই থেকে যেত হোত। সব প্রথম আমরা আলোচনা করব সব কালের ইতিহাস লেখার ধারা কেন এক হয়নি।

ফরাসী দার্শনিক "কোমতে" বলছেন, মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইতিহাসেরও পরিবর্ত্তন এসেছে। এই সত্যটি তিনি বিশ্লেষণ করেছেন মানুষের চিন্তাধারাকে তিনটি স্তরে ভেদ করে। যেমন :—

(১) প্রথম স্তরে মানুষ পৃথিবীর যে কোন কাজের মধ্যে দৈবশক্তির প্রভাব খুব বেশি ভাবে দেখে।

(২) দ্বিতীয় স্তরে ঐ কাজের মূল কারণ শক্তির গুণ বা শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে।

(৩) তৃতীয় স্তরে সে সব কাজের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রভাব দেখতে থাকে।

এমনি বিভিন্ন চিন্তার ধারা তার রচনাকে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমের রূপ দান করেছে। প্রথম যুগের ইতিহাস

পড়তে গেলে আমরা খুব সহজেই গ্রন্থকারের অন্ধ বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে ত্যক্ত হয়ে উঠব। দ্বিতীয় স্তরের বা যুগের ইতি-কথা পড়লে আমরা দেখবো মানুষের দৃষ্টি কেমন করে প্রকাশ পাচ্ছে, আপনার বুদ্ধি-জ্ঞান বৃত্তির ভেতর দিয়ে। তৃতীয় স্তরের ইতিহাস পড়লে আমরা দেখতে পাই মানুষ কী ভীষণ practical হয়ে উঠেছে। এ যুগে অন্ধভাবে মানুষ কিছু মেনে নিতে চায় না, এ কালের ইতিহাসে তাই আগেকার লেখা ইতিহাসের মত অন্ধ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। সে কিছুই মানতে চায় না, সে সব কিছু বুঝতে চায় এবং যতক্ষণ তা না পারে ততক্ষণ সে উন্মাদের মত আপনাকে অতৃপ্তির আগুনে দগ্ধীভূত করে। তৃতীয় যুগ হচ্ছে ulra-mordern এর যুগ।

আগেই বলা হইয়াছে সব দেশের ইতিহাস এক নয়। ইংলণ্ডের ইতিহাস ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন আরোহীদের জীবন চরিতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু ভারতের ইতিহসে কতকটা তা হলেও সম্পূর্ণ তা নয়। ভারতের ইতিহাস ধর্ম্মের ইতিহাস। ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এর প্রকাশ হয়েছে। ধর্ম্ম বলতে ভারতবাসী অজ্ঞান, তাই এই ধর্ম্ম আন্দোলনের মধ্যে তার যতটা আত্মপ্রকাশ হয় এমন আর কোন আন্দোলনের মধ্যে হয় না। এমনি ধারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের prominent figure এর অসা-মাঞ্জস্য দেখা যায়।

ইতিহাস পড়ার দাম যে কি এ আমাদের দেশের শতকরা নব্বইটি ছেলেরও ওপর সংখ্যাই জানে না। বাঙালা দেশে গল্প উপন্যাস ছাপানর জন্যে প্রতিদিন নতুন আকারে মাসিক সাপ্তাহিক দেখা যাচ্ছে কিন্তু সুধু ইতিহাস আলোচনার জন্যে কোন পত্রিকা দেখতে পাই না। আমি দু' চার জন পত্রিকা প্রকাশ ইচ্ছুকদের এমনি ধরণের পত্রিকা বার করতে বলি, কিন্তু তাঁরা পেছিয়ে গিয়ে বল্লেন—'পড়বে কে মশাই…?' ব্যবসার দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতি সন্দেহ নাই। সত্যিই দেশে পড়বার লোক নেই। যে দেশের ছেলে মেয়েরা মাসিক পত্রিকা হাতে পেয়ে আগে রসালো গল্প, কবিতা পড়ে, সে দেশে ইতিহাস সম্বন্ধীয় পত্রিকা যে চলতে পারে না এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু না থাকলেও, দুঃখ করবার অনেক কিছুই আছে।

'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একখানি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক মাসিক পত্র কয়েক বছর পূর্ব্বে প্রকাশ পেত।…তার সম্পা-দক স্বনামধন্য নিখিল রায় পত্রিকাখানি চালাতে এবং বাজারে কাটাতে যে কী কষ্ট স্বীকার করেছিলেন তা ঐ পত্রিকায় ১৩১৪ সালের বৈশাখী সংখ্যায়' সম্পাদকের নিবেদন থেকে কয়েক লাইন তুলে দেখালেই বোঝা যাবে:

'কিঞ্চিন্‌ন্যূন তিন বৎসর পূর্ব্বে ঐতিহাসিক চিত্রের দ্বিতীয় পর্য্যায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। সুবিখ্যাত সাহিত্য সম্পাদক মহাশয় সে সময়ে আশা করিয়া লিখিয়া ছিলেন যে, দ্বিতীয়া পর্য্যায়ের ঐতিহাসিক চিত্রডিঙ্গী হাঁটু জলেও নির্ব্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইবে। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। সুজলা সুফলা সোনার বাঙলায় ঐতিহাসিক চিত্রের ন্যায় একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গিও অনুকূল স্রোত বা অনুকূল বাতাস পায় নাই। তাহা ভাসিতে না ভাসিতেই চড়ায় ঠেকিয়া যায়। এক্ষণে আবার তাহাকে চড়া হইতে সরাইয়া জলে নামাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।'

এই কয়েকটি লাইন পড়েই বোঝা যায় আমাদের দেশবাসীর মনের গতি কোন দিকে। আমাদের সবচাইতে বড় দুঃখ আমাদের ভেতর জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নেই। অনেকদিন উপোষ করবার ফলে শরীর এমন অবস্থায় আসে যখন সে ক্ষুধা তৃষ্ণার অভাব অনুভব করতে পারে না, তখন সে এমনি নিশ্চুপ অবস্থায় আপন সর্ব্বনাশকে আলিঙ্গন করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠে যে তা ভাবতেও আতঙ্কিত হতে হয়। আমাদের জাতেরও সেই অবস্থা…বহুদিন না খেয়ে…আজ সেই অভাব অনুভব করবার বৃত্তিটি পর্য্যন্ত তার নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সে আশাহীন, উৎসাহহীন অবস্থায় আপন সর্ব্বনাশের প্রতীক্ষায় বসে আছে। এমনি বসে থাকলে সর্ব্বনাশের আগমন যে দূরবর্ত্তী হবে তা মনে হয় না।

'বন্দে মাতরম' বলে আমরা রাস্তায় জাতীয় পতাকা কাঁধে করে দেশপ্রীতি দেখাতে পারি…কিন্তু যেখানে সেই দেশের পূর্ব্ব অধিবাসীদের কথা হয়, যাদের সঙ্গে আমাদের স্বার্থ সব দিক দিয়ে জড়িত সেখানে আমরা হাজির হতে পারি না। সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মত প্রবীন ও বিজ্ঞ ইতিহাস লেখকের বক্তৃতা

শোনবার জন্যে যে সংখ্যক শ্রোতাদের আবির্ভাব হয়েছিল তা প্রকাশ করে আমি দেশের কলঙ্ক প্রচার করাটা গৌরবের কাজ বলে অনুভব করি না। রাস্তায় ঘাটে আমরা 'মা' 'মা' বলে কেঁদে আকুল হয়ে উঠি...কিন্তু সেই 'মার, প্রকৃত পরিচয় জানবার জন্যে কোনদিন কি চেষ্টা করেছি ? তা যদি করতাম তাহলে আজ এতবড় কলঙ্ক আমাদের থাকত না যে 'বাঙলার কোন ইতিহাস নেই'। * আর একটি মস্ত দোষ আমাদের...আমরা পরের কথায় ভয়ঙ্কর বেশি চঞ্চল হই...যে যা বোঝাতে চায় আমরা তাই বুঝে নেবার চেষ্টা করি। সপ্ত দশ অশ্বারোহীর সাহায্যে বক্তিয়ার খিলজি বঙ্গদেশ অধিকার করেছিলেন, এই অদ্ভুত কাহিনী বিশ্বাস করা যে কোন জাতের পক্ষেই অসম্ভব হোত, কিন্তু বাঙালীর তা এতটুকু হোলনা' সে ছোট বেলা থেকে ঠাকুমার রূপকথায় দৈত্য দানবকে বিশ্বাস করে আসছে, সুতরাং তার সঙ্গে এটা বিশ্বাস করা খুব কষ্টকর তার পক্ষে হয় নি। মহারাজ নন্দকুমারকে যে জঘন্য ব্যক্তি বলতে লজ্জা পায়নি এর কারণ সে সাগর পারের লোকদের তাই বলতে শুনেছে। ভাগ্য ভাগাড়ে মলা চলে এমন 'কানপাতলা জাত' আর নাই।

আমাদের দেশের যে ইতিহাস নেই এর কারণ বাঙালীর একান্ত নিশ্চেষ্টতা। জীবনটা যে কিছু নয় এবং সংসার যে মায়া এ ধারণা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের মনে এমনি দৃঢ় ভাবে বাসা বেঁধেছিল যে তাঁরা ইহলোকের কোন কিছুর দিকেই নজর রাখতেন না। কে এলো আর কে গেলো সে সব দিকে খেয়াল না রেখে তাঁরা হরিসংকীর্ত্তনেই বিভোর হয়ে থাকতেন ; ফলে এক আধ্যাত্মিক চর্চা এবং সেই দিকেই উন্নতি ছাড়া অন্য কোন দিকে তাঁদের তেমন প্রসার লাভ হয়নি। ইতিহাস লিখতে হলে অনেক কিছুর সন্ধান রাখতে হয়...কিন্তু যাঁরা একমাত্র গৃহের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ছাড়া আর কারুর প্রতি নজর রাখেন নি তাঁদের কাছে ইতিহাস রচনা করার মত এমন বিরাট সাংসারিক কাজ আশা করাটাই আমাদের অন্যায়।

(আগামী বারে সমাপ্য)

---

* বাঙালীর ইতিহাস লিখিত হয় নাই। বাঙালী নিজে চেষ্টা না করিলে সে ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না। চেষ্টার অভাবে অনেক কথা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এখনও দিন দিন কত কথা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।'—৺ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 'আমার বিশ্বাস বাঙালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি'—৺ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

"বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়। তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙলার বিদেশী বিধর্ম্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিত মাত্র। বাঙালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙালার উদ্ধার নাই। কে লিখিবে ? তুমি লিখিবে আমি লিখিব, সকলেই লিখিব। যে বাঙালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্ব- সাধারণের মা জন্মভূমি বাঙালা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই ?

—৺ বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অপলাপ

—শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

জীবনের যত চিন্তার রাশি দুঃখের শুধু বোঝা,
নামিয়ে রেখে দে নির্ব্বোধ মন—পথটাকে কর সোজা।
দীর্ঘ এ পথে যেতে হবে যবে,
কেন বলো মিছে ভেবে মরো তবে,
বোঝো এই সার যা হ'বার হবে ব্যর্থ কারণ খোঁজা।
শেষ হীন অভিসার—
কেবা কোন কথা জেনেছে হেথায়—আসা-যাওয়া শুধু সার।

সন্ধান হেথা ব্যর্থ যে মন চিন্তায় নাহি ফল্—
তার চেয়ে এই মুক্ত সমীরে গান গেয়ে তুই চল্!
রয়েছে যা ঢাকা নিবিড় আঁধারে,
থাক প'ড়ে থাক পথের দুধারে,
মিছে কেন ভেবে মনের-বাধারে চঞ্চল হবি বল্!
চিন্তায় নাহি ফল্—
মুক্ত-হিয়ার মাধুরি ঢালিয়া সঙ্গীতে ভেসে চল্।

সম্মুখে তব নন্দন-বন সুন্দর ফুল রাশি,
নয়ন মেলিয়া চেয়ে দেখ ভূমে লুণ্ঠিত আলো হাসি।
আলোক-ছায়ার নিবিড় বারতা,
ঘন-বন-তলে মধু-মাখা ব্যথা,
মুছে যাক যত দুঃখের-কথা চিন্তা, সে যাক ভাসি।
মধুর সুনির্ম্মল—
আলোক পরশে অন্তরে ফোটে—পুলকের শতদল।

গোলাপের হাসি, অরুণের আলো, তরুণীর আঁখি-লাল!
চুম্বনে করো সার্থক তণু মাধুরীর মোহ জাল।
চাঁপার সুরভি পাপিয়ার গান,
পিপাসা মিটায়ে করে নেরে পান,
কে জানে নিঠুর বিধির-বিধান ঝ'রে যেতে পারে কাল।
মরুময় দুনিয়ার—
রূপসীর রূপ-জ্যোতিটুকু ছাড়া কিবা আছে বলো আর?

তরুণীর তণু, সুষমা যদি বা প্রভাতে ঝরিয়া যায়,
দুঃখ কিসের নবীন-মাধুরি জাগিবে প্রভাত-বায় ?
আঁখি খুলে দেখ প্রকৃতির পানে,
মুগ্ধ-সকাল নুতনের ধ্যানে,
জীর্ণ, অতীত ধুলা-আহ্বানে, কেবা আর তারে চায় ?
গিছে এ ভাবনা ভার—
বর্জ্জন ক'রে পান ক'রো শুধু নন্দন-সুধা-ধার।

পুরাতনে থাকবোনা

—শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

সেদিন যে চোলে গেছে
আর তো সে ফিরবে না
সে তরী যে বোয়ে গেছে
আর কুলে ভিড়বে না ;
সে দিনের সেই হাসি
সেই সুর সেই বাঁশী
তেমন মাধুরী নিয়ে
আর মনে ফিরবেনা।

অতীতের কথা নিয়ে
আর মালা গাঁথবো না
ফিরে ফিরে সে দুয়ারে
ঝুলি আর পাতবো না

সেদিনের সেই স্মৃতি
সেই ব্যথা সেই প্রীতি
সম্বল কোরে আর
অন্তরে রাখবো না।

অতীতের আমি গুলি
নানা ছাঁদে আঁকবোনা
যা দিয়েছি তাই দিতে
পিছনকে ডাকবোনা
জীবনের পিছে এসে
জীবনকে ভালোবেসে
নুতন যা দিয়ে যাবো
পুরাতনে থাকবোনা॥

গল্প

অকস্মাৎ

—শ্রীশান্তিকুমার দাশ গুপ্ত

আমারই বন্ধু প্রণব। মাত্র আঠাশ বৎসর বয়সেই দর্শন শাস্ত্রের এত বড় পণ্ডিত আর কেউ ছিল কিনা আমার জানা নেই। কি ক'রে যে সে নিজেকে কেবলমাত্র বইয়ের মধ্যেই বন্ধ ক'রে রেখেছে তা আমি ভেবে পাইনে। কে জাগিয়েছে তার মনে এত কৌতূহল কে জানে। কিন্তু কৌতূহল যে জেগেছে আর জেগেই যে থেমে যায়নি তা আমি বেশ ভাল রকমই জানি। আমাকে দেখলেই তার যেন দয়া হয়, বলে, 'কিছুই চিনলে না প্রশান্ত, এই যে এত বড় পৃথিবীটা—এটাকে সাদা চোখেই দেখলে শুধু—।' আমি কিছুই বলি না, মনে মনে হাসিই কেবল, ভাবি, 'বন্ধু, জানলে অনেক কিছু, শিখলেও, কিন্তু জ্ঞানের চশমাটা খুলে ভাল ক'রে চেয়ে দেখতে ত কই পারলে না একবার ও। কিন্তু যাক্।

সেদিন সটান ওর ঘরে গিয়ে হাজির হই।

একটা বই হাতে ক'রে ও তখন ঘরের মধ্যে পায়চারী ক'রতেই ব্যস্ত। বুদ্ধিকে এমনি করেই বোধ হয় বুদ্ধিমানেরা শানিয়ে নেয়। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলি, বইটা একবার ফেলে দেবে কি দয়া ক'রে ?

বই থেকে মুখ সরিয়ে ও চেয়ে দেখেই চেঁচিয়ে ওঠে, আরে প্রশান্ত যে, ঠিক তোমাকেই দরকার ছিল আমার এই সময়। কাল থেকে ভাবছি আর ভাবছি, ঠিক ক'রে ফেলেছি এবার জান, এই বিরাট পৃথিবীটা কি। সাধারণ লোকে মনের ভুলে—।

জোড় হাত ক'রে বলি, একটু দয়া কর প্রণব, বন্ধু ব'লেই দয়া কর অন্তত। যে দিনই আমি শুনি কেবল তোমার কথা, আজ আমার কথাই শোন একবার।

হাত নেড়ে ও বলে, হ্যাঁ শুনব, নিশ্চয়ই শুনব। যা বলছিলুম বুঝলে। রাত্রি বেলা তুমি হ'লদে জিনিষকে দেখবে ঠিক সাদার মত। সত্যি কি না ? হাসিতে ওর মুখ ভরে ওঠে, ওর আনন্দের গলা টিপে মারতে ইচ্ছে হয় না। চুপ ক'রেই থাকি। ও ব'লে চলে, এও ঠিক তাই, পৃথিবীটাও সাধারণের কাছে এমনি আত্মগোপন ক'রেই থাকে, কিন্তু জান বন্ধু—।

আর সহ্য করতে পারি না, চেঁচিয়ে বলি, না, আমি কিছুই জানিনা প্রণব। ওসব তুমি তোমার সহযোগীদের জন্য রেখে দাও, আমাকে মাপ কর। অনেক দিন অনেক ধৈর্য্য ধরে তোমার কথা শুনেছি আজ আমার একটা কথা শুনতে হবে তোমায়।

হতাশ হ'য়ে প্রণব ইজি চেয়ারটায় ব'সে পড়ে, বইটাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাখে পাশের টেবিলটায়।

আমি ওর সামনেই ব'সে প'ড়ে বলি, আজ তোমায় থিয়েটারে যেতে হবে আমার সঙ্গে। বহুদিনকার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা মনে হচ্ছে বন্ধু, আজ আবার সেখানেই ফিরে যেতে চাই। যত ক্ষতিই হ'ক তোমায় যেতেই হবে আমার সঙ্গে।

ও আবার খুসী হয়ে ওঠে, বলে, অতীত, বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ, ওই তিনটে নিয়েই সৃষ্টির সফলতা। কেউ কম নয়। ওই অতীত জানিয়ে দেয়—।

ওকে একটা ঠেলা দিয়ে বলি, যা ইচ্ছে জানাক তোমার অতীত, আমার দরকার নাই সে সবে। আমি জানতে চাই তোমার মত।

হাসি মুখে প্রণব বলে, নিশ্চয় যাব বন্ধু, সৃষ্টির অবমাননা করবার শক্তি আমার কোথায় ?

টিকিট কাটাই ছিল—একেবারে প্রথম শ্রেণীর। ওকে নিয়ে যাবই এই ছিল আমার ইচ্ছে আর সে ইচ্ছে সফলও হ'ল আমার।

বনলতার অভিনয় নাকি হ'য়েছে চমৎকার। সুন্দরী, তরুণী বনলতা—নাট্য জগতের সবচেয়ে বড় তারকা আর সব চেয়ে বড় আকর্ষণ।

শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য। দু' জনেই চেয়ে আমি সামনের দিকে। ধীরে ধীরে পর্দাটা যায় উঠে। ফুলের পোষাকে সজ্জিতা বনলতা ধরে গান—কোন্ অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে সে দিতে চায় নিজেকে আহুতি। গানের তালে তালে তার তন্বী দেহ ওঠে দুলে, যেন আপনা থেকেই সে ওঠে নেচে। সবাই মুগ্ধের মত চেয়ে থাকে সেদিকে।

প্রণব আস্তে আস্তে ব'লে ওঠে, অদ্ভুত দেবী মূর্ত্তি। সৃষ্টির আদিতে চারিদিকের অবস্থার সাথে মিলিয়ে প্রকৃতি দেবী উঠল নেচে। প্রকৃতি চায় পুরুষের সাথে মিশে যেতে। কোথায় সেই ধ্বনি, কোথায় সেই তিন পুরুষের সৃষ্টি ?

উত্তেজনায় ও উঠে দাঁড়ায়, পেছন থেকে অনেকে চেঁচিয়ে ওঠে, ওকে জোর ক'রে ধ'রে বসিয়ে রাখি। ধীরে ধীরে ড্রপটা প'ড়ে যায়।

প্রণব বলে, চল প্রশান্ত, ওখানে একবার যেতেই হবে আমায়, স্বর্গের সেই মূর্ত্তি আমি আর একবার দেখতে চাই।

হেসেই বলি, ওসব দূর থেকে দেখাই ভাল বন্ধু। ও স্বর্গও যেমন অস্বাস্থ্যকর ও সব দেবীরাও ঠিক তেমনি। চল বাড়ীর দিকে রওনা হওয়াই ভাল।

ও আমার জামা চেপে ধরে, বলে, ওসব কিছুই শুনতে চাই না আমি, তোমরা থাক অস্পষ্টতাকে নিয়েই কিন্তু আমি তা পারি না। তোমাদের চোখ যা দেখে তা সবই ভুল আর সে যে ভুল তা তোমরা বোঝ না বিশ্বাসও কর না। চল।

ও ভেতরের দিকে এগিয়ে যায় আমিও চলি ওর পেছনে পেছনে, কৌতূহলী মন কিছুতেই ছাড়ে না আমায়।

ম্যানেজার ওকে দেখেই হাত তুলে নমস্কার করে, বলে, কার সঙ্গে দেখা করতে চান আপনি ?

প্রণব বলে, সেই ফুলের সাজে—।

ওর কথা শেষ হবার আগেই ম্যানেজার হেসে বলে, বুঝেছি, বনলতা। সত্যিই ভারী চমৎকার,—না ? ফিরে যাবার সময় আপনাকে আমাদের প্রশংসা ক'রে—কিছু লিখে দিয়ে যেতে হবে কিন্তু—এই সার্টিফিকেট আর কি।

প্রণব অন্যমনস্ক ভাবে শুধু বলে, হুঁ।

চ'লতে চ'লতে ম্যানেজারের কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করি, ওকে চেনেন নাকি আপনি ?

দাঁত গুলো বার ক'রে নূতন রকমের হাসি হেসে ম্যানেজার বলে, বিলক্ষণ ! ওঁকে, চেনে না কে বলুন ত ! অনেকেই চেনে ওঁকে, উনিই কেবল এ গরীবদের—। হঠাৎ কথা থামিয়ে হাত দিয়ে একটা ঘর দেখিয়ে ম্যানেজার বলে, হাঁ, ওটাই, ওটাই বনলতার ঘর, ওর একটু আলাদা বন্দোবস্ত কি না। যান ও ঘরে—ভারী চমৎকার, ভারী ভাল ও।

ম্যানেজার বাইরে থেকেই বিদায় নেয়।

আমরা দু'জনেই ঘরে ঢুকে পড়ি।

সেই ফুলের সাজেই বনলতা ব'সে একটা চেয়ারে, গায়ের আঁচল লুটিয়ে পড়েছে মাটীতে—হাতে একটা সিগারেট; আমাদের দেখেই ঘাড়টাকে একটু নাড়িয়ে, শরীরের একটা ভঙ্গি ক'রে সে ব'লে ওঠে, বাপরে, কতক্ষণ ব'সে আছি, কেউ আর আসে না। নাচতে নাচতে পা দুটো যে ব্যথা হ'য়ে গেছে—বাঁচালে।

প্রণব স্থির হ'য়ে চেয়ে থাকে, একটা পাথরে গড়া মূর্ত্তি যেন সে। মুখে তার যে বেদনার ছাপ ফুটে ওঠে তা বোধ হয় আমি আর কারও মুখে দেখিনি কোন দিন।

কোন উত্তর না পেয়ে বনলতা যেন অবাক হ'য়ে যায়, সোজা মুখ তুলে চায় প্রণবের মুখের দিকে। প্রণব যেন চমকে ওঠে, ঘর থেকে বেড়িয়ে যায় একরকম ছুটেই। আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াই।

বনলতা ডেকে বলে, কিন্তু কি হ'ল বলুন ত ? কেন উনি অমন ক'রে পালিয়ে গেলেন ? রূপসী অভিনেত্রীর সে দম্ভ আর নেই—কে যেন তার মুখেও বুলিয়ে দিয়েছে কালীর ছাপ।

ওর দিকে চেয়ে বলি, নাট্য জগতের বিরাট তারকা আপনি, বিরাট আপনার প্রশংসা কিন্তু আমার বন্ধু যে জগতের মানুষ সে জগত সবার জন্য নয়। আপনার অভিনয় দেখে ও মুগ্ধ হ'য়েছে তাই স্বর্গের দেবী দেখতে এসেছিল সে, কিন্তু তার বদলে দেখে গেল কি ? দেখে গেল পৃথিবীর বিরাট লজ্জাহীনতার একটা অংশ।

চেয়ে দেখি বনলতার হাতে থেকে সিগারেটটা প'ড়ে গেছে তার অজ্ঞাতেই, ঠোঁট দুটো তার কি যেন ব'লতে চায়। বুঝতে পারি এ তার অভিনয় নয়।

আঘাত করবার একটা আকাঙ্ক্ষা জাগে, বলে চলি, বন্ধু বিশ্বাস করে নি আমার কথা, ব'লেছিল, যারা সতীত্বের মহিমা কীর্তন করে, যারা মাতৃত্বের বিরাট রূপ সবার চোখের সামনে তুলে ধরে তারা শুধু অভিনয়ই করে এ আমি বিশ্বাস করি না—কিন্তু বিশ্বাস ক'রতেই হবে এবার থেকে, কি বলুন ?

ও কোন কথাই ব'লতে পারে না, মাথা নীচু ক'রে চেয়ে থাকে মাটীর দিকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসি, কিন্তু প্রণব নেই কোথাও। নিজের মনটাও কেন জানিনা খোঁচা দিতে থাকে অনবরত। অন্যমনস্ক ভাবে বাড়ী ফিরে আসি।

দিন পনের পর কাগজের পৃষ্ঠায় দেখি বড় বড় অক্ষরে লেখা,—"শেষ রজনী, রঙ্গমঞ্চের অদ্বিতীয়া সুন্দরী শ্রেষ্ঠা অভিনেতৃ বনলতার শেষ বারের জন্য রঙ্গমঞ্চে অবতরণ'—তার নাট্য জগত ত্যাগের কোন কারণই জানা যায়নি। কাগজের পৃষ্ঠা ভরা তার জীবনী—তার সৌন্দর্য্যের, তার অভিনয়-নৈপুণ্যের স্তুতি। খবরটা প'ড়ে আমিও চমকে যাই। এ যে অভাবনীয়, ধারণার অতীত অথচ কোথায় যেন একটা রশ্মিও দেখা যায়। প্রণবের কথা মনে হয়। অভিনেতৃ বনলতা তাকে মুগ্ধ ক'রেছে—বনলতা দিয়েছে তার মনে রূঢ় আঘাত। সত্যিকার বনলতা আছে অনেক কিন্তু অভিনেতৃ বনলতা আছে কটা ? সে অভিনয়ই ছেড়ে দিতে চায়। প্রণবকে আর একবার নিয়ে যাওয়া যায় না।

প্রণবকে গিয়ে বলি, যাবে প্রণব আর একবার।

ও মাথা তুলে প্রশ্ন করে, কোথায় ? কারা কারা আসবেন।

বিরক্তির ভাবটা চেপে রেখে বলি, কারও আসবার প্রয়োজন নেই। যাবে সেই অভিনয় দেখতে ? সেই ফুলের সাজে সজ্জিতা দেবী।

প্রণব লাফিয়ে ওঠে, বলে, চল, হ্যাঁ, এখনই—সেই প্রকৃতির মিলনাকাঙ্ক্ষা, কিন্তু—। ও ব'সে পড়ে দু' হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে।

একটু অবাক হ'য়ে যাই, কিন্তু সহজ ভাবেই বলি, তবে তুমি ঠিক হ'য়ে নিও।

ও মুখ তুলে তাকায়, চোখ দুটো ওর লাল হ'য়ে উঠেছে, বলে, না, ওখানে যাওয়া হবে না আমার—শুধু অভিনয় প্রশান্ত। আর অভিনয় ভাল লাগে না, পৃথিবীটাই বিরাট রঙ্গমঞ্চ, এর মাঝে ওই সব ছোট গুলো এসে আরও ভাবিয়ে তোলে তা জান কি ? যাকে বিরাট মহীয়সীরূপে দেখি তাকেই আবার দেখি—। না থাক্, আমার যাওয়া হবে না।

ও যাবে না তা বুঝতে পারি, তবু বলি, কিন্তু এই ওর শেষ অভিনয়, ওই বনলতার—। 'কোন কথা নয় আর।' ও উঠে পড়ে, সারা ঘরটা পায়চারী ক'রে বেড়ায়, মনে মনে কি যেন ব'লতে থাকে, অস্পষ্ট—হয়ত কোন কথাই নয়।

একলাই যেতে হয়। নির্জ্জিবের মত শুধু দেখেই যাই। অন্য সবাই যখন আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে আমার মনটা তখন আরও খারাপ হ'য়ে যায়। কি সে কারণ বুঝি না, বুঝি শুধু মনের বিপর্য্যয়। বনলতার শেষ অভিনয় ও শেষ হ'য়ে যায়। অন্যমনস্ক ভাবে এগিয়ে চলি। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে ডাকে, শুনছেন, ও মশাই।

লোকটাকে চিনতে পারি না, কিন্তু ডাকছে যে আমাকেই তা বুঝতে পারি।

লোকটা বলে, আপনাকে ডাকছেন, হ্যাঁ আপনাকেই।

কোন প্রশ্ন ক'রতে ইচ্ছে হয় না, ডাকুক যার ইচ্ছে, যার প্রয়োজন। আমার প্রয়োজন নেই কিছু। লোকটার কথা শুনেই আমি এগিয়ে চলি।

ও ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে আসে, বলে, যাবেন না, বনলতা ডাকছে আপনাকে। আশে-পাশের অনেকেই চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, আমারও মনে কৌতুহল জাগে। ওর সাথে সাথে গ্রীনরুমের দিকে এগিয়ে চলি।

সেই বনলতার ঘর, কিন্তু আজ ঠিক সেদিন নয়। দিন পনেরর মধ্যে ঘরের অবস্থা গেছে বদলে—বদলে গেছে তার মালিক পর্য্যন্ত। এখনও পর্য্যন্ত তার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে সত্যি কিন্তু এই বিশেষের মধ্যে নেই এতটুকু কৃত্রিমতা, এতটুকু আড়ম্বর।

আমাকে দেখেই হাত তুলে নমস্কার ক'রে বনলতা বলে,

আপনি আসবেন তা আমি জানতুম। আমার এই শেষ দিনে আপনি অন্তত আসবেন এ বিশ্বাস আমার ছিল।

ওর সুন্দর হাসির দিকে চেয়ে সেদিনের রূঢ়তার জন্যে লজ্জিত হই।

ও ব'লে চলে, আপনার বন্ধু আসবেন না তাও আমি ভেবেছিলুম কিন্তু একটুও যে আশা ছিল না তাও নয়। উনি বড় কঠিন, না ?

বনলতা আমাকে যেন আজ বিস্ময়ের শেষ ধাপে নিয়ে যাবে, বলি, কঠিন উনি একটুও নন—একেবারে শিশুর মত মন, কিন্তু যা ভাল মনে না করেন তা সহ্য ক'রতে পারেন না কিছুতেই।

বনলতা বলে, যেতে হবে আজ আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে। শিক্ষা দিয়েছেন আপনারা তাই বোঝাও বইতে হ'বে আপনাদের।

কোন আপত্তি করতে পারি না, কোন ভয়ও হয় না—ওকে যেন আজ সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করা চলে।

ও বলে, ঈশ্বর এনে দিয়েছেন আপনাদের, সরিয়ে নেবারও তাঁর কোন অধিকার নেই। ও একটু হাসে।

আমি ওর মুখের দিকে চাই শুধু—ঈশ্বরের কথা যেন আজ ওর মুখে বেমানান হয় না।

ও যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারে, বলে, ঈশ্বরের কথা হয়ত' আমায় মুখে ভাল শোনায় না। কিন্তু ও ছাড়া আর যে আমার কোন পথই নেই প্রশান্তবাবু।

কিন্তু নামটা আমার জানলেন কি ক'রে ?

ও হাসে বলে, বিরাট পণ্ডিতের বন্ধু আপনি—আপনি ত' ছোট নন।

ওর বাড়ীতে এসে পৌঁছতে দেরী হয় না।

একটা ছোট বাক্স আমার হাতে দিয়ে ও বলে, আমার সমস্ত কিছুই আছে এর মধ্যে, আমার সমস্ত পাপও আছে সেই সঙ্গে। ভেতরের জিনিষগুলো কাগজ হ'লেও দাম কম নয়। পাপের জিনিষ সৎকাজে ব্যয় হওয়াই উচিত সৎকাজ সৎকাজই চিরকাল, ওর আর পতন নেই কিন্তু পাপীর উঠতে ইচ্ছে করে ত। তেমনি মিষ্টি হাসি ভেসে ওঠে ওর মুখে।

আমার সমস্ত মন খুসীতে ভরে ওঠে, বলি আমার বন্ধুকে আমি আজও চিনিনি বনলতা দেবী কিন্তু মুহূর্ত্তেই আপনি তাকে চিনেছেন আর সেই মুহূর্ত্তেই ফেলেছেন নিজেকে বদ্‌লে। তাই মনে হয়—মেয়েরা পারে না কি ?

ও বলে. কিন্তু তবু আপনার বন্ধুর কাছে যেতে আমার ভয় হয়। মনে হয় সেখানে দয়া নেই আছে শুধু কঠোর বিচার। প্রাণ তাঁর আছে কিন্তু তা যেন দেওয়া হ'য়ে গেছে, আর কারও অধিকার নেই তাতে। আপনি আমার দুঃখ বুঝবেন এ আমি জানি।

ওর কাছ থেকে ফিরতে দেরী হয়ে যায় কিন্তু মনটা তখন কানায় ভরা একটা স্বর্গীয় অনুভূতিতে। আমার বন্ধু—আমারই বন্ধু প্রণব।

দিন কয়েক পর।

আমাকেই দেখেই প্রণব বলে, মানুষের মন কি সুরে বাঁধা জান ? সবই এক—কিন্তু শুধু বোঝবার ভুল। এই বোঝবার ভুলটাই সৃষ্টির কারসাজি। যদি ওটা তুলে নেওয়া হত তবে কি হ'ত ? সব একাকার হ'য়ে যেত—সৃষ্টিও যেত লোপ পেয়ে।

ওকে থামিয়ে বলি, কিন্তু ওসব আমি ঠিক বুঝি না প্রণব—তার চেয়ে বরং আমার কথা শোন, বোঝবার গোল হবে না।

ও আমার মুখের দিকে চায়, বলে, সোজা ক'রে ব'লতে পারাই ভাল, শুনি তোমার মত কি ?

একটু চুপ ক'রে থেকে বলি, মানুষের সহবাসে মানুষ বদলায়, জান ত' ? এই বনলতা—।

ও আমাকে থামিয়ে বলে, না ওকথা শুনতে চাই না আমি—আমি যা বলছিলুম সে সম্বন্ধে তোমার মত কি ?

ওর হাত থেকে বইটা টেনে নিয়ে বলি, তোমার কথা তোমারই থাক। আমি যা বলছিলুম তা তুমি বিশ্বাস কর কি না ?

ও একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, হ্যাঁ, মানুষের সংস্পর্শে এসে মানুষ বদলায় এ খুবই সত্যি কথা।

ওর চোখের দিকে চেয়ে বলি, হ্যাঁ তাই হ'য়েছে আর হ'য়েছে ওই বনলতারই। ও বদলে গিয়েছে শুধু তোমার সঙ্গে মুহূর্ত্তের দেখা হওয়াতেই।

দরজাটা খুলে যায়—ভেতরে এসে ঢোকে বনলতা। অভিনেত্রী নয়, পুরনোদিনের ছলনাময়ীও নয়—স্নিগ্ধ, শান্ত বনলতা।

দু'হাত দিয়ে প্রণব চেঁচিয়ে ওঠে, যাও, যাও, এ ত' রঙ্গমঞ্চ নয়।

আস্তে আস্তে বনলতা এগিয়ে আসে, বলে, কোথায় যাব, আমার ত' বাড়ী ঘর কিছু নেই।

প্রণব ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকায়—সোজা চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ, বলে, কে বন—না, ও নাম আর নয়, তুমি জয়শ্রী, হ্যাঁ, তুমি তাই।

বনলতা প্রণবের পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করে।

প্রণব হাসিমুখে ব'লে ওঠে, ঘর বাড়ী নেই. প্রশান্ত, জয়শ্রীর ঘর বাড়ী নেই—ও পাগল, একেবারে পাগল।

জয়শ্রীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। আমি অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকি প্রণবের মুখের দিকে।

অনুবাদ সাহিত্য—

[কবি পরিচিতি ঃ—বর্ত্তমানে বিশ্বসাহিত্য রসপিপাসুদের কাছে ভারতীয় মণীষী শিল্পীকবি শাহেদ সারাবর্দির নূতন করে পরিচয় করিয়ে দিতে হ'বে না। তাঁর অসাধারণ শিল্প প্রতিভা আজ পাশ্চাত্য রসিক-জন সমাদৃত। অক্সফোর্ড থেকে অতি অল্প বয়সে ডিগ্রি নিয়ে তিনি রাসিয়ায় চলে যান এবং মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হ'যে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। তাঁহার অধ্যাপনা কালে ইতিহাস খ্যাত বিপ্লব সুরু হয় এবং তাঁহাকে কয়েক বছর নিদারুণ অসুবিধা অস্বাচ্ছন্দের মধ্যে কাটাতে হয়। তাঁহার জীবন বাস্তবের নানান ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ। তিনি বিখ্যাত ভাষাবিদ। জার্ম্মান, ইটালীয়ান, ফরাসী, স্পেনিস, রাসিয়ান প্রভৃতি নানা ভাষায় তিনি অনর্গল কথাবার্ত্তা ও বক্তৃতা দিতে পারেন। রাসিয়া বাস কালীন তিনি খ্যাতনামা Katscholov Gormanova নাট্য-সম্প্রদায়ের হ'য়ে নাট্য-প্রাঙ্গনে অপূর্ব্ব শিল্প প্রতিভার পরিচয় দেন। সম্প্রতি অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত Anthopology of modern Poets' নামক প্রসিদ্ধ সঙ্কলন গ্রন্থে জগতের উদীয়মান কবিদের সঙ্গে তাঁহার কয়েকটি রচনা স-সম্মানে স্থান পেয়েছে।]

Some day

You will not rue me
When I am dead,
Like a careless flower
Dropped from your head.

But some stormy day
By some fire light hour
I'll stir in your soul
Like an opening flower.

You will smile and think
And let fall your book,
And bend o'er the fire
With a far-off look.

—'Sahed Swbardy'.

কোন দিন

কান্না তোমার জাগবে নাক' প্রাণে
যখন যাবো মরে
যাব অনাদরের ফুলের মত
শিয়র হ'তে ঝরে।

কিন্তু…কোন ঝড়ের গোধূলিতে
প্রদীপ জ্বালা ক্ষণে
জাগব আমি বিকচ কলি সম
তোমার গোপন মনে।

সজল হেসে ভাববে আমার কথা
বইটি যাবে পড়ে,
আন মনেতে রইবে সুদূর চেয়ে
নুয়ে আগুন 'পরে।

—শ্রীসমর ঘোষ

মহিলা-মহল

পরিচালিকা—শ্রীকল্যাণী দেবী

নিবেদন

"অর্চ্চনা"র সম্পাদক মহাশয় এই নূতন বিভাগটি পরিচালনা করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন, আর আমিও এই কাজের ভার সানন্দেই গ্রহণ করেছি। মা বোনের সঙ্গে একত্র মিলিত হয়ে নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার উন্মাদনাই আমাকে এই কাজে অগ্রসর করলো। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে আর সেই সঙ্গে সন্তান-পালন ও সংসার ধর্ম্ম পালনে যাতে আমরা জগতের অন্যান্য প্রগতিশীলা নারীদের সমান হ'তে পারি, সে বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হওয়া দরকার।

অনেকে বলেন যে সন্তান পালন ও গৃহস্থালী কাজ ছাড়া মেয়েদের অন্য দিকে মন দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। লেখাপড়া শেখার বিষয়ে তাঁরা বলে থাকেন, রামায়ণ, মহাভারত পড়বার আর স্বামীকে চিঠি লেখবার মত একটু বাঙ্গালা শুধু মেয়েরা পড়ে রাখবে। সংসারের কাজ নারীর। তাদের লেখাপড়ায় দীর্ঘ সময়ক্ষেপ করা উচিত নয়। তাতে গৃহে অশান্তির সৃষ্টি হয়। বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত এই সব অচল-অটল মত স্বার্থপর পুরুষের দল পোষণ করে আসছেন। মেয়েরাও সেই সব মতের প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন চিরকাল। কিন্তু পুরুষের মতই প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আসছে। কারণ নারী সারাটা জীবন ধরে পুরুষেরই তাঁবে বাস করে আসছে বলে। আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বুই জন পুরুষই তাদের ঘরের মেয়েদের সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। সাধারণতঃ আমাদের ঘরে দেখা যায় পুরুষ ঘুম থেকে উঠলেন বেলা আটটায়। আর নারী তাঁর পুরুষের আহারের যোগাড় করবার জন্যে খুব ভোরে উঠেই রান্নাঘরের কাজে লেগে গেলেন। তারপর স্ত্রী বাড়ীর সবাইকে খাইয়ে সংসারের বাকী কাজ কর্ম্ম সেরে যখন নিজে খেয়ে উঠেন তখন ঘড়ীতে বাজে তিনটে। একটু গড়াবার সময় চোখ দুটো বুজে আসবার কিছু আগেই ছেলেরা স্কুল থেকে আসে। তাদের জল খাবার দিতে হয়। তারপর আবার কাজ। সব শেষ হয় রাত বারোটায়। সেই সময় কোন কোন স্বামী আবার স্ত্রীকে বিছানা থেকে তুলে তার কাছে হতে একটু সেবা চান। রাত একটায় স্ত্রীর ঘুমাতে যাবার সময় হয়। ঘুমাতে গিয়েও নিস্তার নেই। রাত একটা হতে ভোর ছয়টা, এই সামান্য বিশ্রামের ভেতরেও তিনবার খোকা ওঠে। —এই ভাবেই কেটে যাচ্ছে আমাদের দেশের শতকর' নিরানব্বুই জন বিবাহিতা নারীর জীবন। এই সব নারীরা তাদের উন্নতির বিষয় কখন চিন্তা করবে? কখনই বা অন্যান্য নারীদের সঙ্গে একত্রে মিলে তাদের মহান সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা করবার সুযোগ পাবে?

আমাদের দেশের শিক্ষিতা কুমারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে শুনে উল্লাস প্রকাশ করবার কারণ নেই। কারণ তাদের সংখ্যা আশানুরূপ বাড়তে এখনও বহু দেরী। তা ছাড়া যে সব কুমারীরা শিক্ষিতা হচ্ছেন তাঁদের প্রায় সবারই অশিক্ষিতা নারীর প্রতি একেবারে সহানুভূতি নেই। যার ফলে আমরা যে তিমিরে এতদিন পড়েছিলাম এখনও সেই অজ্ঞান তিমিরেই পড়ে রয়েছি।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে অধিকাংশ পুরুষ বলেন, মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে অন্দর-মহলে, লেখাপড়ায় তাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এর উত্তরে আমার মত হচ্ছে, মেয়েদের পড়াশোনা আর সংসারের কাজ সমভাবেই দরকার। কারণ সমাজের দুই অঙ্গের মধ্যে এক অঙ্গ হচ্ছে নারী। নারীকে শিক্ষাদানে কার্পণ্য করলে তাদের খোলা আলো হাওয়ার সম অংশী না করলে সমাজ চিরকালই পঙ্গু থেকে যাবে। যক্ষারোগ গ্রস্থা কত লক্ষ লক্ষ নারী অকালে প্রাণ হারাচ্ছে কি জন্যে, তা বোধ হয় কারও অজানা নেই। তার প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব ও কুসংস্কার। আজ আমাদের ঘরে ঘরে বিয়োগান্ত নাটকের মত যে করুণ দুঃখের অবতারণা হচ্ছে তার প্রতীকার করতে হবে। "অর্চ্চনার" মারফৎ আমি বাঙ্গালার নারীদের এই বিষয়ের আলোচনার জন্য পত্র আহ্বান করছি।

ওগো বাঙ্গালার মেয়েরা! স্বাস্থ্যে, শিল্পে শিক্ষায় শ্রীমণ্ডিতা হ'য়ে ওঠো। তোমাদের কোলে আগামী দিনের মহামানবের আত্মা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।

মেয়েদের স্বাস্থ্য চর্চ্চা

শ্রীপ্রতিমা দেবী

গরীব ও সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়েরা সংসারে যে শারিরীক পরিশ্রম করে থাকেন তাতেই তাঁদের সর্ব্ববিধ ব্যায়ামের কাজ সমাধা হ'য়ে থাকে। তবুও তাঁদের শরীর দুর্ব্বল থাকে কেন? এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, ওই সব ঘরের মেয়েরা পরিশ্রমের অনুপাতে উপযুক্ত বিশ্রাম পান না। এ ছাড়া খোলা আলো হাওয়ার মধ্যে তাঁরা বেড়াতে ও পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পান না। যার ফলে আমাদের দেশের গরীব ঘরের মেয়েরা কঙ্কালসার হয়ে নিজেদের সন্তানবর্গকে দুর্ব্বল করে সারা দেশের ক্ষতিকে দিন দিন বাড়িয়ে তুলছেন। সেই জন্যে এই সব মেয়েদের আমি উপযুক্ত বিশ্রাম পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ও বিকালে কিছু-ক্ষণের জন্য খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে আসতে বলছি। তাতে তাঁদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। সেই স্বাস্থ্যোন্নতির উপর দেশের ভবিষ্যত বংশধরদের শক্তিশালী হওয়া বিশেষভাবে নির্ভর করছে।

আমাদের দেশের পর্দ্দানসীন পরিবাররা পরিশ্রমের পরে উপযুক্ত বিশ্রামটা মেনে নিলেও বাকী দুইটার বিষয় তাঁরা হয়তো আপত্তি করবেন। তাঁরা বলবেন,—"গরীব" মানুষ, পুষ্টিকর খাদ্য পাব কোথায়? অত পয়সা আমাদের নেই। আর পুরুষদের মত বাড়ীর বার হ'য়ে বেড়াতে যাব কি করে গা? ও সব ধিঙ্গীপানা আমাদের চোদ্দ পুরুষেও—কেউ কখনো করে নি।"

তাঁদের প্রথম কথাটীর উত্তরে আমি জানিয়ে দিই যে পুষ্টিকর খাদ্য খুব কম পয়সায় কেনা যায়। সাধারণ শাক সব্জি, টাটকা মাছ আনাজ ঢেকি ছাঁটা চাল, ডাল তেল, ডাল ছোলা, এই সবই হচ্ছে সাধারণ পুষ্টিকর খাদ্য। এতে পয়সা খুব বেশী খরচ হয় না। এ ছাড়া চোদ্দপুরুষে যে কাজ কেউ করেনি সে কাজ অর্থাৎ মুক্ত হাওয়ায় বেড়ানো অতি অবশ্য করণীয় কর্ম্মরূপেই মেয়েদের করতে হবে।

কারণ আজ মাতৃজাতির স্বাস্থ্যোন্নতির বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নিজে স্বাস্থ্যবতী না হলে তার ছেলে কখনও স্বাস্থ্যবান হ'তে পারে না। শুধু নিজেদের ছেলেদের মুখচেয়ে দেশের মুখ চেয়ে পর্দ্দানশীনরা যেন তাঁদের পর্দ্দার মাত্রাটা একটু কমিয়ে দেন। এই অনুরোধ আজ আমি আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে করছি।

এই গেল গরীবের ঘরের মেয়েদের কথা। এইবারে ধনী ঘরের মেয়েদের কথা বলবো। —ধনী ঘরের মেয়েদের স্বাস্থ্যও ভাল দেখা যায় না। তাঁরা পুষ্টিকর খাদ্য, মটরে ভ্রমণ এই বিষয়ে সচেষ্টা থাকলেও শুধু দৈহিক পরিশ্রমের অভাবে দিন দিন মেদ বাহুল্য বশতঃ স্থূলদেহী হয়ে যাচ্ছেন।

বাড়ীতে গণ্ডা গণ্ডা ঝী, চাকর। তাই তাঁদের কাজ কর্ম্ম করতে হয়না বলে তাঁদের দৈহিক পরিশ্রম একেবারেই হয় না। এই জন্যে আমি এদের প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় অন্ততঃ পাঁচ মিনিট করে ও ফ্রী হ্যাণ্ড ব্যায়াম করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমাদের দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্য চর্চ্চা করা আজ সর্ব্ব দিক দিয়ে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শীঘ্রই আমাদের স্বাস্থ্যের অপূর্ব্ব দীপ্তিতে দেহকে ভরিয়ে তুলে প্রমাণ করতে হবে আর আমরা অসহায় নই, দুর্ব্বল নই।

ত্রিবেণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—শ্রীপ্রফুল্ল স্বাম্মা

সেভেনটি এইট বাই ফাইভ বালীগঞ্জ প্লেস—

গাড়ীবারান্দাওয়ালা হাল ফ্যাসানের একটি দুতলা বাড়ী ফটক পেরিয়েই রাঙা কাঁকরের রাস্তা, ঘুরে গিয়ে মিশেছে গাড়ীবারান্দাটার কোলে।

দুধারে সবুজ প্রাঙ্গন—বিদেশী ফুলের কেয়ারি করা।

বাড়ী চিনে নিতে অসীমের একটুও বেগ পেতে হলো না। অসীমা তারই প্রতীক্ষায় গাড়ীবারান্দার ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল।

অসীম মোটর থামিয়ে নেমে প'ড়ল। হাত তুলে তাকে অভিনন্দন জানালে অনেকটা গ্রীসিয় পদ্ধতিতে। অসিমার তরফ থেকে এলো মৃদুহাসির অভ্যর্থনা।

—"আসুন" বলেই ছাদ থেকে সে নিমেষে অন্তর্হিত হ'লো।

লোহার ফটকটা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করতে অসীম মুহূর্ত্তের জন্যে কেমন যেন দ্বিধা অনুভব করলে। সম্পূর্ণ অপরিচিত বাড়ীতে একমাত্র তরুণীকে উপলক্ষ্য করে আসা, এর মধ্যে বেশ খানিকটা 'শিভ্যালরি' থাকলেও, আশপাশের বাড়ীগুলো থেকে ওই যে কয়েকটি তরুণীর যুগ্ম আঁখি তার দিকে কেন্দ্রবদ্ধ হয়ে আছে, ওটা তার কাছে ঠিক প্রীতিপ্রদ নয়।

কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য। ততক্ষণে অসীমা নীচে এসে দাঁড়িয়েছে, ড্রয়িংরুমের দরজার কাছে।

অসীম সোজা ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসলে। অসীমাও বসলে ঠিক তার সামনের আসনে।

—"চমৎকার লোক আপনি। এসে পর্য্যন্ত কি একটা চিঠিও দিতে নেই?"—অনুযোগের সুরে অসীমা বললে।

"—দেখুন, ঐ কেমন আমার একটা স্বভাব। "মুড" না এলে এক কলমও আমি লিখতে পারি না। বিশেষ করে—"

অসীমা বাধা দিয়ে বললে—"তা এ দুমাসের মধ্যে 'মুডের' একদিন না হোক, ঘণ্টারও কি আসবার ফুরসৎ হলো না?

অসীম অপ্রতিভ হয়ে জবাব দিলে—না। এসে অবধি কাজ আর কাজ। কাজের যাঁতায় জীবন একেবারে নিষ্পেষিত। আজও আটকে পড়েছিলুম আর একটু হলে। বললে বিশ্বাস করবেন না, সেই অবধি এমন একটি নিরিবিলি সন্ধ্যাও মিললো না, যার অন্তরালে বসে আমার এ অন্তরকে প্রসারিত করে দিই সেই টিনের বাংলো আর নীল শৈলমালার দেশে।

আর পূর্ণিমার রাত্রিগুলো ত বেমালুম ঘুমেই কেটে গেলো।—"চমৎকার—" মৃদু হেসে অসীমা বললে।

"—তা বলে ভাববেন না যেন আপনাকে ভুলে গেছলুম সেই থেকে এসে অবধি এমন একদিনও কাটেনি, যেদিন আপনার কথা মনে হয়নি। বিশেষ করে উড়িয়াঠাকুরের অন্নব্যঞ্জন গলাধঃকরণ করতে করতে কতবার যে আপনার কথা মনে হয়েছে—"

"—ধন্যবাদ। শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকবার কষ্টটুকু নাই বা করলেন—ওটুকু আমিই সেরে নেবো—" অসীমা তেমনি হেসেই জবাব দিলে।

"—বিশ্বাস যদি না-ই করেন, তবে আমি নিরুপায়—" কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের ছায়া মুখের ওপর ঘনিয়ে এনে অসীম বললে,—কিন্তু আপনারও উচিত ছিল একবার খবর করা। একটি লোক যে আপনার কাছ থেকে চলে এলো, সে মরলো কী বাঁচলো, তাও একবার খোঁজ নিয়েও দেখলেন না—।"

"—এই ত তাকে চোখের গোড়ায় জলজ্যান্ত বিদ্যমান দেখছি। আর তাছাড়া ট্রেন দুর্ঘটনার ত কোনও সংবাদ পাইনি, আর কলকাতার এপিডেমিকেরও কোনও খবর সেখানে পৌঁছায়নি, তাই সে রকম অমঙ্গল আশঙ্কার তেমন হেতু ঘটেনি। কিন্তু থাক্, আমি আমার অনুযোগ তুলে নিচ্ছি। নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে আপনাকে আর ফাঁদ

রচনা করতে হবে না। —সোজা কথায় বলুন না কেন ভুলে গেছলেন।—"

"অগত্যা।"

দুজনে সমস্বরে হেসে উঠলো।

"—বসুন, এক্ষুনি আসছি, আপনার চায়ের যোগাড় দেখি—" বলে অসীমা উঠলো।

অসীম বললে—'তার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখছি না। কারণ উদরে আর জলবিন্দু রাখবারও জায়গা নেই। সে সব পালা আগে থেকেই সেরে এসেছি। আপনি বরং একেবারে তৈরী হয়ে আসুন। বেরিয়ে পড়া যাক্।—"

"—আমি ত একঘণ্টা আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছি। কিন্তু দেখবেন শেষটা যেন আতিশয্যের অপবাদ দিবেন না।"

"—যে ঔদরিকতার প্রশ্রয় আপনি দিয়েছেন মৈমনসিংএ তারপরে ও সম্বন্ধে আমার আর জিহ্বা উত্তোলন করা চলে না।"

"—ভারি ত'! কেন মিছিমিছি আমাকে লজ্জা দেন বলুন ত?" সলজ্জ হেসে অসীমা বললে।

"—ও কথা যাক্।" অসীম বললে, "লজ্জার প্রসঙ্গ তুললে আমাকেই বেশী লজ্জা পেতে হয়। কিন্তু এ বাড়ীর কর্তৃপক্ষের কাউকে ত দেখছি না, আপনাকেই যেন সর্ব্বময়ী বলে মনে হচ্ছে।"

"—এ বাড়ীর কর্তৃপক্ষেরা সম্প্রতি অনুপস্থিত। কর্তৃপক্ষ বলতে দুটি মাত্র প্রাণী। আমার মাস্তুতো বোন আর তার স্বামী। দুজনেই প্রফেসার। বোনটি বেথুনের এবং বোনাইটি প্রেসিডেন্সির। মৈমনসিংএর চাকরিটি আমার এঁদেরই দৌলতে পাওয়া। খুবই স্নেহ করেন আমায়। ওঁদের আসবার দেরী আছে। নইলে আলাপ করিয়ে দিতাম আপনার সঙ্গে।—"

অসীম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বললে—"আলাপের জন্য বিশেষ ব্যগ্র নই। বরঞ্চ তাঁদের এই অনুপস্থিতির অবকাশে দুজনে সরে পড়বার সুবর্ণ সুযোগ। অতএব আর বিলম্ব নয়, এইবেলা যাত্রা করা যাক্।"

"—কিন্তু দেখবেন। শেষটা আইনের বেড়াজালে বাঁধা পড়তে না হয়।—"

"—বাদী স্বপক্ষে থাকলে সে আশঙ্কা নেই। যান—চট্‌পট্।"

"—আচ্ছা, বসুন। আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।"

সবুজ শাড়ীর আঁচলটা দুলিয়ে সে চলে গেল, ধীর মন্থর গতিতে। এই ক'মাসের মধ্যে অসীমার চেহারায় বেশ পরিবর্তন এসেছে ছন্দের বন্যা। তার চলা-ফেরায়, কথা-বার্তায়, দীর্ঘায়ত দুটি নয়নের চঞ্চল কটাক্ষে লেগেছে সজীবতার স্পর্শ। কেবল গায়ের রংটা আগেকার চেয়ে একটু কালো হয়েছে।

স্নিগ্ধা আর অসীমা—আকস্মিক গ্রহের মত এই দুজনে দেখা দিয়েছে অসীমের জীবনে। সে বেশ বুঝতে পারছে, এই দুটি মেয়েকে কেন্দ্র করেই তার জীবন ধারা ক্রমশঃ সমস্যা-সঙ্কুল হ'য়ে উঠচে।

স্নিগ্ধা—স্নিগ্ধার বেহায়াপনা সে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না। অত্যন্ত নির্লজ্জ আর গায়ে পড়া মেয়ে এই স্নিগ্ধা। তবুও ওকে উপেক্ষা করা চলে না। সে জানে ওর ভালোবাসা, ওর অশ্রুজল সমস্ত ব্যবসাদারি আর মেকি শূন্যগর্ভ নদীর মত ওতে শুধু আছে জলোচ্ছ্বাস, নেই গভীরত্ব কিন্তু অপরাধই বা কি ওদের? নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েই সে বুঝেচে নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের মর্ম্মবেদনা কতখানি। দারিদ্র্যের বিনিময়ে মানুষকে যেখানে করতে হয় আত্ম বিক্রয় সেখানে মানুষকে পাপী করা চলে না। পাপ তার দারিদ্র্যের। স্নিগ্ধার ভালোবাসা যদি অভিসন্ধির নামান্তর হয়, তবে সে দোষ স্নিগ্ধার নয়।

কিন্তু অসীমার এই অকুণ্ঠ অথচ সংযত ব্যবহার, তার মিষ্টি সরস বচন-ভঙ্গী, সুনিপুণ কর্ম্মতৎপরতা, বুদ্ধিমার্জ্জিত আননের দীপ্তশ্রী, তার শিক্ষা তার সংস্কার, সমস্ত মিলে অসীমের আদর্শকেই যেন জীবন্ত করে তুলেছে। অসীম আর অসীমা, কে জানে তাদের দুজনকার এই নামের মিলের মধ্যে লুকিয়ে আছে কিনা তাদের ভবিষ্য-জীবনের মিলন সম্ভাবনা।

সিঁড়িতে স্লিপারের শব্দতরঙ্গ তুলে অসীমা নীচে নেমে এলো। হাতে তার 'ভ্যানিটি ব্যাগ'। শাড়ীটাকে এরই মধ্যে ঘুরিয়ে প'রে এসেছে পার্শীধরণে। মুখে লেগে রয়েছে প্রসাধনের সদ্যোছাপ।

"—চলুন।" অসীমা মৃদুগলায় বললে, "—এক মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট দেরী হয়ে গেল।—"

"—ও সম্বন্ধে বাঙালী পুরুষদের অপবাদ আজও ঘোচেনি, বাঙালী মেয়েদের অপবাদ কোনওকালে ঘুচবে কিনা সন্দেহ।"

"কেন, বাঙালী মেয়েরা এতই হেয় নাকি ?—"

"—সে কথা আমাদের চেয়ে আপনারাই ভালো ক'রে জানেন। ও নিয়ে আর তর্কের তুফান তুলে লাভ নেই। কিন্তু আপনি যে একেবারে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে এলেন। আমাদের গন্তব্যস্থল কোন দিকে ? 'শপিং' এ নাকি ?

"—না, শূন্যহাতে পথ চলতে নেই। তাই এটাকেই সাথী করলুম। উপস্থিত লেকের দিকেই যাওয়া যাক্। ফিরতি বেলায় আপনার গৃহে একটু আতিথ্যলাভের ইচ্ছা আছে, অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।—"

"—সৌভাগ্যের আতিশয্য আজ দেখছি একেবারে ষোলকলায় পরিপূর্ণ। আসুন।—"

"—চলুন—" বলে অসীমা গাড়ীবারান্দার তলে নেমে এলো। চাকরকে বলে দিলে ফিরতে তার রাত্তির হবে।

দু'জনে পাশাপাশি মোটরে গিয়ে বসলো। গাড়ী ছুটে চললো লেক অভিমুখে।

য়ুনিভার্সিটি রোয়িং ক্লাব ছাড়িয়ে খানিকটা পশ্চিমে মোটর এসে থামলো যখন, সূর্য্য তখন সবেমাত্র অস্ত গিয়েছে। পূর্ব্বদিগন্তে নিশ্চল মেঘপুঞ্জে ঘনিয়ে উঠেছে সন্ধ্যার আরক্ত আভা। গোলাপী আর নিলে সারা আকাশটা যেন নেশায় রঙীন হয়ে আছে।

গাড়ী থেকে নেমে তারা ঘন তৃণ শোভিত উঁচু মাটির ঢিবিটার ওপর এসে দাঁড়ালো। ওপারে রেল-লাইন, সিগন্যাল আর টেলিগ্রাফের পোষ্ট। দিগন্তশায়ী বনরেখার কোলে কোলে টিনের চালাওয়ালা কুটীর। আরো দূরে কোন চালের কলের চিমনী থেকে ধূমনিঃসৃত হচ্ছে ঊর্দ্ধরেখায়। মাঝে মাঝে ট্রেন চলেছে, ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় সারা আকাশটা উঠছে কালো হয়ে।

এপারে দাঁড়িয়ে ওপারটাকে ঠিক পাড়াগাঁ বলে মনে হয়।

এধারে যেন আন্তর্জ্জাতিক মেলা বসেছে। ফেরিওয়ালার বিচিত্র কণ্ঠ সমন্বয়, শিশুদের কলকণ্ঠের ঝঙ্কার, স্থানে স্থানে ছেলেদের ফুটবলের প্রতিযোগিতা। এ যেন এক অপূর্ব্ব শব্দময় জগতে এসে পড়েছে তারা।

ঘাসের ওপরে তোরা দুজনে বসলো পাশাপাশি।

"—আজকের দিনে মৈমনসিংএর কথাটা খুব বেশী করে মনে হচ্ছে না ?" "—অসীম প্রথম মৌনতা ভঙ্গ করে বললে।

"—সত্যি—" অসীমা ছোট্ট করে জবাব দিলে।

আবার স্তব্ধতা। আকাশের গোলাপী আভা ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে, গোধূলির ছায়া নামছে গাঢ়তর হয়ে।

অসীম ভাবছিল—অসীমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় দিনের কথা। ট্রেনের অপ্রত্যাশিত আলাপ সদ্যোপরিচিতা এক নারীর আতিথ্য-স্বীকার বাঙালী জীবনের এত বড় এ্যাডভেঞ্চার, এক অসীম সেন ছাড়া, ইতি পূর্ব্বে আর কাহারও অদৃষ্টে ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। জীবনটাই আগাগোড়া একটা উপন্যাস। কিন্তু কে জানে, এ রোমাণ্টিক কাহিনী শেষ পর্য্যন্ত শুধু কাহিনীই থেকে যাবে কিনা ? কোথায় অসীম আর কোথায় অসীমা, দুজনের জীবনের মাঝখানে হয়ত গড়ে উঠবে এক দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধান। কালের কষ্টিপাথরে শুধু আজকের এ সন্ধ্যার কাহিনীটুকু বেঁচে রইবে স্মৃতির স্বর্ণরেখায়।

অসীমা ভাবছিল তার গত জীবনের কথা। ম্যাট্রিক পাশের পর সেই তার রামধনু রঙা ভবিষ্যতের স্বপ্ন। হয় আই-সি-এস নয় স্বয়ং স্বতন্ত্র জীবন। চেলীপরা সীমন্তিনীর সাজে কোনও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের শোভাবর্দ্ধন করে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সে গণ্ডীবদ্ধ করতে চায়নি। সেই পর্ব্বত প্রমাণ আকাঙ্ক্ষার সাফল্যের লোভে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে ডিগ্রীর পর ডিগ্রী লুণ্ঠনের কী বিপুল প্রয়াসই না তাকে করতে হয়েছে জীবনে। কিন্তু কোথায় আজ সেই ভবিষ্যতের সোনালী তটরেখা ? তার এ বাইশ বছরের জীবনে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে বহু রকমের অভিজ্ঞতা। বহু পুরুষকে বঞ্চিত করে এবং বহু পুরুষের বঞ্চনা পেয়ে আধুনিক প্রেমের ওপর সে হয়ে পড়েছে বীতশ্রদ্ধ। কারণ সে দেখেছে, যে সব পুরুষেরা রোমান্সের আকর্ষণে তার কাছে এসেছে, তার দুই চোখে দেখেছে নীল আকাশের স্বপ্ন'

তার নিবিড় কালো এলোচুলের সঙ্গে করেছে শ্রাবণ মেঘের তুলনা, বিয়েব নামে তাবা পবিপাটি পলায়নে অভ্যস্ত। মেয়েদের কালচার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার মূল্য কতটুকু? শুধু টাকা রোজকার আর অন্ন-সংস্থানের সঙ্গে তার সম্পর্ক। সমাজ আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই আদিম অবস্থায়। নারী আজও পণ্যের সামিল। সমাজের উচ্চ আসনের প্রবেশ পত্র লাভ করতে হয় তাকে রূপ ও অর্থমূল্যের বিনিময়ে।

না, আই-সি-এসের পত্নীত্ব গৌরবের দুরাকাঙ্ক্ষা আর তার নেই। তার চেয়ে ভালো এই স্বয়ংস্বতন্ত্র জীবন। হালকা মেঘের মত নীল আকাশে গা ভাসিয়ে যাওয়া, প্রজাপতির পাখার মত লঘু গতিচ্ছন্দে, বহু বিচিত্র রঙীনতার আস্বাদে ভরপুর হয়ে থাক এ জীবন! কিন্তু এই সুদীর্ঘতম নিঃসঙ্গতা, এই একটানা নির্জ্জনতার মাঝখানে অন্তরের সার্থকতা কোনখানে? একলা থাকার বেদনা যে কী অসীমা তা ভালো করেই জানে। সে চায় সঙ্গী, মমতায় কোমল একটী দরদী অন্তর। স্কুলের কর্ম্ম অবসানে, মৈমনসিংএর টিনের বাংলোয়, নির্জ্জন সন্ধ্যায়, বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুয়ে কতদিন সে ভেবেছে অসীমের কথা। সামান্য কয়েকদিনের মাত্র পরিচয়, অথচ মনে হয় যেন কত যুগ-যুগান্তের আলাপ। অসীমের সঙ্গে তার পরিচয় যেন একটা নাটকীয় উপাখ্যান।

মৈমনসিংএর সেই অল্প কয়েকদিনের নিভৃত আলাপ, সেই স্বপ্নময় পরিবেষ্টনী, দুজনকার কল্পনায় রচা সুন্দর এক কাব্য রঙীন জগৎ, ক্ষণে ক্ষণে অসীমার মনে হতো যেন তারা দুজন স্বামী-স্ত্রী, নব-তম সংসারের আঙিনায় পেতেছে নূতন গৃহস্থালী। অসীমের মত এত ঘনিষ্ঠতমভাবে অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে তার মিশিবার সুযোগ ঘটেনি। এ যেন তাদের দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করবার আগে একবার মহলা দিয়ে নেওয়া। কিন্তু তার এ বহু প্রবঞ্চিত জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে অনেকখানি সতর্ক করে তুলেছে। অসীমের কাছে সে সহজে ধরা দেবে না, আগে তার ভালোবাসাটা একবার যাচাই করে নেওয়া দরকার। তার এ কলকাতায় আসার প্রধান উপলক্ষ্য একমাত্র অসীম।

হঠাৎ একটা মোটরের হেড-লাইটের আলো চোখে এসে পড়তে দুজনে চমকে উঠলো।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সম্মুখে দিগন্ত জোড়া ঘন-অন্ধকার। আকাশে ফুটে উঠেছে অসংখ্য তারা। সামনের নব-নির্ম্মিত বাঁধানো সেতুটার ওপর দিয়ে চলেছে অগণিত জনপ্রবাহ ও যানবাহনের আনাগোনা। দূরে সাদর্ন এভিনিউর মোড়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডের জায়গাটা রঙীন আলোয় ঝলমল করছে।

ওপারে অন্ধকারের বুকে বাঁশী বাজছে সকরুণ সুরে। দখিণা হাওয়ায় ভেসে আসচে তার ক্ষীণতম রেশ। নিকটে পঙ্কজী গলার অনুকরণে সুরটাকে যথাসম্ভব কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কে গান ধরেছে—

"ফুলের বাহার নাইকো যাহার ফসল যাহার ফললো না।
অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো, সাঁঝের আলো জ্বললো না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কেরে
দিনের শেষের শেষ খেয়ায়।"

"—চলুন, ওপারে একটু বেড়িয়ে আসি," অসীমের হাতে একটা মৃদু চাপ দিয়ে অসীমা বললে।

"—ওদিকটা যে অন্ধকার—"অসীম আপত্তি তুললে।

"আলোর চেয়ে অন্ধকারই ভালো—তৃণাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অসীমা বললে—"আলোর চেয়ে অন্ধকারের ভাষা আরও গভীর, রহস্যময়। পড়েননি শ্রীকান্ত? শরৎবাবুর সেই অন্ধকার রাত্রির বর্ণনা? অন্ধকারের সৌন্দর্য্যকে এত গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে আর কাউকে দেখিনি। আন্ধকারই মানুষের জীবনের খাঁটি সুর।

—তা নয় হলো, কিন্তু অন্ধকারের সঙ্গে গুণ্ডার অতর্কিত আক্রমণের যোগাযোগের কথাটাও স্মরণ করলেন—পরিহাসের সুরে অসীম বললে।

—আপনি রয়েছেন কি করতে? অসীমা প্রত্যুত্তর দিলে।

"—আমাকে কি আপনার চিরস্থায়ী 'বডিগার্ড' পেলেন?—সেই নৈহাটি ষ্টেশন থেকে আরম্ভ করে

চিরকাল আপনাকে কেবল গুণ্ডার আক্রমণ ভয় থেকে রক্ষা করবো ?"

দুজনে মৃদু পদবিক্ষেপে এগিয়ে চললো।

অসীমা উত্তর দিলে—"এ পর্য্যন্ত ত সে দৈব-দুর্ব্বিপাক ঘটেনি। কেন, আমার চিরস্থায়ী 'বডিগার্ড' হতে কি আপনার আপত্তি আছে ?"

অসীম একটু সামলে নিলে। অন্ধকারে তার মুখের ভাবটা ঠিক বোঝা গেল না। এতখানি স্পষ্ট উত্তর সে প্রত্যাশা করেনি। খানিকটা চুপ করে থেকে সে বললে—

"—শুধু একটি মাত্র নারীর 'বডিগার্ড' হওয়ার চেয়ে একেবারে নারীরক্ষা সমিতির সভ্য হয়ে যাওয়া ভালো—তাতে দেশ হিতৈষণার পরিচয় দেওয়া হবে।—"

"—তবে সেই বাঞ্ছিত দিনের উদ্দেশ্যে এখন থেকেই আমরা মাল্যরচনা করতে বসি। কিন্তু দেখবেন শেষটা যেন বীরকণ্ঠে বরমাল্য দানের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই—

দুজনের সম্মিলিন উচ্চহাসির অন্তরালে কথাটা ওইখানেই চাপা পড়ে গেল।

অন্ধকারে তারা পাশাপাশি পথ চলেছে। মাথার তারাভরা অনন্ত আকাশ, ঊর্দ্ধশির তালীবন রেখা, মর্ম্মর মুখর নারিকেল কুঞ্জ, যেন আরব্য-রজনীর কাহিনীর মত রহস্যময়। যেন তারা দুটি তীর্থ পথিক, দিগন্তের সিন্ধু-পারের উপকূল দিয়ে যাত্রা তাদের অনন্তকালের।

"—আচ্ছা মৈমনসিং থেকে আসবার পর আমার কথা কোনদিন মনে হতো আপনার ?—" অসীমা এক সময় প্রশ্ন করলে।

"—আপনার ত বিশ্বাস, আমি আপনাকে ভুলে গেছলুম।" অসীম বললে।

'—যখন চিঠি পেলুম না, তখন সেই কথাই মনে হওয়া ত স্বাভাবিক। ফিরে এসে একচোট খুব নিন্দে করলেন ত আমার ? আপনার সেই ভৈরববাজারের বন্ধু, যাঁর বাড়ীতে শেষটা আর যাওয়াই ঘটে উঠলো না আপনার, তাঁকে কি বল্লেন ?'

"—তারপর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি।"

আবার সুরু হ'লো দুজনের মৌন পথচলা। অন্ধকারে অসীমাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তির মত তারা দুজন এগিয়ে চলেছে।

'—এ রাত যদি না ফুরোয়—' অসীমা মৃদু গলায় বললে।

"—তবে কি হয় ?" প্রশ্ন করলে অসীম।

"—শুধু এমনি দুজনে পথ চলতুম, অনন্তকাল।

"—আমার কিন্তু পায়ে ব্যথা ধরত, আর আপনাকে মাঝে মাঝে মালিশ করতে হতো টার্পিন তেল, সেটা কিন্তু বিশেষ সুবিধের হতো না।—"

"—যান, আপনার সব তাতেই ঠাট্টা—" অসীমা হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

"—আচ্ছা, আমাকে আপনি কি ভাবেন বলুন ত ?" কিছুক্ষণ পরে অসীমা আবার বললে।

"—কেন ? অত্যন্ত ভদ্র নম্র, শিক্ষিতা ও সুরসিকা, বাংলা-অভিধানের বাছা বাছা সমস্ত বিশেষণগুলি আপনাতে বর্ত্তমান—অর্থাৎ কিনা এক কথায়—

—আবার ঠাট্টা সুরু করলেন! না, বলুন না, সত্যি মিনতি মাখা সুরে অসীমা বললে।

"—আপাতদৃষ্টিতে আপনাকে নারীজাতি বলেই ত ভ্রম হয়।'

"—ফের—" কৃত্রিম কোপে অসীমা বললে।

'—অতএব নিরস্ত হলুম। বলুন এইবার।' অসীম গম্ভীর হয়ে বললে।

"—আমরা কেউ কারও আসল পরিচয় জানিনা—অথচ এরি মধ্যে এতখানি আলাপ, ভারি আশ্চর্য্য নয় ?

"—কিছুমাত্র না। সত্যিকারের বন্ধুত্ব ডিসেক্‌শানের জিনিষ নয়।—'

"—তবে আপনি আমায় ভালোবাসেন, বন্ধু বলে স্বীকার করেন ?"

অন্ধকারেও তার চোখ দুটো যেন অকস্মাৎ আনন্দের আতিশয্যে জ্বলে উঠলো। ঠোঁটের প্রান্তে ফুটে উঠেছে তার সাফল্যের সার্থক হাসি।

"—নিশ্চয়। শুধু বন্ধু নয়, প্রথমতম ও প্রধানতম বন্ধু। আমার জীবনের নিত্যচলার সাথী হবে তুমি অসীমা ?

অকস্মাৎ আবেগে কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে এলো। বাতাস

যেন নিস্পন্দ। সমস্ত আকাশে বেজে চলেছে সাহানা রাগিনী। শুধু সে আর অসীমা। যেন সৃষ্টির আদিম প্রভাতে, প্রথম বিস্ময় মুহূর্ত্তে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে তারা, পৃথিবীর আদিম তরুণ-তরুণী।

অসীম ভেবে পেলো না, কখন অসীমার হাতখানা তার মুঠোর ভেতর এসে পড়েছে, কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়েছে তার নুইয়ে পড়া পদ্মের মত মুখখানি।

অকস্মাৎ অদূরে কয়েকটি অপস্রিয়মান ছায়ামূর্ত্তি দেখে অসীম একটু তফাতে সরে এলো। সে বুঝতে পারলে, অন্ধকারের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে কয়েকটি পথচারী তরুণ তাদের পশ্চাদানুসরণ করেছে। ওদের লুব্ধদৃষ্টি তাদের মিলনের শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে আছে।

"—চল, ফেরা যাক্ এইবার—' অসীম বললে।

'—চল।—'

দুজনে আবার মোটরে গিয়ে বসলো।

"—এবার কোন দিকে ?—" অসীম প্রশ্ন করলে।

"—রাত ত অনেক হলো—" অসীমা মৃদুগলায় বললে।

"—কিন্তু আমার গৃহে আতিথ্যের প্রতিশ্রুতি ?—'

"—দশটার মধ্যে ফিরতে পারবো ত ?

"—নিশ্চয়।—'

ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেনশান ধরে মোটর ছুটে চললো পূর্ণগতিতে।

প্রকাণ্ড বাড়ী। আগাগোড়া মার্বেল পাথরে বাঁধানো। দেওয়ালের ছবিগুলো থেকে টিপয়ের ফুলদানি অবধি মেহগনি কাঠের টেবিল-চেয়ার থেকে গ্লাস আলমারি আর ড্রেসিং টেবিল, সোফা, আর দামী কার্পেট, চারিধারে ঐশ্বর্য্যের যেন এক বিরাট প্রদর্শনী। অসীমের ঐশ্বর্য্য যেন অসীমার কল্পনার সীমা অতিক্রম করে গেছে। এই অসীম এতখানি অগাধ ধনসঞ্চয় যার নিজের ভাগ্যকে সে চায় তারি সঙ্গে জড়িত করতে। শঙ্কায় তার বুক দুলে উঠছে, চোখের কোলে ঘনিয়ে আসছে তার নিরাশার কালো ছায়া। কোথায় পঞ্চাশটাকা মাইনের স্কুল শিক্ষয়িত্রী অসীমা, আর কোথায় কলকাতার ধন কুবেরের প্রসিদ্ধ হার্ডওয়ার মার্চেন্ট অসীম দেব। এ যেন মাটির শিশুর চাঁদ ধরবার দুরাশা। অসীমা বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক হয়ে গেছে।

বাড়ীর দ্বাররক্ষক এক নেপালী দারোয়ান ছাড়া অন্য ঝি-চাকরেরা সব নিরুদ্দেশ। অসীমের অনুপস্থিতির অবকাশে তারা একযোগে সকলে মিলে কোথায় অন্তর্দ্ধান করেছে। চাকর-বাকরদের শাসন সম্বন্ধে সে চিরকালই একটু আলগা ধরণের।

অসীম প্রত্যেকটি ঘরে আলো জ্বেলে, তার প্রাইভেট চেম্বার থেকে আরম্ভ করে কাউন্সিল রুম, হলঘর, ড্রয়িংরুম ভিজিটর্স রুম এমন কি বাথরুম পর্য্যন্ত, সমস্তই একে একে অসীমাকে দেখিয়ে দিলে। অসীমা নিঃশব্দে দেখে যেতে লাগলো, যেন সে ইন্দ্রপুরীর ঐশ্বর্য্য দেখছে।

প্রশস্ত বারান্দা পেরিয়ে তারা তেতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে চললো ওপরে। তেতলায় অসীমের শয়ন-কক্ষ।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে অসীম বললে—'এইখানে একটু বসো, আমি ততক্ষণ ঝি-চাকরগুলোর সন্ধান করি—ঠিক এই দিনেই তাদের দেখা নাই।—'

খাটের ওপর একটা অস্পষ্ট শায়িত মূর্ত্তি যেন হঠাৎ উঠে বসলো। অসীম অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখলে নারীমূর্ত্তি। সুইচটা টিপে দিতেই সে চমকে উঠলো —

"—একি, স্নিগ্ধা—তুমি ? তুমি এ সময়ে এখানে ?'

স্নিগ্ধা নিরুত্তর। তার বিস্মিত দৃষ্টি অসীমাকে কেন্দ্র করে আছে। অসীমা দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত। অসীম যদি ভালো করে লক্ষ্য করতো, তবে সে দেখতে পেতো, তীরবিদ্ধ বিহঙ্গের মত তার দুই চোখে লেগে রয়েছে যেন মৃত্যুর বিষণ্ণ ছায়া, মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে।

(ক্রমশঃ)



দেশের যত কিছু উন্নতির জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করে কংগ্রেস আজ হিমালয়ের মত সমুন্নত শির। মুসলিম লীগ নামধেয় এক অপোগণ্ড শিশুর সাধ হয়েছে এই কংগ্রেসের কাঁধে চেপে বসবার।

বেচারার 'দাবীর' ফিরিস্তি দেখে হেসে আর বাঁচি না।

*　　*

যুক্ত-প্রদেশের স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী (কংগ্রেসী) শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলেছেন যে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অনুষ্ঠিত অবিচারের একটু প্রতিকার বা কয়েকটা আইনের পরিবর্তন করতে পারলেই বিশেষ কিছু করা হল না। জাতির প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার কিছু প্রতিকার করার সাধ্য নতুন ভারতশাসন আইনের আওতায় থেকে কংগ্রেস মন্ত্রীদের নেই।''' কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণের যুক্তি সম্বন্ধে তাঁর যে সন্দেহ ছিল এখন তা আরো দৃঢ় হয়েছে।

তবে আর কেন মায়া বাড়ানো ?

*　　*

সমাজতন্ত্রী নেতা মিঃ বাটলিওয়ালা বলেছেন যে বর্ত্তমানে দেশের যুবকদের অবস্থা শোচনীয় ; অর্থনৈতিক ও রাজ-নৈতিক দাসত্ব থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্যে তাঁরা উৎসুক কিন্তু সামনে জঙ্গল পাথর !

এই জন্যে তিনি 'দাবী'রূপ ১০টী 'বারবেল' নিয়ে 'আন্দোলন' করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

*　　*

মিঃ জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালী করবার যে কতকগুলি 'সর্ত্ত' দিয়েছেন তার মধ্যে টিকি ও দাড়ী সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই দেখে আমরা বেশ বিস্ময় বোধ করছি।

তবুও মিঞাসাহেবের এই উদারতার জন্যে ধন্যবাদ।

ই-আই-আর লাইনে এমন ঘন ঘন ট্রেন দুর্ঘটনায় যাত্রী মহলে বেশ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ৭ই জুন রাত্রি এগারোটায় মধুপুর থেকে কিছু দূরে মথুরাপুর নামক এক ফ্ল্যাগ ষ্টেশনের কাছে পাঞ্জাব মেল লাইনচ্যুত হয়। অনেক লোক হতাহত হয়েছে। ইঞ্জিনখানি লাইনের পাশের মাঠে পড়ে মাটির মধ্যে অর্দ্ধেক বসে গিয়েছিল। বেচারা ড্রাইভারকে মাটি কেটে পা দুখানি বাদ দিয়ে দেহের অবশিষ্ট অংশ বার করতে হয়েছিল।

অতঃপর 'উইল' করে, শ্রাদ্ধ শান্তি চুকিয়ে তবে ই-আই-আর লাইনের যাত্রী হওয়া যাবে।

*　　*

পুলিশী অভদ্রতা আমাদের দেশে সর্বজন বিদিত। সম্প্রতি সিন্ধু ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সদস্য পুলিশকে ভদ্রতা শিক্ষা দেবার এক বিদ্যালয় চালাবার জন্যে সরকারে এক প্রস্তাব পেশ করেছিলেন।

এর জন্যে বিলাতী 'বিশেষজ্ঞ' আমদানি করতে হবে হয়ত !

*　　*

অধুনা বাঙ্গালীর ছেলেরা আই-সি-এস পরীক্ষায় হটে যাচ্ছে কেন—এ সম্বন্ধে গবেষণা করে কর্তারা জানিয়েছেন যে এই পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যে যে রকমভাবে তালিম বা কোচিং দিতে হয় আমাদের বাছাদের সেটা জোটে না।

আই-সি এস'গণ অবসর সময়ে প্রাইভেট টিউটরী করেন না !

*　　*

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের ডিরেক্টর তাঁর বাৎসরিক রিপোর্টে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের অবস্থা ও বেকার সমস্যা সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান সংবাদ প্রকাশ করেছেন। এর থেকে জানা যায় যে আন্তর্জাতিক আর্থিক দুর্গতি এখন আগেকার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে—কিন্তু

বেকার সমস্যা এখনও প্রবল। পৃথিবীর নানা দেশে বেকারের সংখ্যা এখন শতকরা ৯ থেকে ২১ পর্য্যন্ত। কিন্তু এর মধ্যে ভারতবর্ষের নামোল্লেখ নাই।

দেশীয় সংবাদ পত্রের মতে আমরা শতকরা আশীর কম নই।

*　　　*

কানপুরের মিল্ অঞ্চলের শ্রমিকরা মাসাধিককাল হল কতকগুল 'ন্যায় সঙ্গত' দাবী' মঞ্জুরী সপেক্ষ ধর্ম্মঘট করেছে। যুক্ত প্রদেশের সরকার এ সম্বন্ধে তদন্ত করে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে শ্রমিকরা সন্তোষ প্রকাশ করলেও ধনিকরা খুঁৎ খুঁৎ করছে। বোম্বাই তাঁতীরা মাসিক ৪১৲ থেকে ৫৪৲ টাকা বেতন পায়, কানপুরী তাঁতীরা পায় ৩৩৲। পাঞ্জাব, দিল্লী, বাঙ্গলার তাঁতীরাও এত কম বেতন পায় না। তারা দিন হিসাবের পরিবর্ত্তে মাস হিসেবে বেতন, এবং বেতনসহ ২৫ দিনের ছুটি চায়।

মানুষের দাবী।

*　　　*

বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী মিঃ খের এক বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহের উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছেন যে এখনও শতকরা ৫ বা ১০ ভাগ স্বরাজ পাওয়া যায়নি, নিজেদের অভাব অভিযোগ দুর করবার ক্ষমতা লাভের জন্যে অক্লান্তভাবে সংগ্রাম চালাতে হবে। অনেক কাজ করবার সঙ্কল্প থাকা সত্ত্বেও কোনও কিছু করবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আমরা নাড়ুগোপাল মাত্র।

*　　　*

ভারতবর্ষের কাপড়ের মিলগুলিতে প্রায় দশ হাজার টন তুলা অপচয় হয়। ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল কটন কমিটি এই তুলা সংগ্রহ করে এসেটিক এসিডে মিশিয়ে সেলুলোজ তৈরী করে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করার চেষ্টা করছেন। ওদিকে ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটুইট অব্ টেকনোলজীতে ঝোলা গুড় থেকে এসিটিক এসিড তৈরীর পরীক্ষা চলছে।

কৃত্রিমতার জয়-যাত্রা আজ দিকে দিকে।

*　　　*

'চীন দিবস' উপলক্ষে আহুত এক সভায় জনৈক বক্তা বলেছিলেন, 'ভারত আজ বিপন্ন চীনের সাহায্য কল্পে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে মেডিক্যাল মেশন পাঠাচ্ছে; কিন্তু ভারতে যদি আজ কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে তার পরিবর্ত্তে ৩০ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য পাঠিয়ে চীনকে সাহায্য করত।'

স্পেনে জার্ম্মানীও ইতালীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তবে এত নিন্দাবাদ কেন?

*　　　*

হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের জজ ৺পণ্ডিত কেশব রাও কর্ত্তৃক উত্থাপিত হিন্দু বিধবা বিবাহ বিল ৮ বৎসর পরে নিজামের সম্মতি লাভ করে আইনে পরিণত হয়েছে। এই বিলে ছয়টি ধারা আছে। একটি ধারা এই যে ষোল বছরের কম বয়স্কা কোনও বিধবা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না বা পুনরায় তার বিবাহ দেওয়া যাবে না।

সমাজের একটা অবহেলিত অংশ এইরূপে মর্য্যাদা লাভ করুক।

*　　　*

আইরিশ গভর্ণমেণ্টের জনৈক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি ইঙ্গ-আইরিশ চুক্তি সম্পর্কে একটি বক্তৃতায় বলেছেন, 'ডি-ভ্যালেরার গভর্ণমেণ্ট এই চুক্তিতে সবদিক দিয়েই জয়লাভ করেছে, এবং জন্ বুলকে বামে, দক্ষিণে ও মধ্যস্থলে সর্ব্বস্থানে চাবুক মেরেছে, এবং ভগবানের কৃপা হলে আমরা আবার ঐ রকম করতে পারব।'

অনেকে 'ছিঃ ছিঃ চুপ চুপ' করলেও সোজা কথায় খুসীই হয়েছেন।

*　　　*

পূর্ব্বে গায়ে একটু ধুলা লাগলে যে ইংরাজ 'প্রেষ্টিজ গেল' বলে মার-মূর্ত্তি হয়ে উঠত আধুনা সে ইংরাজের মৃত্যু ঘটেছে। জাপানে, স্পেনে, মেকসিকোয় বেধরক চড়-চাপড় মেরেও সে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করছে না—উল্টে পিছু হটে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসছে।

'গান্ধিজী' এর আফিস ধরা হয়েছে?



পরিচালক—বনবাণী

বাঙ্গলা সবাকচিত্র বিজ্ঞানের দিক দিয়ে টেকনিকের দিক দিয়ে অনেক উন্নতি করেছে এবং ক্রমশঃ আরও উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে। কিন্তু সাহিত্যিকের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে বলতে হয় বর্ত্তমানের সবাক চিত্রগুলির ভেতর কোনও উচ্চ তত্ত্ব বা সত্যকার রসবস্তুর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। হালকা ঠুনকো বিষয় বস্তু নিয়ে এখনও সবাক চিত্র ওয়ালারা কারবার চালাচ্ছেন। এখনও বাঙ্গলা সবাকচিত্র মালিকদের আর্থিক দুর্দ্দশা কমেনি শুধু এই কারণে।

*

মানুষের জীবনে প্রতিদিন ছোট খাটো সুখ দুঃখের যে আলোড়ন চলছে, তার ভেতর থেকেই শিল্পী খুঁজে বের করে একটী বিরাট তত্ত্ব। শিল্পীদৃষ্টিতে আবিষ্কৃত সেই বিরাট তত্ত্বের উপরই ভিত্তি করে আছে মানব জীবনের উঠা-নামা।—শিল্পী তার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে দেখিয়ে দিল আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের এমন সব জিনিষ যা আমরা দেখেও দেখিনি জেনেও ঠিক সঠিকভাবে জানতে পারিনি। সেগুলিকে জানিয়ে দেওয়াই শিল্পীর কাজ।

*

নিখিল মানব মনের যে সন্ধান লেখক তার গ্রন্থে চিত্রিত করবেন, চিত্র পরিচালককে তাহার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। গ্রন্থলেখক ও চিত্র পরিচালক উভয়েই যদি রসবস্তুর সমসন্ধানী হন তবেই তাঁদের চিত্র আমাদের মনের নব নব খোরাক যোগাতে পারবে। আবার আমাদের দেশের উন্নত রুচি ফিরে আসবে। বাজে সেক্স এ্যাপীলে তারা ভুলবে না।

“অর্চ্চনা”র পক্ষ হতে আমি সর্ব্ব সাধারণের কাছ থেকে এই বিভাগের জন্য আলোচনামূলক রচনা আহ্বান করেছিলাম। এসে অনেক লেখা পৌঁছলেও নানান কারণে তার মধ্যে অনেকগুলি রচনা প্রকাশের অযোগ্য হয়েছে। আমরা চিত্রওয়ালাদের বা বর্ত্তমান সবাকচিত্রের বিরুদ্ধে নিছক গালি-গালাজ চাইনি, চেয়েছিলুম সুচিন্তিত আলোচনা। এই কথা যেন তাঁরা মনে রাখেন। মনোনীত রচনাগুলি আগামী সংখ্যা হতে প্রকাশিত হবে। বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন পণ্ডিত লিখিত “ছেলেমেয়েদের উপযোগী চিত্র” নামক একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল।

*

সর্ব্বশেষে একটী আনন্দের খবর দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো।

“অর্চ্চনা”র বিশিষ্ট লেখক ও শুভাকাঙ্খী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রভাত কিরণ বসু লিখিত “অপরাধী” নামক গল্পটী রাধাফিল্ম কোম্পানী চিত্রে রূপান্তরিত করছেন। গল্পটী গত শারদীয়া সংখ্যায় “অর্চ্চনা”য় প্রকাশিত হইবার পর বহু বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বহু পূর্ব্বে প্রভাতকিরণবাবু সুকবি ও সুনিপুণ সরস গল্প-লেখক বলে সুনাম অর্জ্জন করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, সকলেই একটী উপভোগ্য সরস গল্প চিত্রে অভিনীত দেখবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠবেন।—চিত্রটী পরিচালনা করছেন তরুণ পরিচালক শ্রীযুক্ত জানকী ভট্টাচার্য্য এবং সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত দেবরঞ্জন পণ্ডিত। উপরোক্ত গুণী শিল্পীদ্বয়ের পরিচালনায় চিত্রটী যে বিশেষ উপভোগ্য হয়ে উঠবে এ আশা আমরা অবশ্যই করতে পারি। বনবাণী—

ছেলেমেয়েদের উপযোগী চিত্র

চলচ্চিত্রের সাহায্যে শিক্ষাবিস্তার করায় বিশেষ সুবিধে আছে। কি ভাবে সেটা করা যায় এ বিষয়েও আমাদের দেশের চিন্তাশীলদের ভেবে দেখা দরকার।—অবশ্য এ বিষয় নিয়ে এর আগে কিছু আলোচনা অনেকে করে গেছেন। কিন্তু ঠিক কর্ম্মপদ্ধতির অভাবে বোধ হয় এখনও কার্য্যকরী হয়ে ওঠেনি। আর আমার মনে হয় আজও এ বিষয় নিয়ে তেমন সুচিন্তিত আলোচনা হয়নি।

আমাদের দেশে কোলের কচি খোকাখুকী থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত সিনেমা দেখতে যান। বৃদ্ধরা বলেন, তাঁরা নাকি প্রায় ধর্ম্মমূলক চিত্র ছাড়া অন্য চিত্র দেখেন না। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য যে বর্ত্তমান ধর্ম্মমূলক চিত্রে ভক্তিরস কতটুকু থাকে। সম্ভাদরের সেক্সএ্যাপীলের চাপে ওই সকল চিত্রে ভক্তিরসের পরিবর্ত্তে খেলো আদিরসটাই ফুটে উঠে বেশী। এ কথার উত্তরে চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকগণ বলবেন যে, সেক্সএ্যাপীল না দিলে বই জমে না আর পয়সাও পাওয়া যায় না বেশী। একথার উত্তরে আর একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়। সেইজন্যে ও কথার আলোচনা পরে করা যাবে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আমার বিষয় বস্তু হচ্ছে, ছোট সুকুমারমতি বালক বালিকাদের বর্ত্তমান বাজার চলতি চিত্র দেখতে না দিয়ে এমন চিত্র তাদের জন্যে নির্ম্মান করা দরকার, যাতে তাদের কুশিক্ষা থেকে বাঁচিয়ে সুশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

অনেক অভিভাবক আমার কথায় বলবেন, সিনেমা যেতে গেলে ছেলেপুলেদের বাড়ীতে রেখে যাওয়া চলতেই পারে না। নিয়ে যেতেই হয়। অথচ সিনেমায় কোনও চিত্রে নায়ক নায়িকাকে যখন আলিঙ্গন করে চুম্বন করছে, তখন অনেক মা তাঁর পাশের ছোট মেয়েটীর কথা স্মরণ করে বিশেষ লজ্জিতা হন। পিতাও তাঁর পাশের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেটীর কথা ভেবে ওই দৃশ্যে বিশেষ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেন। ছোট ছেলে-মেয়েরা অপ্রাপ্ত বয়সে সিনেমা থেকে যে সব জিনিষ শিখে আসে, তাতে আমাদের সমাজ যে দিন দিন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, একথা সকলে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। আমরা 'কি করবো উপায় নেই' বলে চুপ করে বসে আছি। চলচ্চিত্রের জন্মদাতা ইয়োরোপ কিন্তু চুপ করে বসে থাকেনি। সেখানকার প্রায় প্রতি দেশেই ছোট ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাঁরা ওই সব সুকুমার মতিদের জন্যে আলাদা চলচ্চিত্র নির্ম্মান করে, তাদের আলাদা চিত্রগৃহে দেখিয়ে আসছেন। এ বিষয়ে প্রথম পথ পরিদর্শন করেছিলেন রাশিয়া।—

আমাদের দেশেও ছোট ছেলেমেয়েদের মঙ্গলের জন্যে ইয়োরোপের আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। চিত্র নির্ম্মাতারা হয়তো আমার কথায় বলবেন, সাধারণ চিত্রে যা অল্প পয়সা আসছে তার উপর আবার ছেলেদের জন্যে আলাদা বই তুললে তো ছবিওয়ালাদের অনাহারেই মরতে হবে।—

চিত্র নির্ম্মাতাদের এ কথা আমাদের অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের শিশু-অবস্থা অতিক্রম হলেও এখনও বাল্যাবস্থা পার হয়নি। হলিউডের তুলনায় এদেশের ছবিওয়ালাদের অত্যন্ত অল্প টাকায় ছবি তুলতে হচ্ছে। সেই ছবি বিক্রয়ের টাকায় আর একখানা ছবি তুলতে হয়। এমনি যাঁদের অবস্থা তাঁদের পক্ষে ছেলেদের ছবি তুলতে যাওয়া যে একটা বিষম risk, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। সেইজন্যে এ বিষয়ে যদি আমাদের দেশের অভিভাবকরা এবং বিশেষ করে শিক্ষাবিভাগ এ বিষয়ে ফিল্মব্যবসায়ীদের সহিত সহযোগীতা করবার জন্যে সচেষ্ট হন, তাহলে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা কালে একজন মানুষ হতে পারবে।

কোনও ছেলে বা মেয়ে আমার উপর রুষ্ট হয়ে বলবে,—সমস্তদিন পড়া শোনা করার পরে আবার বায়স্কোপে গিয়ে পড়াশোনা করতে হবে? একটু আমোদ করবো না আমরা।"—একথারও উত্তর আছে।

সিনেমার ছবি দেখে তারা আনন্দ পাবে আর সেই সঙ্গে শিক্ষাও পাবে এমন ছবি তৈরী করা বিশেষ শক্ত নয়। নীউজ রীল, কোনও দুঃসাহসিক জীবনের মহান্ কাহিনী, রামায়ণ মহাভারতের ছেলেদের উপযোগী ঘটনা, চিত্রে রূপান্তরিত করলে ছেলেদের পক্ষে আনন্দের ও কল্যাণের কারণ হয়।—

নীউস্ রীল—যা আমরা সিনেমায় এখন দেখে থাকি, তাতে ছেলেরা বহু দেশ বিদেশের শিক্ষাকর ঘটনা জানতে পারে। দুঃসাহসিক কাহিনী চিত্রে দেখলে ছেলে-মেয়েদের মন দৃঢ় হবে, তারা সাহসী হয়ে সত্যকার মানুষ হবে।

রামায়ণ, মহাভারতের ঘটনা সকলের কাছে উপভোগ্য চির নূতন কাহিনী,—চিত্রে ওই ঘটনা দেখে ছেলেরা শিখবে ধর্ম্মের জয় আর অধর্ম্মের পরাজয়। সত্যাশ্রয়ী মানুষ চিরকাল সুখী হয়। অসত্য মানুষকে চিরকাল ধ্বংসই করে আসছে সব দিক দিয়ে।

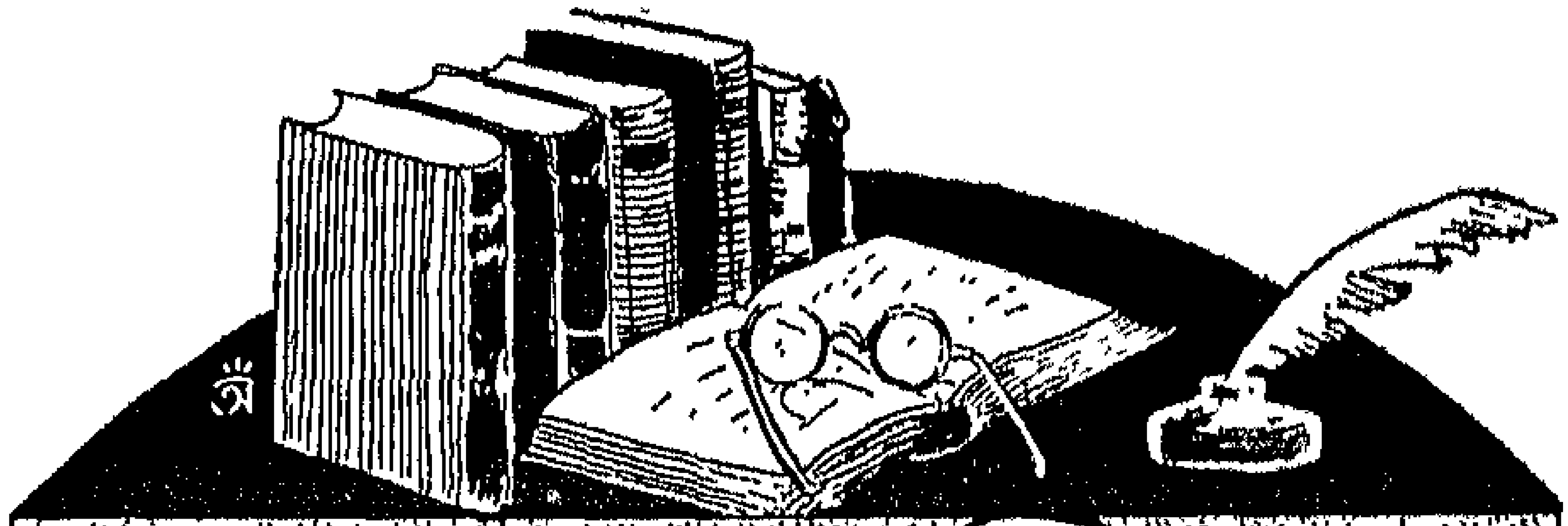
শিক্ষাবিভাগের আর্থিক ও কায়িক সাহায্যে চিত্রনির্ম্মাতারা এই সকল ছবি তোলার জন্য যদি ব্যবস্থা করেন তাহলে দেশের বড় উপকার হয়। আশাকরি এ কথা তাঁরা বিশেষ ভাবে ভেবে দেখবেন।

সহরের চিত্র গৃহগুলি সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ শনিবারের একটা শো নির্দ্দিষ্ট রাখবেন ছেলেদের উপযোগী চিত্র দেখানোর জন্যে, আর অভিভাবকরাও শুধু ওই নির্দ্দিষ্ট শো'তে ছেলেদের সিনেমা দেখানোয় সচেষ্ট থাকবেন।—

ফিল্ম ষ্টুডিওর কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রথমে শিক্ষাবিভাগের অর্থসাহায্যে পুষ্ট হয়ে ছেলেদের উপযোগী বই তুলবেন। পরে তাঁদের আর অর্থসাহায্যের প্রয়োজন হবে না, এ বিশ্বাস আমি অবশ্যই করতে পারি।

আমার প্রস্তাবিত বিষয়টা যদি দেশের অভিভাবকগণ ও শিক্ষাবিভাগ একটু ভেবে দেখেন তাহলে কৃতার্থ হব।

শ্রীসারদা রঞ্জন পণ্ডিত



সম্পাদকীয়

এবার কংগ্রেসকে বিশেষ উদ্‌গ্রীব দেখা যাচ্ছে মুস্‌লিম্ লীগের সাথে একটি বোঝাপড়া করবার জন্য। কোন একটা সমস্যাকে সূক্ষ্মভাবে বুদ্ধি চালনা করে বিচার করার মত ধৈর্য্যের এবং শক্তির কংগ্রেসের যে একান্ত অভাব তা 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের দেহচ্ছেদের সময়ই দেখা গিয়েছে। বন্দেমাতরমের সময় কংগ্রেস্ পাণ্ডাগণ যেরূপ অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন এবারও তাঁরা সে পথেই পা অগ্রসর করছেন।

বন্দেমাতরম্ নিধনের সময় তাঁরা মুষ্টিমেয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানের অন্যায় ধমকীতে বিচলিত হ'য়ে যে গর্হিত অপকর্ম্ম ক'রেছেন তাতে তাঁরা জগতের কাছে শিশু রাজনীতিক ব'লেই অভিষিক্ত হ'য়েছেন। সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব, মুস্‌লিম গান্ধী আব্দুল গফুর খান এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুস্‌লিম নেতৃগণ স্পষ্টই ব'লেছেনঃ মুসলমান কখনও 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের উচ্ছেদ বাসনা করে না। বিশেষ ক'রে—যে সঙ্গীত সুদীর্ঘ ৩০ বছর কাল জনগণের মনে দেশ প্রীতির প্রেরণা সংগ্রহ ক'রেছে তাকে কয়েকজন দেশদ্রোহী দুষ্ট মুসলমানের গোটাকয় ঝাপটা কথায় নিস্তেজ করার কি স্বার্থকতা আছে তা আমাদের জ্ঞানে অগম্য।

অর্চ্চনার ৩৪ বর্ষের দশম সংখ্যায় 'বাঙলার রাজনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে এবং ৩৫ বর্ষের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় আলোচনায় আমরা বন্দেমাতরমের অঙ্গচ্ছেদ এবং বঙ্কিম চন্দ্রের বন্দেমাতরমকে নির্ব্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থাকে লীগপন্থী মুসলমানদের মনরক্ষার কাজ না ব'লে এ অবকাশে বাঙলার ওপর গান্ধী রাজেন্দ্রপ্রসাদের চিরশত্রুতার সুযোগ গ্রহণ করা হ'য়েছে ব'লে অভিমত দিয়েছিলাম। আমাদের সে কথা যে ধ্রুব তা সুভাষ-জিন্নার আলোচনার ব্যবস্থাই বোঝা যায়। পাঞ্জাব ও বাঙলা কোন দিনই গান্ধীর সুদৃষ্টি লাভ করেনি—কারণ তাঁরা বীর্য্যবান, গান্ধী ভক্ত প্রদেশের মত ক্লিব নয়। যেহেতু তাঁরা গান্ধীর কর্ম্ম পন্থাকে নির্ব্বিচারে বরণ করেনি, সেহেতু 'মহাত্মা' গান্ধীকে হ'তে হ'য়েছে এদের বৈরী। প্রকাশ্যে কিছু বলা চলে না, তাতে উপস্থিত সম্মান হানী হয়;—কলে-কৌশলে এর প্রতিশোধ নিতে হবে। বাঙলা-পাঞ্জাব মুসলমান প্রধান প্রদেশ, এই দু'প্রদেশের শক্তিকে কাবু ক'রতে হবে মুস্‌লিম্ লীগের দাবীর ওপর ভিত্তি স্থাপন করে। কৌশলী বটে!

আমাদের এ বক্তব্য যদি ভাবুকের কল্পনামাত্র হয় তবে কংগ্রেস অদূরদর্শি। কেননা বন্দেমাতরমকে তাঁরা দাঙ্গায় বিদাস্থ হ'য়ে নষ্ট করেছেন। এবারও কলকাতায় জিন্নাহর কয়েকটী গরম কথায় সন্ত্রস্থ হ'য়ে লীগের সাথে চুক্তির ব্যবস্থার প্রয়াসী হ'য়েছেন। চুক্তি ক'রে সাম্প্রদায়িকতার মীমাংসা হয় না, তাতে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের লোভ উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। বিশেষ ক'রে এ ব্যাপারে কংগ্রেসের গরজটাই ব্যাপক দেখা যায়; জিন্নাহর কাছে তাঁদের দাবীই আগে পেশ হ'য়েছে। জিন্নাহ এখন বিচার ক'রে দেখবেন 'অসীম শক্তিশালী' কংগ্রেসকে কি দেওয়া যায়, তাঁদের কথায় সম্মত হওয়া চলে কিনা।

এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। 'গায়ে মানেনা আপনি মোড়ল' হ'তে গেলে এমনই হয়। অধিকন্তু আমরা আশ্চর্য্য না হ'লেও রীতিমত বিস্মিত হ'য়েছি সুভাষচন্দ্রকে কলের পুতুলের মত এ ব্যাপারে যোতা হ'তে দেখে। যে সুভাষ চন্দ্র একদিন বাটোয়ারা এবং সাম্প্রদায়িকতার শ্রেষ্ঠ বিদ্বেষী ছিলেন কংগ্রেস সভাপতিত্বের মায়া-লোভ গান্ধীর টানিতে যে সুভাষীকে ক'রেছে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন; আজ বীর সুভাষ চন্দ্র সত্তাহীন; গান্ধীর কণ্ঠস্বর মাত্র। সুভাষচন্দ্রকে নিষ্কৃতি

রেখে গান্ধী উন্মুখ ক'রে নিচ্ছেন নিজের কার্য্য। যাতে ভবিষ্যতে বাঙালী তাঁকে দোষতে না পারে।

*　　　*

সম্ভবতঃ জিন্নাহ তার মতামত জানাবেন জুন মাসের নয় তারিখে। এরই ভেতর লীগের মুখপাত্রদের মুখ থেকে যেরূপ কাণা-ঘুষা শোনা যাচ্ছে তাতে কংগ্রেসের শোচনীয় অপদস্থতায় কংগ্রেস প্রিয় এবং দেশ প্রেমিকগণ দস্তুরমত মর্ম্মাহত হয়ে পড়েছেন।

শোনা যায় জিন্নাহ্ আপোষের সত্তাবলী লিখিত ভাবে কংগ্রেসের কাছে উপস্থিত ক'রবেন না। যদি তা করেন তবে চৌদ্দ দফার মত হয়তো তাঁকে ভবিষ্যতে পুনবায় বিবর্দ্ধমান আশার উগ্রতায় জনসাধারণের কাছে, নাজেহাল হওয়া বিচিত্র নয়. রাজেন্দ্রপ্রসাদের সর্ত্তের মত তিনি এবারও আল-গোছে নিরিবিলি থেকে কাউটিষ্ট স্পৃহাকে রূপ দিতে চান। এই ক্রমবর্দ্ধন লোভস্পৃহা জাতিকে সংহতির পথ হ'তে সরিয়ে নেয় আবর্ত্তের ভেতর; দেশকে করে বিষবাষ্পে পূর্ণ।

একখানা সংবাদপত্রে প্রকাশঃ জিন্নাহ্ কেবল যে তাঁর দাবী লিখে দিতে অস্বীকার করেছেন তা নয়, মীমাংসা নামার উপক্রমনিকা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ ক'রতে হবে। তাতে বলা হবে হিন্দুদিগের পক্ষে কংগ্রেস মুসলমানদের প্রতিনিধি মুসলিম লীগের সাথে এ চুক্তি করছেঃ কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী ভেঙ্গে দিয়ে নূতন করে গঠন করবে এবং লীগ যে সব মুসলমানকে মনোনীত করবেন তাঁদের ঐ মন্ত্রিমণ্ডলে মুস্‌লিম মন্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ কংগ্রেসকে স্পষ্ট কথায় ব'লতে হবে: কংগ্রেস হিন্দুর প্রতিষ্ঠান এবং যে সব মুসলমান কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন তাঁরাও মুসলমান নন। আশ্চর্য্য, এর পরেও এক বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্র বলেছেন, তিনি আশান্বিত।

বিশেষ পরিতাপের বিষয়ঃ জিন্নাহ্ লিখিতে অস্বীকৃত হ'লেও কংগ্রেস তাঁদের কথা লিখে দিয়েছেন। জিন্নাহ যেমন ব'লেছেনঃ মুস্‌লিম লীগের তুষ্টি সাধনের জন্য কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলকে ভেঙে নূতন ক'রে গ'ড়ে তাতে লীগের সভ্য গ্রহণ ক'রতে হবে; তেমনি বোধ হয় বাঙলার পক্ষ্য হতে ব'লবার আবশ্যকীয় সময় এসেছে : কংগ্রেসের working committeeকে reform ক'রে তাতে হিন্দু মহাসভার জন কয়েককে member মনোনীত ক'রতে হবে। উভয় প্রস্তাবই সমান যুক্তিযুক্ত। এরপরে কংগ্রেসের পক্ষ্য হ'তে এমন কথাও বলা হয়েছে: কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল ভেঙে দিতে অসম্মত হ'লেও মন্ত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে লীগের মনোনীত ব্যক্তিদের গ্রহণ ক'রতে সম্মত হতে পারেন।

একথা যদি সত্য হয় তবে এ হ'তে বিস্ময়কর অনুশোচনার বিষয় আর কি হ'তে পারে? কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর না ক'রলেও কংগ্রেস কি ক'রে লীগ-সভ্যদের মন্ত্রিগোষ্ঠিতে বরণ করতে পারেন তা আমাদের উপলব্ধির সুদূরে। গান্ধীর কংগ্রেস কি মনে করেন: মন্ত্রিত্বলাভ করবার বিনিময়ে ঐরূপ লোক অনায়াসে কংগ্রেসী প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর দান ক'রবেন? যদি তাঁরা তা মনে করেন তবে সেরূপ স্বাক্ষরের মূল্য যে অর্থহীন তা বাঙলার সত্যেন মিত্রের কাজেই প্রমাণিত হ'য়েছে। আর কেন আহাম্মক হওয়া?

এলাহাবাদের সংবাদে দেখা যায়: কংগ্রেস যদি এসব দাবী রক্ষা করতে সম্মত হন তাতেও চ'লবেনা, মুসলমানদের সম্বন্ধীয় যে কোন ব্যাপার কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের মারফত মুসলমান সম্প্রদায়ের মত জানতে হবে। এতে যে কংগ্রেসকে ভারতের সর্ব্বজাতীয় প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান ব'লবার অধিকার ত্যাগ ক'রতে হবে তা প্রকাশ করাটাই বাহুল্য। কংগ্রেসের এ আত্মহত্যা!

মুসলমানদের বিশেষ অধিকার ব'লতে এখন দাম্ভিক রোয়েদাদ বোঝায়। যতদিন এ রোয়েদাদ থাকবে ততো দিন এর বিষ জাতীয় জীবনের গতি নষ্ট ক'রবেই। যা জাতীয়তা বিরোধী তা জাতির শত্রু বরদাস্ত করাই অপরাধ। যদি কেহ মনে করেন: বর্ত্তমানে এটা স্বীকার ক'রে নিয়ে রাজনীতির অগ্রগতির পথ পরিষ্কৃত ক'রলে ভবিষ্যতে দু' সম্প্রদায়ের সম্মতিক্রমে বর্জ্জন করা যাবে, তবে তাঁর ঐতিহাসিক জ্ঞান নিতান্ত অল্প ব'লে আমাদের বিশ্বাস। যে লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে প্রথম বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হয় তার প্রবর্ত্তন কালেও মুসলমানদের পক্ষ হ'তে বলা হ'য়েছিলঃ এ অস্থায়ী, জাতীয়তার জয়-যাত্রার সাথে পরিত্যক্ত হবে। কিন্তু তা না হ'য়ে এ দুষ্ট ব্যবস্থা দৃঢ় হ'য়ে ক্রমশঃ বিস্তৃত হ'চ্ছে।

সর্ব্বশেষে বাংলার কংগ্রেসীদের কাছে আমাদের বক্তব্য তাঁরা যেন ভবিষ্যতের আলেয়ায় বিমুগ্ধ না হ'য়ে নিজের অধিকারের প্রতিষ্ঠায় থাকেন; জাতির কর্ত্তব্য ব'লে অন্তরের উৎস হ'তে যে প্রেরণা আসে তা পালন করতে প্রচেষ্টিত হন—লীগপন্থী মুসলমানদের জন্য তাঁদের ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই। জাতির জয়-যাত্রায় বাধা দেবার সামর্থ লীগপন্থীদের নেই একথা যেন তাঁরা বাগবিহারী বসু, ঋষিদেব রায়, বিনায়ক দামোদর সাভারকারের বিশ্লেষণ হ'তে অন্তরস্থ করেন। কংগ্রেস যদি লীগকে অবজ্ঞা ক'রে নির্দিষ্ট পথে বিজয় যাত্রা সুরু করে, তা হ'লে লীগ হয় নত হ'য়ে কংগ্রেসে যোগদান ক'রবে, নয় তার পদতলে পিষ্ট হ'য়ে নিশ্চিহ্ন হবে।

অর্চনা

৩৫ বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৪৫ | ৯ম সংখ্যা

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান্

—শ্রীজ্যোৎস্না নাথ চন্দ এম-এ, বি-এল্

ওয়াল্ট হুইটম্যান্ সেদিন বইয়ের তাক্‌গুলোর ভেতর থেকে আমাকে অকস্মাৎ ইসারা করলেন। তাঁর Leaves of the Grass খানা নিঃসাড়ে টেনে নিলুম। পড়তে পড়তে মনে হল আমার অজানতেই আমি যেন নয়া ইয়াঙ্কির মনোরাজ্যে সেঁধিয়ে গেছি; বাইরের জগতের দিকে চেয়ে দেখি আমার চোখদুটোর কালো রঙ বদ্‌লে গিয়ে a flicker of blue এসে সেখানে বাসা বেঁধেছে। ভাবলুম এশিয়ার স্নিগ্ধ শস্য শ্যামল ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে এ আর একটা দুনিয়ায় এসে পড়ছি যেখানে হাতুড়ীর ঠকাঠকে জেগে ওঠে পিয়ানোর সুর আর মোটরের ষ্টিয়ারিং হুইলের স্পর্শে বেজে যায় চুড়ির রিণিঝিনি। ওয়াল্ট হুইটম্যান্ এই ক্ষমতাটীতে অদ্বিতীয়—তিনি যা লেখেন তার মধ্যে প্রাণ প্রতিনিয়ত থম্‌থম্ করছে; পড়লেই মনে হবে এমন একটা শক্তি এসে মনের আস্তানার বয়লারে বল যোগাচ্ছে যার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আপনার কোন পরিচয়ই ছিল না। খুব বেশী লোকের কাছ থেকে এ গুণটীকে প্রত্যাশা করা যায় না। যুগে যুগে এই পৃথিবীর প্রাণের প্রাঙ্গনে কত কবিই তো তাদের ছন্দ-লক্ষ্মীর নৃত্য দেখিয়েছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে ক'জনাকে আমরা একেবারে সমস্ত অন্তর দিয়ে আপনার করে গ্রহণ করতে পেরেছি! দান্তে, বোকাটচো, পেত্রার্কা—এঁদের কথা মনে পড়ে। সে যুগের য়ুরোপ ইতালীর কাছ থেকে প্রাণ ধার করে, সুর ধার করে কোনরকমে বেঁচেছিলেন মাত্র। চসারের সুরে মনে হয় বড় বেশী করেই যেন ইতালীর ঋণের স্পর্শ পাচ্ছি, ওয়াট আর সারের সনেটে মৌলিকতা নেই, আছে intensity. যদি সনেট-সাহিত্যে এঁদের দু'জনার কোন সত্যিকারের পরিচয়-পত্র লেখা হয় তো আমার মতে এই intensityই বিশেষ করে তাঁদের সম্মানাস্পদ করে তুলবে। এইদিক দিয়ে দেখতে গেলে বলতে হয় যে হুইটম্যান্‌কে পড়া মানে তার সঙ্গে দু'দণ্ডেই আত্মীয়তা পাতিয়ে বসানো। হুইটম্যান ধরণী পরিস্থিতে তরুণ আমেরিকার ambassador!

আমেরিকার ইতিহাস তার কাল্‌চারের back-groundটীকে নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

ওয়াল্ট হুইটম্যান্‌কে পড়তে গেলে আমার মনে হয় যে আমেরিকার এই বে-পরোয়া, দুরন্ত ছেলেটী সমস্ত বাধা বন্ধন, কন্‌ভেন্‌শন্ কাটিয়ে Pilgrim Fathers দের মতনই আপনার মনে গান গেয়ে চলেছে—চলার ছন্দে রয়েছে তার মুক্তির বাণী; কথায় জেগে উঠেছে সমস্ত পৃথিবীর প্রতি একটা অপরিসীম, সাম্যময়, অলক্ষ্য দরদ। এক কথায় ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের মধ্যে ইয়াঙ্কি-কাল্‌চার মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে এবং এই জন্যেই leaves of the Grass বইখানা আমার চব্বিশটী ঘণ্টার স্বপ্নের সাথী হয়ে উঠেছে। সেদিন আমার একটী বান্ধবী আমার লাইব্রেরীতে ওয়াল্ট হুইটম্যানের সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁর নামে একটী অভিযোগ উপস্থাপিত

করেছিলেন। সেটী হচ্ছে এই যে হুইটম্যান নাকি বেশী রকম showy, অর্থাৎ কিনা একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছিল যে হুইটম্যানের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব থেকে গেছে যে জিনিষটা প্রমাণিত বলে তাঁকে অনেকটা নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়।

আমি সেদিন কথাটার কোন জবাব দিইনি কারণ ওর সত্যতা-বিচারের সুযোগ আমার ইতিপূর্ব্বে হয়নি। তারপর পড়ে দেখলুম যে, যে কারণে বন্ধুবী বলেছিলেন ওয়াল্ট হুইটম্যান্ showy সেটা আর কিছুই নয় তার প্রাণের প্রাচুর্য্যের আতিশয্য মাত্র। তরুণ আমেরিকার মধ্যে জীবন ছন্দে, গানে, নৃত্যে প্রাণের লীলায় প্রতিনিয়ত স্পন্দিত হচ্ছে—হুইটম্যান্ তারই চিত্র এঁকেছেন। বাঙালীর চোখে ভুবনের ভাবের ঘর রূপোর চাকৃতিতে জগাট বেঁধে রয়েছে কিন্তু তার চেয়ে ও, এই নিত্যকার ছোট খাট ব্যবসাদারীর জীবনের চেয়েও, বড়ো যে আর একটা বৃহত্তর জীবন রয়েছে তার সন্ধান বাঙালীর কাছে সুদুর্ল্লভ হয়ে উঠেছে। যেদিন সে এই মণি-কোঠার চারটীকে অক্লেশে আত্মসাৎ করতে পারবে সেই দিনই তার ঘরের আনাচে কনাচে এসে পৌঁছুবে মুক্তির মন্ত্র। জীবন তার আনন্দের ঐশ্বর্য্যে নৃত্যশীল হয়ে উঠবে; মানুষ আবার তার eternal heritage কে ফিরে পাবে। এ যুগের ইংলণ্ডকে একমাত্র রূপার্ট ব্রুক্ জাগিয়ে তুলেছেন, আমেরিকার 'মেসায়া' হচ্ছেন হুইট্‌ম্যান। যখন Song of myself এর মধ্যে পড়ি

"Endless unfolding of words of ages!
And mine a word of the modern, the word
En-Masse." (Leaves of Grass p 47)

তখন মনে হয় এমন একটা লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি যে এই পৃথিবীর বাসিন্দা হয়েও এরই স্রষ্টার মতন বুকের বল নিয়ে বসতি করে। শ্রদ্ধায় মাথাটা নুয়ে আসে, কটা লোক নিজেকে এ অবধি এমনি করে প্রকাশ করতে পেরেছে? এটা দাম্ভিকতা নয়, এটা সমস্ত অন্তর দিয়ে বোঝা, সত্যকে প্রকাশ করবার একটা প্রশংসনীয় স্পর্দ্ধা। এ পর্য্যন্ত ছোট বড় অনেক ক্রিটিক্ই তাঁর নামে এই অভিযোগটা উপস্থিত করেছেন যে হুইট্‌ম্যানের দাম্ভিকতার তুলনা নেই কিন্তু মিঃ রসেটী এই সম্পর্কে যা বলেছেন তা প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখচেন "His self-assertion is boundless; yet not always to be understood as strictly or merely personal to himself, but sometimes as vicarious, the poet speaking on behalf of all men, and every man & woman" (Poems by walt Whitman, Prefatory notice p. 4) আমার মনে হয় মিঃ রসেটী যে perspective থেকে হুইট্‌ম্যানের এই আত্মম্ভরিতা ওরফে Self-assertion কে দেখেছেন সেই perspective থেকে দেখাই যুক্তিযুক্ত।

একটা কথা আমার বারবার মনে এসেছে—হুইটম্যানের মধ্যে সত্য আছে কতটুকু, যে কালে হুইটম্যান তাঁর কবিতা-গুলোকে পৃথিবীর কাছে দান করেছেন সে কালে তাদের আদর হয়নি; কিছুদিন হ'ল আদর হয়েচে বললেও চলে। তাহলেই বুঝতে হবে যে লোকটার ভেতরে কিছু আছে নইলে এতদিন পরে আবার পৃথিবীর intellectual দের নজর হুইটম্যানের ওপর পড়ল কেন? তার কারণ হুইটম্যান যে সত্য গুলোকে সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করে গেছেন তাদের তিনি স্বেচ্ছাচারী ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন, কৃত্রিমতার বালাই সেখানে মাথা ঢোকাবার সুযোগ পায়নি। যখন সেগুলো ছাপার হরফে বেরুলো তখন চারিদিক থেকে উঠলো গালাগালির ধুঁয়ো। হুইটম্যান্ হাসলেন। মনে মনে হয়তো বললেন—the truth is too strong for them to stand! চিত্ত-লোকে তাঁর এ সম্বন্ধে এতটুকুন দ্বিধা, এতটুকুন সংশয় ছিল না যে আজ না হোক, কাল না হোক, এমন দিন আসবেই আসবে যখন তারা তাদের আসন দখল করে নেবে; সত্যকে বেশীকাল চেপে রাখা চলে না। হয়েছেও তাই; সত্য-দ্রষ্টা শিল্পী জীবনের যে রূপকে দেখেছেন সে রূপ আজ ভুবনের আনাচে কানাচে আপনাকে প্রচার করেছে, প্রকাশ করেছে। তিনি লিখচেন—

"I celebrate myself, and sing myself,
And what I assure you shall assume,
For every atom belonging to me as good
belongs to you."
(Leaves of Grass, p. 29)

এতে 'self-assertion' নেই, আছে সমস্ত মনুষ্য-সমাজের সঙ্গে সুনিবিড় একটী কোমল কুটুম্বিতা। যিনি এই কবিতাটীতে self-assertion এর গন্ধ পাবেন তাঁর সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ না করে সেয়ার মার্কেটের দলালী করাই কর্তব্য।

আর এক জায়গায় পাচ্ছি—

"House and rooms are full of perfumes,
the shelves are crowded with perfumes,
I breathe the fragrance myself and know it and like it, The distillation would intoxicate me also, but I shall not let it."

এইখানে আমার ইতালীয়ান দানান্‌জিও'র কথা মনে পড়ে যায়। অঙ্গের ঐশ্বর্য্যকে এ পর্য্যন্ত কোন কবি এভাবে স্বীকার করেছেন কিনা জানিনে। শেষের লাইনটী পড়া শেষ হয়ে গেলে পরেও কানে একটি কথা বারে বারে বাজতে থাকে "But I shall not let it." এই তেজস্বীতা, এই virility তাঁর কাব্য-নদীকে প্রাণময়ী করে প্রতিনিয়ত বইয়ে দিচ্ছে। হুইটম্যান্‌কে পড়তে গিয়ে একাধিকবার এই কথাটা আমার মনে হয়েছে। আমাদের পরের যুগে যে সব তরুণরা এই পৃথিবীতে পদস্পর্শ দেবেন হুইটম্যান তাদের কাছে এই virilityর বার্ত্তা-বাহক রূপে স্মরিত হবেন এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি। "I hear America singing," কবিতাটিকে একটী বিশেষ পর্য্যায় ভুক্ত বলে মনে করি। তিনি লিখেছেন—

"I hear America singing, the varied carols
I hear,
Those of mechanics, each one singing his as
it should be blithe and strong..."

তারপর—

..."Each singing what belongs to him or
her and to no one else,
The day what belongs to the day—at night the party of young fellows, robust, friendly,
Singing with open mouths their strong
melodious songs."

হুইটম্যান বুঝতে পেরেছিলেন যে এমন একটা সময় আসবে যখন সারা পৃথিবী জুড়ে কলরব উঠবে—ইয়াঙ্কি রূপোর চাকতির তলায় নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। হুইটম্যানের এ একটা চমৎকার defence; চমৎকার ভাষায় তিনি জানিয়েছেন যে commercialism য্যামেরিকার গলার গানকে দেউলে করে দিতে পারেনি, কোনকালে পারবেও না। সবাই গেয়ে চলেছে, কেউ মরেনি হুইটম্যানের কথায় "each singing what belongs to him or her and to noone else."

এ পর্য্যন্ত হুইটম্যানের mystic স্বরূপটী কারুর কাছেই খুব ভালো করে ধরা পড়েনি দেখে অবাক্ হয়েছি। যখন তাঁর "In babined ships at sea" তে পড়ি—

"We fell the long pulsation, ebb and flow of
endless motion,
The tones of unseen mystery, the vague and
vast suggestions of the bring world..."

আবার যখন দু'লাইন পরে পাই—

"The boundless vista and the horizon far
and dim are all here,
And this is ocean's poem."

তখন মনে হয় mystic হুইটম্যানের মনোরাজ্যটীর একটা phase যেন আমার চোখের সুমুখে আলগোছে খসে গেছে অথচ এ পর্য্যন্ত যত জনা critic Leaves of Grass নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের কারুর কাছেই এ রূপটীর উদ্ঘাটন পাইনি যদিও একাধিকবার প্রত্যাশা করেছি। এর সঙ্গে বাইরণের ocean এর তুলনা চলে না, ভাষার শব্দচ্ছটায় বাইরণের কবি-প্রাণ সেখানে ভরপুর। হুইট-ম্যানের সমস্ত কবিতাটীর ভেতর দিয়ে অব্যক্ত, অবর্ণনীয় একটী অনবদ্য রহস্য জড়িয়ে রয়েছে যে রহস্যের আবরণ যুগে যুগে মানুষ বৃথাই উন্মোচন করতে প্রয়াস পেয়েছে। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র বাবু হুইটম্যানকে অনুসরণ করে লিখেছেন।

স্কুলের পড়া হিসেবে যখন পড়েছিলুম

"Of life immense in passion, pulse and
power,

Cheerful, for freest action formed under the laws divine,

The modern man I sing."

তখন হুইটম্যানের ছোঁয়াচে "self assertion" এর স্পর্শ অজ্ঞাতসারে এসে আমাকে স্পর্শ করেছিলো, ভেবেছিলুম লোকটা নিজের মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। বয়স বুদ্ধির বা বিস্তার মাফকাঠি কোনকালেই নয় তবু যেটা যে অনুভূতির অনুবীক্ষণ এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমার নেই।

হুইটম্যানের পরিচয় দিতে হলে বলা মুস্কিল কি দোষে গুণে লোকটা লোক-লোচনের অন্তরালে থেকেও সবার চিত্ত অধিকার করে বসে আছে। হুইটম্যান নিজেকে যে কথার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন সেই কটা লাইন তুলে দিতে আমার বিষম ইচ্ছা যাচ্ছে।

"Walt whitman, a kosmos, of Manhattan the son,
Turbulent, fleshy, sensual, eating, drinking and breeding,
No sentimentalist, no stander above men and women or apart from them,
No more modest than immodest."

এ থেকে ভাল বর্ণনা হুইটম্যানের দেওয়া সাধ্যাতীত। এই কটা লাইনের ভেতর থেকে হুইটম্যানের আত্মাটা উঁকিঝুঁকি মারছে। ঘরোয়া জীবনের মধ্যে কত ঐশ্বর্য্য যে আত্মগোপন করে আছে তার গুণি-গণতা নেই; সাধারণ মানুষ যে টাকা আনা পাই এর তলায় নিজের জীবনটাকে বিকিয়ে দিয়ে বসে আছে তার চোখে সে সব ধরা পড়ে না। "song of myself" এর ছ'নম্বর কবিতাটীর আরম্ভ হচ্ছে এইরকম—

A child said **what is the grass?** fetching it to me with full hands;
How could I answer the child? I do not know what it is any more than he.

এই কথাটীকে টীকা টিপ্পনী দিয়ে বোঝাতে যাওয়ার মতন ধৃষ্টতা আমার নেই। পড়লেই সোজা এসে মনের মধ্যে লাগে, মনে হয় এমন একটা জগতের মধ্যে এসে পৌছুলুম যেখানে নিত্যকার বিবাদ বিসম্বাদ আপনা থেকে সমাধি খুঁজেছে, যেখানে ভাষার মণি-কোঠা উজাড় করে দিলেও সবটুকুন্ বলা হল না—যেখানে সমস্ত কিছুই প্রচ্ছন্ন রয়েছে অন্তরের আভিজাত্যের মধ্যে। Shakespeareএর "many-headed multitude"এর সেখানে no admission টাঙ্গানো রয়েছে। "Song of myself"এর ছ'নম্বর কবিতাটী যে trend এ বলা হয়েছে সেই trendই একত্রিশ নম্বর কবিতাটী আরম্ভ করা হয়েছে। সেখানে তিনি আরও সুন্দরতর আবরণের আড়াল থেকে গেয়েছেন—

"I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars."

পৃথিবী Wordsworth কে এ পর্য্যন্ত প্রকৃতির সব চেয়ে বড়ো বন্ধু বলে জেনে এসেচে কিন্তু যখন পড়ি—

"I am he that walks with the tender and growing night,
I call to the earth and sea half-held by the right."

(Leaves of Grass, Song of myself No 21)

তখন মনে হয় এ যেন Wordsworth কেও ছাড়িয়ে গেছে; এ যেন লক্ষ গুণে বেশী intense! জীবনের প্রতি ফুলে-ফলে মায়া-মমতার জলে কমণীয় ধাত্রী এই ধরণীর প্রতি এই সহজ আত্মীয়তা শিল্পী হুইট্‌ম্যানের পক্ষেই সম্ভব। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "He knows of nothing nobler than that unit man." একদিকে জীবন তার অভিনব ঐশ্বর্য্য নিয়ে দোল খাচ্ছে অন্যদিকে দুঃখ-বেদনায় যে মায়াময় হয়ে উঠেচে—এই দুটোকেই যিনি সমান মমতা, সমান কুটুম্বিতা দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন হুইট্‌ম্যান্, দুনিয়ার সমস্ত convention যার কাছে ধ্বসে গেছে, সমস্ত formalities মাথা নুইয়ে যাকে সেলাম জানিয়েছে। এমনি একটা মানুষ রোজ কিছু আর একটা এই পৃথিবীতে জন্মায় না। 'Salut the monde'-তে তিনি শুনেচেন "emulous shouts of mustiatians," "Spanish dance with castanets in the chestnut shade," "Continual echoes from the Thomes," "Of the

Italian boat-sculler the musical recitalative of old poems" "chirp of the mexican muleteer," "Arab muezzine," "cry of the Cossack," "rhythmic myths of the Greeks" প্রভৃতি এবং সর্ব্বশেষে "the Hindoo teaching his favorite pupil the loves, wars, adages, transmitted safely to this day from poets who wrote three thousand years ago."

সর্ব্ব-দেশের এবং সর্ব্ব-কালের কবি হুইট্‌ম্যান!

তাঁর কাব্য-জগৎ জুড়ে কেবল একটী বাণী (কোথাও সেটী প্রচ্ছন্ন আবার কোথাও বা সেটী অপ্রচ্ছন্ন) জেগে রয়েচে—"মানবেরে দেখিয়াছি আপনার ভাই!" প্রতি-পদক্ষেপে হুইট্‌ম্যান তার Greater existence কে অনুভব করেছেন, প্রতি নেত্র তার Supermanism এক একটী স্নিগ্ধ স্পর্শে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাক্‌তো। Kipling এর পূর্ব্ব বনাম পশ্চিমের কলঙ্ক-প্রকারিণী ব্যবধান Whiteman এর "To the East and to the west" ভেঙ্গে স্রেফ্‌ গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এ যেন স্বর্গ থেকে দেওয়া আজ্ঞেলের বাণী যাকে মানতেই হবে, শুনতেই হবে nespa বলা চলবে না! এবারে এমন একটী কবিতার কথা বলব যার ছন্দ, যার ভাব, যার ভাষা পৃথিবীর intellectuals দের চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে, অনবদ্য আনন্দ পরিবেশন করেছে। এটী হচ্ছে memories of President Lincoln এর পর্য্যায়ভুক্ত "O captain! my captain" যার সম্বন্ধে মিঃ রসেটী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন "If the reader wishes to see the great and more intimate powers of whitman in their fullest expression, he may consult the 'nocturn for the Death of Lincoln; than which it would be difficult to find anywhere a purer, more elevated, more poetic, more ideally abstract, or at the same time more pathetically personal, threnod—uniting the thrilling chords of grief, of beauty, of triumph and of final unfathomed satisfaction."

প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন হুইটম্যান সম্বন্ধে বলিয়াছেন "well, he looks like a man!" ইয়াঙ্কি কাউকে প্রশংসা করতে বড় কৃপণ তারপর প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন এর মতন লোক যখন এমন সম্মান সূচক কথা বলেন তখন মনে হয় a genius alone can recognise a genius. এর চেয়েও বড় একটী পুরস্কার দিয়েছেন বিখ্যাত অ্যামেরিকান্‌ লেখক Thorein. তিনি বলেছেন "He is Democracy কিন্তু তা বলেই নিরস্ত হতে পারেননি; বাধ্য হয়ে তাঁকে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করতে হয়েছে "After all, he suggests something a little more than human." আনাতোল ফ্রাঁসকে পড়তে পড়তে আমার এই কথাটী মনে হয়েছে অনেকবার; সমস্ত কথার ভিতর দিয়ে একটা এমন কিছু উঁকি মারছে যা something a little more than human." কিন্তু আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়েছেন আমাদের ইংরেজ-বন্ধু রসেটী যখন হুইটম্যানকে তিনি "founder of American Poetry." উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আরো একটা অভিনব সত্য উক্তি রসেটীর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে যখন তিনি Leaves of Grass সম্বন্ধে বলেছেন "the entire book may be called the poem of the natural man!" হুইটম্যানের "তৃণের পল্লব" পড়তে গিয়ে এ কথাটিকে আমি বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেছি। হুইটম্যান ইয়াঙ্কির বাচ্চা, Americanism এর 'trustchild' আজ সুদূর বাঙলাদেশের তরুণের মনে তারই সুর দোলা দিয়েছে; এ শুভ লক্ষণ। সুর অলকার অন্দর-মহল থেকে বেরিয়ে এসে হুইটম্যান আমাদের মনে বাসা বাঁধুন; বাঙলায় রূপ, রস ও আনন্দের ঐশ্বর্য্য আসুক; জীবন আবার হাসি কান্নায় মায়াময় হয়ে উঠুক।

মাধবীলতা

—গল্প—

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

—সারা বাড়ীতে খুসীর প্লাবন···

কলকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে প্রাচীন বাড়ীর প্রতি গৃহ কোনটী। উৎসবের উন্মাদনায় সবাই বিভোর পাঁচটী সন্তানের পর আজ আসিয়াছে সুন্দর পাপ্‌ড়ি। পাপ্‌ড়ি নাম মেয়েটীর দাদা অনেকপূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। গৃহকর্ত্তারও আজ আর আনন্দের অবধি নাই— হুকা হস্তে হাঁফাইতে হাঁফাইতে তিনিও এদিক ওদিক করিতেছেন। ছোট্ট খুকীকে এখনই কোলে করিতে পারিলে হয়ত তিনি খুসী হইতেন, কিন্তু সে বিধান হিন্দু গৃহে নাই।

সবাই আনন্দে চঞ্চল;—কিন্তু নিস্পন্দের মতো শান্তভাবে পড়িয়া আছে নবজাত মেয়েটী। তাহার এ নূতন জগৎ ভাল লাগিতেছে না হয়ত।

কিন্তু এত আনন্দ বেশীকাল রহিল না। মেয়েটী ঐটুকু বটে, কিন্তু তাহার দাপটে সারা বাড়ী কম্পমান। যেমন তাহার রাগ, তেমনি তাহার অত্যাচার। সবাই তাহার দুষ্টামিপনায় অস্থির। বিছানা হইতে মেঝেয় পড়িতে তাহার মতো কেহ নাই—এখনই সে হাঁটিতে চায় নাকি। শান্ত ও নিশ্চল থাকিবার মতো মেয়ে সে মোটেই নয়। হাত নাড়িয়া পা ছুড়িয়া সবাইকে অস্থির করিতেছে। মা ভাবেন মেয়েটা কম নয়। ঠান্‌দি গাল টিপিয়া আদর করেন—'দস্যিটা।' বড়দা তাহার নাম দিয়াছেন—'দেবী চৌধুরাণী'।

যতদিন যায়, মেয়ের দুরন্তপনা বাড়িয়াই চলে। মা আরো সন্তান মানুষ করিয়াছেন; কিন্তু এমন মেছো মেয়ে মানুষ করা তাহার সাধ্যাতীত। কর্ত্তা কিন্তু ঐ দুরন্তপণাই ভালোবাসেন বেশী। বলেন—মেয়ে মানুষ বলে ও তো ছোট বেলা থেকেই শ্বশুর ঘর করতে আসেনি গো, এখন থেকে ওর ঠাণ্ডা হয়ে কাজ নেই। বয়স হলে ও সব কোথায় চলে যাবে। এস ত মা লক্ষী।'

মা-লক্ষী অবশ্য কোলে যাইবার জন্য ছোট ছোট দুটী মুঠি বাড়াইয়া দেয়—কিন্তু গৃহিণী আদর দিয়া ছেলে মেয়ের মস্তক চর্ব্বণ করিতে দিবার নাকি পাত্রী নহেন, কাজেই বলেন—'তুমি যাও দিকিনি, দেখি না কত কাঁদতে পারে। হাড় কালি করে ফেল্‌লে আমার।

পাপ্‌ড়ির কথা সকলে বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছে। একদিন দস্যি বলিয়া ঠান্‌দি ডাকিতেন, সেই দস্যির অপভ্রংশই এখন দাসীতে পরিণত হইয়াছে। দাসী মেয়ে-স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই পরেশবাবুর ছোট মেয়ে টুনিকে এমন প্রহার করিল যে, পণ্ডিতমশায় এ মেয়েকে শিক্ষা দান করিবার মতো বিদ্যা তাঁহার নাই সে কথা জানাইতে দ্বিধা বোধ করিলেন না।

তার এই পুরুষালী চাল মাকেই বেশী ব্যথিত করিল। মার অনুযোগে দাসী বলিত—'কী করি বলো, তুমিইত সব মাটি করলে, ছেলে হয়েই তো আস্‌ছিলুম। তা তুমি এমন বায়না ধরলে যে আমায় মেয়ে সাজতে হ'ল, আসলে আমি ত ছেলেই।'

—মা চোখ কপালে তুলিয়া বলিতেন—'মরমুখপুড়ী!'

মুখপুড়ী ততক্ষণে বোসেদের বাড়ীতে বাঁদর নাচ দেখিতে যাছে।

বৎসরে একবার দাসী শান্ত হইত। কুয়ার ধারে বেড়ার গাছে যখন মাধবীলতা ফুটিয়া উঠিত, তখন দাসীর মনের সুপ্ত কুমারী জাগিয়া উঠিত। দাসী সারাদিন মাধবীলতার তলায় বসিয়া থাকিত। এই সময় সাড়ী পরিত মেয়েলী খাঁজে। এই সময় সে শান্ত,নম্র ও স্নেহশীলা হইয়া উঠিত। দাসী তখন হইতে পাপড়ি।

কিন্তু ঐ ক'দিন, ফুল ফোটা শেষ হইলেই দাসীর দস্যি-পনা চিরাচরিত প্রথামত চলিত। বড়দা পড়ার বইয়ে 'ক্রমোজোম্‌' খুঁজিতেন, বাবা ভাবিতেন ও কি শাপভ্রষ্টা দেবশিশু, আর লোক চক্ষুর অন্তরালে জননী চোখের জল মুছিয়া দেবদেবীর দুয়ারে ঘুষ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেন।

দিন ত বসিয়া থাকে না। একদিন দেখা গেল কোন্ ফাঁকে দাসীর পনের বছর বয়স হইয়া গিয়াছে। বড়দা

ভাগলপুরে অতি কষ্টে একটী প্রফেসারী জুটাইয়াছেন। তাঁহার কাছে পত্র গেল, পাত্র খুজিবার জন্য। সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন—কিন্তু বিবাহ করে কে? দাসীর সম্মুখে বিবাহের কথা তুলিবার সাধ্য কাহারও নাই, আর অন্য লোকেই বা এই অর্দ্ধ বিকৃত মস্তিষ্ক মেয়েকে কেমন করিয়া বিবাহ করিবে।

দাসীর দেহে যৌবনের চাঞ্চল্য জাগিয়াছে প্রাণের প্রবাহে সারা দেহ ভরপুর।

দুশ্চিন্তার যখন অন্ত নাই, সেই সময় দাসীর দাদার বাল্যবন্ধু কিশোব হঠাৎ গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াইতে আসিয়াছে।

মাধবীলতার গাছে অজস্র-ফুল ফুটিয়াছে। ডালে ডালে পাতায় পাতায় উজ্জ্বল জোঁয়ার। দাসী মাধবী-বিতানের তলে সারাদিন বসিয়া থাকে! সেই শান্ত সমাহিত ভঙ্গী সেই ব্রীড়াকুণ্ঠ বঙ্কিমচাহনি, তারুণ্যের সুসমঞ্জস সুষমা-মণ্ডিত অনুপম দেহ শ্রী।

কিশোর আবেগ-কণ্ঠে ডাকিল—'দাসী! কেমন আছো?

কিশোরের কণ্ঠে এত কুণ্ঠা, মনে এত লজ্জা কোথা হইতে আসিল।

নির্ব্বাক-বিস্ময়ে দাসী কিশোরের মুখের দিকে চাহিল। সে মুখে কি ছিল কে জানে, কিশোর স্তব্ধ হইয়া গেল।

ইহার পর কি হইল তাহাও কি লিখিতে হইবে? গল্প বহুপূর্ব্বেই শেষ হইয়াছে। পাঁপড়ি ও কিশোরকে মাধবী-বিতানে একত্র বসিয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে।

আত্মহারা পুরুষের প্রাণে অনাদিকালের তৃষা, আর কাহার অলক্ষ আহ্বানে শরীর দেহ ও মনে সুপ্ত নারীত্ব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে দাসীর।

মাধবী-বিতানের নিভৃত ছায়াপুঞ্জের প্রতি ফুলবান টুকু আনন্দ বিভোর!

শ্যামায়মান আকাশে স্নিগ্ধ বাতাসে পরম মুহূর্ত্তে আনন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে।

ধূপের ধোঁয়া

শ্রীকমলাকান্ত বসু

শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ জীউর পূজার মন্দিরে যেদিন থেকে সে আরতি দেখতে ও কথকঠাকুরের রামায়ণপাঠ শুনতে আসত সেদিন থেকেই তার প্রতি আমার অগাধ ভালবাসার অঙ্কুর উপ্ত হয়। অতীতের প্রাচীন রসভঙ্গীতে, ঘোংরা ভাঙা গলায় যখন রাম সীতার কাহিনী অভিনীত হ'ত আমাদের উঠানের মাঝখানে, তখন সকল শ্রোতার চাইতে বেশী চেয়ে থাকতেম "খেয়া"র দিকে,—কখনো দেখি তার মুখে ফুটে উঠেছে বেশ একটা বিরাট বিরহের ভাব-বিভ্রম, কখনো বা আনন্দের পাড় উপচে পড়া অসীম স্রোত, কখনো বা ঘন কালো আশঙ্কা-অরুচির আচমকা ছায়া। দুটী চিকণ চোখ তার আমার দৃষ্টি এড়াতে পারেনি, কখনো দেখেচি উচ্ছল উল্লাসে উৎফুল্ল, কখনো অধর অশ্রু-অভিষিক্ত! আসরের মাঝে তার আকর্ষণী শক্তি ছিল বড্ড বেশী।

সন্ধ্যায় চির-প্রচলিত প্রথামত প্রত্যহ শাঁখ কাঁসর বাদ্যে ঠাকুরের আরতি হ'ত। আর সে এসে দেউলের দুয়ার ঠেসে দাঁড়াত, বসতে বললে বসত; কখনো আমার মুখের পানে, কখনো পুরুতের দিকে, কখনো ঠাকুরের আশপাশে তাকিয়ে থাকত।

আরো কত লোকই যেত আসত কিন্তু কি জানি তার মত কেউ না। আরতি-সময়ে যখন সে হাঁটু পেতে বসে' একমনে যুক্তকরে রাধামাধবকে ডাকত—কি ভক্তি-তন্ময়তায় অপূর্ব্ব ভাব তখন'''ধম্মিল্ল কুঞ্চিত কুন্তল তার কতক বা এলিয়ে পড়েছে পিঠে কাঁধে, কতক হাওয়ায় লীলায়িত, কি সুশ্রী সুন্দর সে! আমি ভাবুক নই যে তলিয়ে তলিয়ে ভাবব, কবি নই যে ভাষায় ভাষায় গেঁথে দেব, শিল্পী নই যে রঙে রঙে তুলি দিয়ে ফলিয়ে তুলব। আমার যেন মন

থাপছাড়া—যেন সব সমস্যা ; ভিত্তিহীন ভাব, পাপড়ী-ভাঙা ভাষা, এলোথেলো ইষিকার পোঁচ···

আজ বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশী। বিকেল থেকেই লোকজনের আনাগোনা এখানে। পূজার ঘরে আলো বাতীর বিচিত্র ঘটা। সময় উৎরে যায়, উন্মুখ প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা করছি ; কিন্তু খেয়াকে একবারও দেখতে পেলেম না। মন প্রাণ যেন অসঙ্গতরূপে আনচান করতে লাগল, বাঁ চোখটা দু'একবার পাতায় পাতায় নেচেও উঠল।

অনেকক্ষণ বাদে একটা যেন কিসের অগ্নি-দগ্ধ গন্ধ নাকে গেল। আমি দৌড়ে আমাদের দেউড়ী দিয়ে চাঁদনীতে এগিয়ে এলেম, একটা যেন কিসের চাঞ্চল্য আমার সারা অঙ্গে ব্যপ্ত।

চাক্ষুষ যা-যা দেখলেম তাতে আমি রীতিমত চমকিত হলুম—এ কি ? সর্ব্বনাশ···!

খেয়া বৈকালী আর দীপের সাজানো ডালি নিয়ে মন্দিরে আসছে, দুটী মৃণালবৃন্তোপম হাত তার, জোড়া রেশমী আগুনে দাউ দাউ জ্বলছে, তবু একটু-একটু চলছে সে···ওঃ সে কি প্রলয়-লোলুপ অনলের মাঝে চার্ব্বঙ্গী খেয়ার অপরূপ রূপ! যেন সে স্বয়ং দীপিকা রাগিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা আর জলন্ত অগ্নিশিখা দ্বারা পূজিতা সেখানে!

কেউ নেই—সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে। নিয়তি নিয়ন্তার এ কি নিঠুর নিবিড় মন্থ হায়! বালতির পর বালতি-ভরাট জল শ্রাবণের অক্লান্ত প্লাবনের মত বর্ষিতে কসুর করিনি আমি। খেয়া, আজ তুই সংসার-সায়রে অকালে ডুবে গেলি. কে তোর পাটনী নেবে, কে বা তোর যাত্রী ?

* * *

আজো সেই আরতি-আলো, পূজার ধুম, উঠানে ছাউনী বেঁধে রাসায়নী কথা,—কিন্তু সময় উৎরে যায়, কই সে ? সকলে একত্রিত, সে কি তবে উপস্থিতি দেবে না তার ? না, না, বড় ভুল, বড় ভুল আমার। সে যে জীবনের অন্তিম অর্ঘ্য বহুদিন হ'ল ডালি দিয়ে গেছে ঠাকুরের চরণে—তার যে ভৌতিক প্রতীকের আহুতি হয়ে গেছে অনেক দিন। সে যে চলে' গেছে বৈকুণ্ঠে শ্রীশ্রী৺রাধা-গোবিন্দের দিব্য দেউলে, সেখানে যে তার আশাকাঙ্ক্ষার পূরণ হয়েছে, আজ যে সে চরণ-চক্র পানে অমর—সার্থক। এ যে আমি স্বপ্নে—জাগ্রতে—দিবসে—নিশীথে দেখেছি, ভেবেছি, শুনেছি—যেন কানে কানে কে বলছে।

ঝিলমিলে

শ্রীকালীপদ হাজরা

গ্রামের বাবুদের শিবরাত্রির একমাত্র সলিতার বিবাহ উপলক্ষে গ্রামবাসী এখন সাতদিন সাঁটিবার আনন্দে মশগুল এবং অগ্নিবৃদ্ধির টোট্কা সেবনে সচেষ্ট, তখন বাবুদের ঠাকরুণ বাড়ীর আটচালায় বসিয়া তিনটী বালক কী এক গুঢ় মন্ত্রণা করিতেছিল।

খবরের কাগজের সাদা কিনারাগুলি কাটিয়া লইয়া তাহারা কি একটা হিসাবের খাতা করিয়াছে এবং তাহা লইয়াই তিনটি নাতি পক্ক য়্যাকাউণ্টেণ্ট তর্ক করিতেছে। শেষে খাতা খুলিয়া হিসাবরক্ষক শ্যামা বলিল, 'এই ভাখ রাসু, এবার তোর পালা প্রথমে ঢিল মারবার।'

রাসু চোখ বুলাইয়া গেল।—

দুর্গা বাড়ীর কার্ণিসে—ছোট—রাসু

আশু ঠাকুরের খামারে—বড়—শ্যামা

শাল পুকুরের তাল গাছে—ছোট—মোনা

কেষ্টদের গোয়ালে—ছোট—শ্যামা

লালুবাবুর বাগানে—বড়—মোনা

রথতলায়—বড়—

এই শেষোক্ত স্থানটীর সম্মুখে কাহার নাম লেখা হইবে, তাহা লইয়াই আলোচনা চলিতেছিল। শেষে হিসাব

মিলাইবার জন্য ওখানে রাম্বর নামই লেখা হইল, রাম্বু কিন্তু সম্মত হইল না।

রাম্বুর অসম্মতিতে শ্যামা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। বলিল, 'তবে ভাই সোনা, বেসোকে আমরা আমাদের দলে চাই না, ভীতু কোথাকার। মেয়েদের সঙ্গে সিঁদুর টোপাটুপি খেলে ছোঁড়া একেবারে ভীতু মেরে গেছে। যা বেরো তুই আমাদের কাছ থেকে, মেয়েদের সঙ্গে খেলগে যা।'

ভীতু অপবাদ শুনিয়া একটু কাঁদোকাঁদো হইয়া রাম্বু চলিয়া যাইতেছিল। সত্যই এ ক্ষেত্রে সাহসী হইবার সাহস তাহার নাই।

শ্যামা তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'কিন্তু স্থাখ রেসো, আমাদের কথা যদি কাউকে বলবি, তাহলে টের পাবি।'

রাম্বু ঘাড় নাড়িয়া কাহাকেও বলিবে না জানাইয়া চলিয়া গেল। শ্যামা ও সোনা রথতলা অভিমুখে চলিল।

রথতলায় বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতার যাত্রা হইবে। এখানে ইতিপূর্ব্বে কখনও কলিকাতার যাত্রা হয় নাই। অন্ততঃ দশখানা গ্রামের লোক এখানে নিমন্ত্রিত না হইয়াও যাত্রা শুনিতে আসিবে। বাবুদের ঠাকুরুণ বাড়ীতে তাহাদের সকলের স্থান হইবে না। তাই এই প্রশস্ত রথ তলায় ঠাঁই করা হইতেছে।

বৎসরে সেই রথের সময় এই স্থানে একবার মেলা হয়। তারপর এই স্থানটী আবার জঙ্গলে ও আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইয়া উঠে। শীতে সে সব আগাছা শুকাইয়া কতকটা পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু বুড়োরায়ের টিপির উপর মুক্তাচন্দন গাছ দুইটার জন্য আবার তাহা অপরিষ্কার হয়। মুক্তাচন্দন ফুলগুলি শুকাইয়া নীচে পড়ে, আবার ওদিককার গাছ হইতে গুলঞ্চ ফুলগুলি মাটীতে পড়িয়া লুটোপুটি খায়। তাহার উপর আবার গ্রামের যত ছুতা হাঁড়ি মালসা কাহারও মৃত্যুতে বা চন্দ্রগ্রহণাদিতে এইখানেই স্তূপাকার করিয়া ফেলা হয়। ওগুলি পরিষ্কার না করিলে যাত্রাই বা কোথায় হইবে, লোকই বা কোথায় বসিবে।

তাই বাবুদের কত বেগার কোদালি লইয়া সে সব পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গিয়াছে—বেগার খাটিতে আসিয়াও সানন্দে কাজ করিতেছে কলিকাতার যাত্রা শুনিবার আগ্রহে।

শ্যামা ও সোনা অধীর আগ্রহে ছুটিয়া আসিয়া এখানে এত ভিড় দেখিয়া প্রথমে খানিকটা থতমত খাইয়া গেল। একটু সামলাইয়া লইয়া তাহারা বুড়ো রায়ের ভাঙা ঘরটায় গিয়া ভাঙা ইটের স্তূপ হইতে গোটাকতক ভাল ভাল ঢিল বাছিয়া লইল। শ্যামার পকেটে ছোলাভাজা ছিল বলিয়া নির্ব্বাচিত ঢিলগুলি সোনার পকেটেই রাখা হইল। অতঃপর তাহারা দুইজনে অদূরে একটা শিরীষ গাছের দিকে যাত্রা করিল।

নিমেষ মধ্যে যাত্রার স্থান নির্ম্মাণ নিরত সব বেগার-গুলিই নিজ নিজ কোদালী ফেলিয়া দিয়া গামছায় পাগড়ি মাথা হইতে খুলিয়া চারিপাশে ঘুরাইতে ঘুরাইতে 'কামড়ালে রে, কামড়ালে রে' বলিতে বলিতে যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

ঘণ্টাখানেক পরে সোনা পরনের কাপড়টা খুলিয়া গায়ে জড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন বসন্তকাল। সহরের প্রেমিক প্রেমিকারা প্রেমগুঞ্জনে মত্ত থাকিলেও পল্লীগ্রাম তখন হামে বসন্তে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সোনার মাতা হরসুন্দরী পুত্রের শরীরের উত্তাপ অনুভব করিয়া এবং লাল দাগ দেখিয়া হাম সন্দেহ করিয়া বলিলেন, 'খোকা তোর গিলগিলে হয়েছে। বাইরে আর যাসনে। বিছানায় শোগে যা।'

মাতার আদেশ পাইবামাত্র সোনা সুবোধ বালকটীর মত বিছানায় গিয়া শুইল, সচরাচর তাহাকে এতটা সুবোধ দেখা যায় না।

হরসুন্দরী তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া লইয়া পুত্রের কাছে গিয়া বসিলেন এবং সারা দেহটা ভালো করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সমস্ত অঙ্গ লাল হইয়া উঠিয়াছে। বেশী ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে হরসুন্দরী ভালো করিয়া পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিলেন এবং চাদরের ভিতর হাত দিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

একটু পরেই হরসুন্দরীর হাতে কিসে দংশন করিয়া

দিল। তিনি তাড়াতাড়ি চাদর উঠাইয়া দেখিলেন, একটী মৌমাছি তখন তাঁহার হাতে হুল ফুটাইয়া বসিয়া আছে।

পাছে মৌমাছিটী পুত্রের গায়ে হুল ফোটায় সেই আশঙ্কায় হরসুন্দরী তাড়াতাড়ি সেটিকে মারিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'মৌমাছি এখানে কোত্থেকে এল রে খোকা, ভাগ্যিস তোকে কামড়ায়নি।'

'মৌমাছি কোত্থেকে এল, কই দেখি মা কতো বড়?' নেহাৎ ভাল মানুষের মত মোনা ব্যগ্রভাবে বলিল।

'থাক, আর দেখতে হবে না,' বলিয়া হরসুন্দরী তাহাকে ভাল করিয়া ঢাকা দিয়া দিলেন। হরসুন্দরী বুঝিলেন না যে তাঁহার সুশীল পুত্র মৌমাছি লইয়া গবেষণা করিবার জন্য কত বড় হিসাবের খাতা খুলিয়াছে—কত সাধনায় লোষ্ট্র নিক্ষেপে সিদ্ধ হস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বরযাত্রীরা তখন সাজিয়া গুজিয়া আপন আপন গৃহ হইতে বাহির হইতেছিল। যথাসময়ে শ্যামা একটী ফুলপাড় ধুতি ও একটা আলপাকার কোট পরিয়া মোনাদের বাড়ী আসিয়া বলিল, 'মোনা যাবি না বরযাত্রি?'

হরসুন্দরী ক্ষুন্নস্বরে বলিলেন, কি করে যাবে বাবা, মিল্‌মিলে হয়েছে ওর—তুই বাবা একটু বোস তো—একটু দূরে বোস। ওর জন্যে একটু দুধ গরম করে আনি।'

হরসুন্দরী দুধ আনিবার জন্য রান্নাঘরে গেলেন।

মোনা চুপি চুপি বলিল, 'বলি রে শ্যামা যে মিল্‌মিলে নয়, বরযাত্রি যেতে পাব না, তা হইলে।'

'আহা, কি বুদ্ধি তোমার, মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেবে না তা' হ'লে। তুই ভারী বোকা, আমি কেমন শর ঝাড়টার আড়ালে দাঁড়ালুম। মৌমাছিগুলো আমায় দেখতেও পেলে না। সোজা ছুটতে গেলি কেন বাঁদর।'

'তা হোক গে যা,' বরযাত্রি তো যেতে পেলুম না। তুই কেমন মজা করে যাবি—গাড়ী চড়ে।...'

তাড়াতাড়ি শ্যামা বলিল, 'চুপ, তোর মা আসছে।'

তোমার চুলেতে আকাশ হোয়েছে কালো

শ্রীমৃণাল কান্তি রায়

তোমার চুলেতে আকাশ হোয়েচে কালো
ক্লান্ত চোখের তারা দুটি শুকতারা—
ডাগর চোখেতে সাগর—নরম—নীল
সাহারার বুকে জোনাকির আলো জ্বালা!
ধূসর সন্ধ্যা নামিছে মর্ত্তাচলে
মরমী বধূরা সরমে ফিরিছে ঘর;
পেলব জ্যোৎস্না পাণ্ডুর হোয়ে ঘিরে
সন্ধ্যা—আকাশে বাতাসও কী মন্থর!

নয়নের কোণে গগন হারায়ে ফেলি
বাসনা আমার কামনারে ঘিরে ফিরে
লালসা আমার লোলুপ জিহ্বা মেলি'
পরাণ আমার শতধা করিবে কারে!
আলোকের শেষে ঘনায়ে আসিল আগা
আধো—আদরের চুমা শুধু বলে "ঘুমা"।

পরিহাস রসিক রমণী মোহন ঘোষাল

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

বাঙালীর জাতীয় জীবনের দৈনন্দিন গতিধারায় বহু হাস্যরসের পরিচিতি আছে। ছোটখাটো এই রূপগুলিকে সাধারণতঃ আমরা উপেক্ষা করিয়া থাকি—কিন্তু শিল্পী



হাস্য-রসিক রমনী ঘোষাল।

মনের তাহাই রসের খোরাক। রসশিল্পীর অন্তর্দৃষ্টিতে এই ছোট-খাটো রূপ গুলিই রসবান এবং সজীব হইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে প্রচারিত হইয়া থাকে।

ভারত বিখ্যাত পরিহাস রসিক রমনী মোহন ঘোষাল আমাদের সামাজিক জীবনের কয়েকটি ছবিকে তাঁহার অপূর্ব্ব অভিব্যক্তির দ্বারা রসবান করিয়া পরিস্ফুট করিয়াছেন—সেগুলি যেরূপ হাস্যরসপূর্ণ আবার তেমনি সকরুণ। সাধারণ ক্যারিকেচার হইতে রমনী বাবুর বৈশিষ্ট্য এই খানেই।

চিত্রের অভিব্যক্তিতে হাস্য-রসধারার অন্তরালে ছুলোর জীবনের করুণ্যের অনুভূতিটি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে! সাধারণের হাসিয়াছে—শিল্পী কিন্তু ইহাকে দরদী মনের ফল্গু প্রবাহে অভিসিঞ্চিত, করিয়াছেন।

বৈধব্যের সৌম্য এবং কারুণ্য রূপটি নিখুঁত। ইহা ছাড়া রমনী বাবুর ক্যারিকেচারে Satire গুলি চমৎকার। সামাজিক দুর্নীতি দুর্ব্বলতা লইয়া তাঁহার ক্যারিকেচার হাস্য-রসপূর্ণ কিন্তু তাহার তীব্রতা খুবই।



রাস্তায় "ছুলোর" বেশে।

ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীযুত ঘোষাল সদালাপী, সরল, সাদাসিধা শিক্ষিত ভদ্রলোক। বয়সে তরুণ; শক্তিভক্ত



বিধবা মহিলার বেশে।

সঞ্চয়ের জন্য ভারতের বহু প্রদেশই পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিহাস শিল্পের জন্য সর্ব্বত্রই খ্যাতি ও সমাদর লাভ করিয়াছেন।

সাধারণ ক্যারিকেচারের মধ্যে যে ভাঁড়ামি এবং লঘুতা থাকে। ঘোষাল মহাশয়ের রঙ্গ-রসের মধ্যে তাহা নাই। এক কথায় তিনি A Serious Student of our Social life."

দুঃখ দারিদ্র্য পূর্ণ বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে বাঙালী জীবনকে সরসতায় ভরাইয়া তুলিবার জন্য শিক্ষণীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া শ্রীযুত ঘোষাল যে humour এর কালচার করিতেছেন এবং যে উচ্চশ্রেণীর রস পরিবেশন করিতেছেন তজ্জন্য সত্যই তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

অন্ধকারের অন্তরালে

শ্রীঅমূল্য চরণ মজুমদার

সভ্য জগতের মায়াপুরী মহানগরীর জনকোলাহলের নাগালের বাইরে···এক অসভ্য ছোট জাতের বস্তী। অসভ্য বর্ব্বর এরা—তাই স্থানও এদের স্বতন্ত্র। আনন্দ এদের সহজ—সংসার এদের আড়ম্বরহীন—সুখ স্বপ্ন এদের সমাহিত। রোজ সন্ধ্যায় তাড়ির নেশায় আর মাদলের শব্দে এদের শ্রান্ত দেহের আনন্দ আসর। স্ত্রী পুরুষ সেই আদিম যুগের নগ্নতাকে আজও এরা আঁকড়ে পড়ে আছে। সেই এখানে সভ্যতার আলো—তাই নাই এদের ভবিষ্যতের সমানিশার আতঙ্ক। এদের জীবনে নাই কোনও ফাঁক—তাই ফাঁকি তার পথ পায় না। তারা খায় দায় স্ফূর্ত্তি করে। মান সম্মানের বালাই নেই। বিচার আচারের বালাই নেই। তাদের নালিশের বিচারক তারাই। এদেরই এক অপরিসর ভগ্ন মলিন কুটীরের এক কোনে ওর ঘর। মুখে চোখে একটা নিদারুণ ব্যর্থতার সুস্পষ্ট ছাপ। বুকের মাঝের ব্যাকুল আর্ত্তনাদ মাথা কুটে কুটে বেরোয়—তার চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে। সে পেয়েছে সভ্যতার নেশা—লেখাপড়ার সর্ব্বশেষ গণ্ডীকে অতিক্রম করেছে অনায়াসে কিন্তু ঠেকেছে—এসে জগতের পণ্যশালায়। এতদিনের সঞ্চিত পণ কে যাচাই করতে গিয়ে ফিরে এসেছে নিষ্ফলতার গ্লানি নিয়ে অপারগতার দুঃসহ যাতনাকে সম্বল করে। এখানে

ঐ লেখাপড়ার দাম নেই। যা সঞ্চয় করেছে—আজীবন—তার মূল্য আজ কিছু নেই—মেকী। এই বস্তীর এক কোনে সে থাকে। ঘৃণায় লজ্জায় তার শিক্ষাভিমানী অন্তর বিদ্রোহ করে—সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে—কিন্তু উপায় নাই। যেখানে তার স্থানের দাবী সে করতে চায়—তার মূল ধন তার নাই। এমনি করে দিন কাটে ওর। মিথ্যার স্বপ্ন দিয়ে ভবিষ্যতের রঙিন জাল বুনে। ব্যথাহত চিত্তের নিদারুণ পুঞ্জীভূত অন্তর্দাহ দীর্ঘশ্বাস হয়ে আকাশে বাতাসে মিশে যায়। জ্বালা ধরে—ধূমায়িত হয় অপমানাহত পৌরষ—কিন্তু জলে ওঠে না। শুধু অন্ধকার পেছনে সামনে—যতদূর চোখ যায় মন যায়—শুধু জমাট অন্ধকার—তার মাঝে নেই এতটুকু আলোর অস্পষ্ট ক্ষীণতম জ্যোতি। অন্ধকারায় শুয়ে শুয়ে শুধু কল্পনায় রঙ চড়িয়ে পেতে চায় একটু স্বস্তি—কিন্তু নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা তাকে কঠোর আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। উঃ কি বন্ধন—কি মর্ম্মান্তিক অপারগতা, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে—শত ছিন্ন উত্তরীয় কনা গায়ে মুড়ে শুয়ে পড়ে। দূর থেকে ভেসে আসে…ঐ অসভ্য…বর্ব্বরদের অপূর্ব্ব আনন্দ কলরব…অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য্যের ঐক্যতান।

কি গো ঠাকুর! এই সাঁঝের বেলায় শুয়ে পড়েচ। থাওয়া দাওয়া নেই। ওঠ না গো—ঘরটা একটু ঝেরে পুছে দেই।—একটী সাওতালী তরুণী গুছিয়ে দেয় ওর ঘর দোর, তদ্বির করে ওর খাওয়া দাওয়া—দৃষ্টি রাখে ওর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের। অমনি—খাতিরে। কিছু নেয় না—চায় না—আশাও করে না। কালো পাথরের মত কুচকুচে নিটোল স্বাস্থ্য সম্পদে ওর মুখ বুক সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট। নব কিশলয়ের কচি পাতার মত সতেজ কমনীয়তা ওর মুখে। প্রাণ মাতান চিত্তহারী কাজল কালো চোখে—তার অপূর্ব্ব—অপার্থিব দৃষ্টিতে সে কি অপরূপ ভাষা—প্রাণ মন ছুঁয়ে যায়—বুকে দোলা দেয়—রক্তে ব'য়ে যায় প্রলয় প্রবাহ—শিরায় শিরায় নেচে বেড়ায় পুলক শিহরণ। বুকের মাঝে অপরূপ স্বপ্নের মাধুরীভরা পূর্ণ পবিত্র অমৃত উৎস—দৃষ্টিকে আটকে ধরে—মুক্তি দেয় না। প্রতিটী সঙ্গি ঋতুরাশের অপরিমেয় দান—অফুরন্ত হোলিখেলা। সে যেন মূর্ত্তিমতি জাগরণ। সৃষ্টির আনন্দে মানুষ প্রথম মেতেছিল বুঝি নারীর এই রূপ সম্পদে।

ও বলে "আমি আর কিছু খাব না—লখিয়া"—ঘৃণায় ওর মন বিষিয়ে ওঠে…এই ছোট লোকের মেয়ের গায়ে পড়া আদর আপ্যায়নে।

"খাবে না কি গো…ওঠো না একটিবার…আমি সব ঠিক করে দেব—তুমি শুধু নামিয়ে নেবে—কি সকরুণ কাতর মিনতি।

ও বিরক্ত হয়, বলে,—যা না লখিয়া,—কেন বক্‌ছিস।

লখিয়া রেগে যায়—টান মেরে চাদর খুলে ফেলে—বলে—"না খেয়ে মরবে তো এখানে কেন?—যাওনা ঠাকুর বাইরে পথে পথে ঘুরে মর। ওঠো বলছি—

আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে ও—বলে—"মাতলামি করবার আর জায়গা পেলিনে। আমি তোকে সাবধান করে দিচ্ছি লখিয়া—ফের যদি আমার সঙ্গে গায়ে পড়ে আসবি—

"কি করবে—মারবে নাকি গো"—বলিয়া লখিয়া হেসে ওর গায়ের কাছে ঢলে পড়ে।

ও সবলে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়—বলে "বেহায়া! বদমাইস্। আমায় কি তোদের মত ছোটলোক মনে করিস। মদ খেয়েছিস—যা দলে ভিড়ে যা—দেহ দিলে আনন্দ পাবি—এখানে হবে না"—

"উঃ" অস্ফুট শব্দ করে ওঠে লখিয়া। ক্ষণকাল সে চুপ করে থাকে—তার ব্যথাহত মলিন মুখে ফুটে ওঠে সুনিবিড় কাতরতা—যাদুকরী দৃষ্টি ছাপিয়ে কুলে কুলে ভরে ওঠে অশ্রুধারা। সহসা হৃদয়ের কোন গোপন তন্ত্রীতে আঘাত করে তার আত্মমর্য্যাদা। তার মূর্চ্ছাহত মহিলা জেগে ওঠে—তীব্র আঘাতে—সে গর্জ্জে ওঠে—"কি বললে—আমি মদ খাই—আমি দেহ বেচে আমোদ করি—আমি—আমি—দুহাতে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

ও দিশে হারা, ওঠে…বুকের মাঝে জেগে ওঠে—পরম নিশ্চিন্ততায় নির্ভরতার একটী প্রতিচ্ছবি—তার পাশে ফুটে ওঠে একটী কচি শিশুর মুখ—অস্বস্তিতে ভ'রে ওঠে ওর বুক—ধীরে ধীরে স্নেহের সুরে বলে—"তুমি মদ খাওনি লখিয়া—

লখিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—না—তুমি নিষেধ করেছ

বলেই তো—আর পারে না। দুহাতে মুখ ঢেকে উচ্ছাসিত কান্নাকে বুকে চেপে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে—

বিভ্রান্ত চিত্ত ওর বাঁধন হারা হ'য়ে ছোটে···।

মুহূর্ত্তমধ্যেই লখিয়া রান্নার সামান্য আয়োজন নিয়ে ফিরে আসে—মুখে হাসি চোখে তখনও অস্পষ্ট অশ্রুর ছাপ। ও লজ্জায় মুখ নীচু করে।

আহারান্তে ওকে শুইয়ে দিয়ে লখিয়া তৃপ্তির হাসি হেসে বলে—ঠাকুর—জল এলে ডাক দিও—পর্দ্দাটা ঠিক করে দিয়ে যাবো—ঘেন্নায় যেন জল মাথায় করে শু'য়ে থেকো না—ও শুধু চেয়ে থাকে—অপলক—ভাষা নেই। মন ওর ছুয়ে যায়, ভাষা তাই পথ পায় না।

লখিয়া একটা তৃপ্তির হাসি হেসে বেরিয়ে যায়। ওর মন আবার ছুটে চলে ঘরের পানে—সেই শত দারিদ্রের ছাপ বুকে করে যেখানে ওর ভগ্ন কুটীর। যেখানে ওর অভাগিনী স্ত্রী আজও তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিয়ে স্বামী পুত্রের কল্যাণ কামনা করে—যেখানে ওর ছোট ছেলেটী আজও প্রশ্ন করে—মা বাবা কই—মা বলে—আসবে। ছেলে হয় তো বলে আমার জন্য খেলনা আনবে—না। মা—বাবা কতদিন আসে না—তাকে দেখবো মা। ওদের সন্তর বাবা এসেছে—কত জিনিষ এনেছে আমার বাবা কবে আসবে মা! আমাকে একটুও ভালবাসে না—মা আদর করে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খায়, বলে আসবে—বই কি বাবা। কি এক অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে ওঠে—আবার গলায় আঁচল দিয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করে' প্রাণের দুঃসহ বেদনাকে ঠাকুরের চরণে নিবেদন করে। আহা! অসহায়া এর চেয়ে শক্তি তার নেই। ছেলেও কি ভেবে প্রণাম করে বলে—ঠাকুর ভাল কর—মায়ের কাছে শিখেছে মায়ে ছেলে ঘরে গিয়ে হয়তো কত কথা হয়।

ওর চিন্তা ছুটে চলে বাঁধন হারা···চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোটা ফোটা অশ্রুকণা। শ্রান্তিতে ওর চোখ দুটী আপনা থেকেই ঝিমিয়ে আসে।

ঘুম ভেঙেছে—তন্দ্রা কাটেনি। আচ্ছন্নের মত চোখ বুজে নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলতে চায়। ভূতের ভ'য়ে যেন অন্ধকার ঘরে চোখ বুজে পড়ে থাকার মত। লখিয়া ছুটতে ছুটতে এসে হেসে লুটিয়ে পড়ে···সেই স্বচ্ছ ঝরণার মত অনাবিল প্রাণধারা—বলে···ওগো ঠাকুর—ওঠো না গো—এই দেখ কি এনেছি।

আবার ওর মন সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে।···ছোট জাতকে প্রশ্রয় দিতে চায় না তবুও সে আপনা থেকেই ভাব করে—সম্মতির অপেক্ষা রাখে না। কি ইতর কি জঘন্য ও উত্তর দেয় না—

লখিয়া ওর গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে—দেখনা 'মাগ' চিঠি দিয়েছে ও ধমকে ওঠে লখিয়া—চোখে ওর ঘৃণা উপছে ওঠে···লখিয়া ব্যথা পায়—ধীরে ধীরে বলে···দেখ না গো—খোকা ভাল আছে তো···কি লিখেছে। সেদিন যে বলছিলে কতদিন চিঠি পাওনি—

আত্মাভিমানী অন্তর ওর নিজের স্ত্রীর জন্য এই একটা অশিক্ষিতা সাওতাল রমনীর অনাবশ্যক কৌতূহলে বিরক্ত হ'য়ে ওঠে······বলে—ভাল না থাকে খারাপ থাক··তাতে তোর কি লখিয়া আমার ছেলের ভাল মন্দ আমি বুঝবো!

লখিয়া চমকে উঠে' ওর মুখ চেপে ধরে—"ছি! অমন কথা বলতে নেই। সে ভাল থাক···আমি শুনতে চাই না।...ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেড়িয়ে যায়।

ধীরে ধীরে ও চিঠিখানা পড়ে।···ওই চিঠির এক একটী অক্ষর জ্বলন্ত আগুনের মত ওর বুক পুড়ে ছাই করে দেয়। অসহায় পৌরুষ গুমরে গুমরে কেঁদে উঠে!

লখিয়া আড়াল থেকে মুখ চোখের ভাব দেখে দিশে হারা হ'য়ে ওঠে···ধীরে ধীরে এসে বলে···"খবর কি ভাল নয় ঠাকুর." ওর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে...চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা দারুণ পৈশাচিক উল্লাস···হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে—ও বলে,—খুব ভাল খবর শুনবি লখিয়া···তিনদিন ঘরে খাবার নেই.. ছেলেটা জ্বরে ধুকছে একটু বার্লি পায় নাই—"মাগো."—লখিয়া এসে ওর কাছে বসে। বুকের কাঁপন শাসন মানে না। ওর মাংস পেশী ফুলে ওঠে... চোখ দিয়ে আগুন ছোটে···বলে—লখিয়া...তুই ছোটলোক···কিন্তু শোন আমাদের ভদ্দর লোকের জীবন—আমি নেই আমার বন্ধু আমার বউকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চায়···। বউ লিখেছে "তুমি শীগগির এস।" লখিয়া শিউরে উঠে...বলে..."ওগো তুমি আজই যাও······"যাও—যাও—টাকা—টাকা কই। আমার বউ ছেলে বাঁচেনা বলে

কি কোম্পানী বিনা পয়সায় গাড়ী চড়তে দেবে...সিদে দেবে ঠেলে জেলে······"এই বলে আবার ও পাগলের মত হেসে ওঠে। লখিয়া···কি ভেবে বলে···আমি আসছি···যেতে তোমাকে হবেই···। লখিয়ার মনে হয় এই সুযোগ সর্দ্দার বাড়ী নেই...আর বাকসে টাকা আছে। টাকা নিয়ে ফিরে এসেই লখিয়া আর্ত্তনাদ করে ওঠে—উঃ একি—ও লখিয়ার টুঁটি চেপে ধরে—চুপ আমার খুন চেপেছে···চুপ করে থাক্ নইলে—তোকে শেষ করবো।......

পরক্ষণেই ছেলেটার গলা থেকে সোনার তাবিজটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। লখিয়া একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ঐ ছেলেটার পানে···যে প্রাণ দিয়েছে আর একটা ছেলের প্রাণের বিনিময়ে। কচি শিশুর প্রাণহীন দেহ লখিয়াকে সাক্ষী রেখে পড়ে' থাকে। মুহূর্ত্তমধ্যে বস্তীর লোকজন এসে জোটে। পুত্রহারা জননীর কাতর আর্ত্তনাদে সমস্ত বস্তী আকুল হ'য়ে উঠে। সমস্ত বস্তীর লোক ছুটে চলে সহরের দিকে।

ও ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে গাড়ীর এককোণে চুপটী করে বসে। প্রথম ঘন্টা পড়ে। ও চমকে ওঠে···এখনও পাঁচ মিনিট···ওর অন্তরকে আশঙ্কায় নিঃশেষ করে বেজে ওঠে শেষ ঘন্টা,···ধীরে ধীরে গতি সঞ্চয় করে' গাড়ী এগিয়ে চলে। ও ধীরে ধীরে একটী পুতুল বের করে দেখে। ওর সমস্ত দুঃসহ যাতনার অবসান হ'য়ে আসে। মনে থাকে ছেলের হাসি খুসী মুখ। স্ত্রীর প্রসন্ন নিশ্চিন্ততার আনন্দ। হঠাৎ ব্রেক কসতে গাড়ী থেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই বস্তীর সর্দ্দার ও দুই চারি জনের সঙ্গে দারোগাবাবু ও পুলিশ এসে ওর ঘাড়টা ধরে' রুলের গুতো দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসে। ওর কোলের পুতুল লুটায় মেঝেয়···বুকের আলো নিয়ে যায়—অনন্ত আঁধারে...মনের বিচিত্র রঙিন ফানুসে ধরে ওঠে জ্বলন্ত আগুণের লেলিহান শিখা। পায়ের তলা থেকে পৃথিবী কেঁপে কেঁপে ওঠে। লখিয়া দূরে দাঁড়িয়ে শিউরে শিউরে ওঠে...ওর দৃষ্টির অন্তরালে। সর্দ্দারের কঠোর আদেশ লখিয়াকে বলতে হবে...সে দেখেছে ঐ ছেলেটাকে হত্যা করতে। সে ছাড়া আর সাক্ষী নেই···। লখিয়া প্রথমে অস্বীকার করেছে—তার পরে স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছে। নইলে তাকে জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। এ অবস্থায় স্বীকার করা ছাড়া আর পথন্তর নেই।

অন্ধকারার একটা কোণে বসে' ওর এইটুকু জীবনের ছিন্নভিন্ন পাতাগুলি ও উলটে পালটে দেখে। এ জীবনে জমা নেই এতটুকু—এমন কোনও আকর্ষণ নেই—যাতে জীবনের উপর এতটুকু মায়া করা চলে। এই জঘন্য কারাগারের অতি নির্ম্মম আইন কানুন তার চেয়ে স্বল্প জীবনধারা ওকে দিলে হারা করে তোলে। কি নীচ এই কারাবাসীদের জীবন প্রণালী। নীতির বালাই নেই। ভয় সঙ্কোচ এদের কাছে পরাজয় মেনেছে। অপমান অত্যাচার এরা হাসিমুখে বরণ করে। আহার আচার ব্যবহারে কোনও সঙ্কোচ নেই। এ যেন সভ্য জগতের বিভীষিকা...জ্বলন্ত নরককুণ্ড। এইখানে বেঁচে থাকবার চেয়ে ফাঁসীই ওর শ্রেয়। থেকে থেকে ভেসে ওঠে একটা অভাগিনী অসহায়া লাঞ্ছিতা নারীর সকরুণ প্রতিচ্ছবি ওর মনের কোণে···ভেসে ওঠে দুটী কাতর চাউনি একটী কচি শিশুর···ওর চোখ ছাপিয়ে জল আসে। আর পথ নেই···নিরুপায়। মাঝে মাঝে লখিয়ার সেবা-নিরতা অন্তরের গোপন নিবেদন ওর বুকে এসে ঘা দেয়..ও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। শেষ দিনের প্রতীক্ষায় দিন গোনের বিচারালয়ে উকিল মোক্তার দর্শকের ভিড়ে গমগম করে। ও একবার চোখ চেয়ে দেখে। ঐ যে সর্দ্দার···ঐ যে নানকু দুখিয়া...ঐ যে মুনিয়া—অভাগা সন্তানের মা! ওর বুকটা কেঁপে ওঠে··· চোখ ফিরাতেই দেখে একটী কোনে চুপটী করে লখিয়া দাঁড়িয়ে;—তার মুখে চোখে একটা আতঙ্ক...কি যেন সুনিবিড় বেদনার সকরুণ অভিব্যক্তি। একবার চেয়ে সহানুভূতিতে মন ভ'রে ওঠে···পরক্ষণেই সবলে চোখ ফিরিয়ে নেয় দারুণ বিতৃষ্ণায়। রুচির কাছে মাথা কুটে মরে অন্তরের সকরুণ আবেদন।

জজ সাহেব একবার আসামীর দিকে চেয়ে ওদের উকীলকে বলে, আপনার সাক্ষী···

উকীল বলে,—হুজুর! আমার একটীমাত্র সাক্ষীই আছে সে নিজে চোখে, আসামীকে হত্যা করতে দেখেছে।

লখিয়ার ডাক পড়ে। হলিপা হ'লপ পড়ে, সাক্ষীর কাঠগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত বিচারালয়ের শতসহস্র

দৃষ্টি তার দিকে পড়ে। লখিয়া কেঁপে কেঁপে ওঠে। ও একবার লখিয়ার দিকে চায়। চোখে চোখে পড়ে। লখিয়া দৃষ্টি অবনত করে।

উকীল প্রশ্ন করে—তোমার নাম কি ?

লখিয়া বলে লখিয়া—

যা বলচো সত্যি বলবে—

লখিয়া ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়—

"তুমি এই ছেলেটীকে হত্যা করতে দেখেছ"

দেখেছি—

"কখন হত্যা করা হয়"—

"বিকেলে"—

"কেমন করে"—

"গলা টিপে"—

সমস্ত বিচারালয় একটী অস্বস্তিতে ভ'রে ওঠে। জজ সাহেব একবার আসামীর দিকে চায়। আসামীর দৃষ্টি উদাস। পরপারের যাত্রী সে—তাই পেয়েছে যেন নির্বিকার নির্বিকল্প সমাধি।

উকীল প্রশ্ন করে—"আচ্ছা! কে হত্যা করেছে তা তুমি দেখিয়ে দিতে পার।

লখিয়া উত্তর দেয়—হ্যাঁ—

উকীল বলে,—যে লোকটী ঐ ছেলেটীকে হত্যা করেছে এই ঘরে সে আছে—

লখিয়া বলে—আছে—

"কই—?"

লখিয়া অদূরে দাঁড়িয়ে সাঁওতালের সর্দ্দার রুখে ওঠে··· লখিয়ার পরে। পুলিশ জনতাকে শান্ত ক'রে।

জজ রায় দেয়—এ্যাকুইটেড—

লখিয়া ধীরে ধীরে সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে। আসামী একবার আকুল চোখে লখিয়ার পানে চায়। কি যেন অকুল কামনা তার বুকে তোলে একটা সর্ব্বনাশী আবেদন। কি যেন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় ওর চোখ ধ্বক্ ধ্বক্ করে—বাঘিনী পেয়েছে রক্তের আস্বাদ।

* * *

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ও কোণে ওদের গোপন ষড়যন্ত্র। একজন বলে,—পথগুলো সব আটকে রেখেছিস তো ছটোকে এক সাথে শেষ করতে হবে। হঠাৎ কার মৃদু স্পর্শে ও চমকে ওঠে। লখিয়া একহাতে মুখে আঙ্গুল চেপে ওকে চুপ করতে বলে' হিঁচরে টেনে আনে। ও স্বপ্নাবিষ্টের মত পথ চলে। চারিদিক থেকে মেঘ গর্জ্জে ওঠে। মুষল-ধারে বৃষ্টি নেমে আসে—তারি সাথে পাল্লা দিয়ে মাতামাতি সুরু হয় কাল বৈশাখীর। ও হাঁপিয়ে ওঠে···আর চলতে পারে না। লখিয়া ছহাতে ওকে বুকে চেপে ধরে ছুটে চলে বলে'—ঠাকুর এইটুকু পথ যে যেতেই হবে—এখানে থেকেও যে তোমার নিস্তার নেই! ছটী পায়ে পড়ি আর একটু—ওবলে,—আর পারি না লখিয়া একটুকু বসি—"

লখিয়া ওর শ্রান্ত দেহ কোলে নিয়ে বসে। ভয়ঙ্করী পৃথিবী যেন জাগ্রত অভিশাপের মত তার প্রলয় নাচন সুরু করে দেয়।

ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে লখিয়ার পানে! লখিয়ার মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা। যেন কিসের আশঙ্কায় সে চঞ্চলা ও ধীরে ধীরে উঠে লখিয়ায় গলা জড়িয়ে ধরে'—তার মুখে যেন কিসের অপার্থিব গোপন ইসারায়···দিশেহারা হ'য়ে ওঠে। ছহাতে সবলে ওকে জড়িয়ে ধরে, মুখটা চেপে ধরে ওর মুখে। দূরে টেনে ছুড়ে ফেলে দেয় সভ্যতার মিথ্যা আবরণ অহমিকার ফাঁকির সঙ্কোচ।

লখিয়া তার বুকের মাঝে কেঁপে কেঁপে ওঠে পুলক শিহরণে ওর বুকের মাঝে লখিয়ার মাতৃত্বের নিষ্কলুষ গর্ব্বোন্নত পীযুষভাণ্ড আঘাত করে ওর আদিম মানুষকে। মিথ্যা ভণ্ডামির কাঙ্গালপণা কাটিয়ে বেরিয়ে আসে ওর বুভুক্ষিত অন্তরের প্রলয়ঙ্করী তৃষা। সৃষ্টির আনন্দে পাগল হ'য়ে ওঠে পুরুষ লখিয়া বুক ভ'রে তার কামনাকে রূপায়িত করে—তার উত্তেজিত উৎক্ষিপ্ত পৌরুষকে আপনার বুকের নিভৃত গোপন অন্তরে সমাদরে গ্রহণ করে।

সহসা আড়াল থেকে হেঁসে ওঠে বাপ—সাথে সাথে সর্দ্দারের নিদারুণ ভয়ঙ্কর কণ্ঠ—"তবে রে সয়তান সর্দ্দারের" চোখে হিংস্র পশুর জলন্ত পাবক শিখা। হাতে ঝক্‌ঝক করছে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা।

সর্দ্দার একহাতে ওর গলাটা টিপে সজোরে করে আঘাত। লখিয়া এসে বুক পেতে দাঁড়ায়। সর্দ্দারের দিশে নেই—আঘাতের পর আঘাতে ওই কচি বুকখানা ঝাঁঝড়া করে তোলে।

ও ছহাতে মুখ থেকে আর্ত্তনাদ করে ওঠে—উঃ কি নিদারুণ—কি ভয়ঙ্কর—কি পৈশাচিক।—আতঙ্কে ছহাতে চোখ ঢাকে, হঠাৎ একটা প্রবল ঝাকানীতে চোখ চেয়ে দেখে—লখিয়া ওকে সবলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—। ও মুগ্ধ বিস্ময়ে চায়,—কথা কও! কি হ'য়েছে? বলনা গো"—ওর চোখ দিয়ে ঝরে পড়ে স্নেহ অশ্রু হ'য়ে ধীরে ধীরে লখিয়ার বাহুপাশ থেকে নিজকে মুক্ত করে, আধপোড়া বিড়িটাকে মুখে দিয়ে বলে,—"একটু আগুন আনবি লখিয়া—

মহানিশা

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

অন্তর ঘিরি যাহার জাগিছে অনন্ত অমানিশা,
তাহার পরাণে কেন বল তুমি জাগাইলে ক্ষীণ আশা ?
কেন হে পথিক তার গলে দিলে, ফুল্ল কুসুম মালা,
জনম দুখিনী ধীরার জীবনে জাগাতে প্রেমের জ্বালা ?
পিতার বুকেতে অন্ধ বালিকা ছিল যে সুখেতে লীনা,
প্রেম বিনিময়ে দয়া দিয়ে কেন করিলে তাহারে দীনা ?
কৃপার ভিখারী নহে কাঙালিনী চেয়েছিল বটে প্রেম,
স্বর্গের ফুল মন্দাকিনী সে—নিকষিত পূত হেম !'
ধরণীর নহে অমরার ধন কুসুম কোমল হিয়া
তাহারে ধরিতে পার কি কখন অর্দ্ধ হৃদয় দিয়া ?
ছোট বুকখানি ভরা ছিল তার তোমারি রূপের ধ্যানে,
তোমারি চিন্তা হ'ল ঝঙ্কৃত ধীরার প্রাণের গানে !
তোমারে ঘিরিয়া রচিলা বালিকা তাহার স্বপন পুরী,
তোমারে লইয়া ভাসাল পাথারে তাহার সোনার তরী
টুটিল স্বপন ডুবে গেল তরী, উর্ম্মি দোদুল বায়ে
প্রেম নাহি পেলে স্বর্গের দেবী, রহে কি করুণা ছায়ে ?
যখনি জানিল তোমার হৃদয় অন্য নারীতে রত
তারার লোকেতে মিশে গেল বালা হ'য়ে গেল সমাহিত !
জোছনা নিশিতে উত্থাপন যে তার সেই মহানিশা,
নহে কলুষিত স্বার্থ-গন্ধে দেবীর সে ভালবাসা !'
তোমারে জড়ায়ে কেন সে রাখিবে তাহার বাহুর পাশে ?
দূর অমরায় গন্ধ বিলায় পারিজাত হ'য়ে হাসে ?

প্রতিভার কথা

জি, সি,

বর্ত্তমান বাঙলায় কবিতার যেরূপ প্রাবল্য প্রকাশ পেয়েছে, তাতে সত্যিকারের কবিদের খুঁজে বের করা বিশেষ কষ্ট সাধ্য! বাঙলার প্রত্যেক তরুণ তরুণীই কবি! রঙ্ দেখে, ভাব আসে, উচ্ছাস আঁকে কাগজের ওপর; নাম তার কবিতা। পত্রিকারও অভাব নেই, মুদ্রিত হরফে প্রকাশ পায়, কবিতা না হ'য়ে যায় কোথা! উৎসাহ পেয়ে আবার লেখে, পুনরায় ছাপা হয়, কবি ব'লে নিজেকে মনে ক'রবার প্রত্যেকটী অধিকার যেন তখন তার হাতের মুঠোয়, কোন প্রকারে এমনি করে যদি দশ পনেরটী উচ্ছ্বাস কাগজে ছাপা হ'লো অমনি তিনি সুকবি। তাঁর লেখা তখন আর বিচার করা হয় না, নামের জোরে যায় কেটে। বিশেষ কোন সংখ্যা বেরুবে, সম্পাদক কাগজের প্রথম কিম্বা শেষ দিকে এক ইস্তাহার উল্লেখ করেন: শক্তিমান তরুণ কবি শ্রীযুত অনিল ঘোষ, নীরেন চক্রবর্ত্তী, কুমারী স্নেহ চক্রবর্ত্তী, লতিকা মিত্র প্রভৃতি তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী দ্বারা এবার 'মুক্তি'কে জয়যুক্ত ক'রলেন। আর কি অমনি মহাকবি; রবীন্দ্রনাথ হ'তে সামান্য মাত্র বাকী।

পক্ষান্তরে যাঁরা সত্যিকারের কবি, তাঁদের খোঁজ মেলে কম, কারণ তাঁরা সামান্য লেখেন। কম তো লেখেনই, তার ওপর প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত। যদিও করেন, তাও আবার ছ'মাসে ন'মাসে একটি। পাঠক তাঁকে স্মরণ রাখতে পারে না। কোন কাগজে কোন দিন লিখেছেন, কে তার তথ্য সংগ্রহ করে। শনিবারের চিঠি থেকে যে জেনে নেবে তারও উপায় নেই, তিনি ভাল লেখকের কিম্বা সত্যিকারের প্রতিভার কোন আলোচনা করেন না, কার দোষ আছে সেটুকু খুঁজে তাকে কিছুটা পাবলিসিটি দিয়ে প্রসিদ্ধ ক'রে তোলেন।

আজ আমি এমনি একজনের কাব্য সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ক'রবো, যাঁকে বুদ্ধ, অচিন্ত্য, সুভো-সতীশের মত পেছন থেকে ঠেলে তোলেনি, আপনার প্রতিভায় যিনি দেশ বিদেশে হ'য়েছেন বরণীয়। বাঙলায় একে খুঁজে পাওয়া ভার, তবু তিনি বাঙালী, বাঙলাকে ভালবাসেন। বাঙলায় এর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা যদিও হ'য়েছে কিন্তু তা যৎসামান্য; প্রয়োজনের কাছে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। মডার্ণ টাইমস্ যাঁর সাহিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় উন্মুখ, আমাদের কি উচিৎ নয় তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেওয়া?

উনিশ শ' সাতাশ সালে ঋষিদেব রায় প্রথম কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁর বয়স তের বছর। তাঁর সে কবিতায় যদিও দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয় তবু সম্পদের দিক থেকে উপেক্ষনীয় নয়। কবিতাটীর নাম 'বন্দনা-গীতি'। কবিতাটীর প্রতি ছত্রে পাই আমরা বিপুল দেশ প্রীতির আভাষ:

"স্বদেশ আমার, রাজ্য আমার, আমার জন্ম-ভূমি;
আমার শিক্ষা, আমার বিদ্যা, জননী আমার তুমি।
তুমি শ্রদ্ধা, তুমি ধ্যান, হৃদয়ে তুমি ভক্তি;
কল্পনা তুমি, প্রেরণা তুমি, বাহুতে তুমি শক্তি।
শষ্য তোমার, মলয় তোমার, তোমার বুকের জল,
নীরবে জ্বালায় জীবন প্রদীপ, মোদের দেহের বল।
তোমার স্নেহে তোমার দানেই আমরা বাঁচিয়া থাকি;
করুণা তোমার রুদ্ধ হইলে নিভে হইবে আঁখি।
যে দেবী এমন ত্যাগের মহিমা তাঁহারে কেমনে ভুলি?
আশীষ সমেত দাওগো মাতঃ তোমার চরণ ধূলি।
ভুলিয়া এবার প্রভেদ আমরা হিন্দু-মুসলমান,
ঘুচাবো তোমার বুকের ব্যথা হইব সুসন্তান।
নাহি গো শঙ্কা, নাহি কোন ভয়, আমরা তরুণ দল;
রাখিব কীর্ত্তি, দেখাব বীর্য্য, কাঁপায়ে জল-স্থল।"

একজন ত্রয়োদশ বর্ষীয় তরুণের লেখনির মুখে যেদিন বাঙালী এরূপ গভীর ভাবের প্রকাশ দেখতে পেলো, সে দিনই দূরদর্শীগণ বুঝেছিলেন, ঋষিদেব সামান্য নয়। তাঁদের সে বিশ্বাস মিথ্যা হয়নি। ওরি তিন বছর পরে এই কবির 'তরুণ' কবিতাটী তরুণ বাঙালীর প্রাণে আনলো একটা

সাড়া। অনেকের মুখেই 'তরুণ'এর একটী ক'লি তখন শ্রুত হ'তো :

হে তরুণ! উল্কা সম আঁধার আকাশে—
তোমার প্রকাশে—
ছিন্ন হোক, চূর্ণ হোক মিথ্যা যত অন্যায়-অসত্য
পূর্ণ কর ব্রত।

এমনি বহু বিদ্রোহ-কবিতা তিনি তখন লিখেছেন; নামও ক্রমে প'ড়ছিল ছড়িয়ে। অকস্মাৎ তাঁর মনের হলো পরিবর্ত্তন। বিদ্রোহী তরুণ কবিকে আমরা হারালাম, পেলাম সংস্কারী ঋষিদেবকে। এখন ঋষিদেবের ভাষায় তীব্রতা বড় নেই, শ্লেষ, উপদেশ আর যুক্তিতে পূর্ণ প্রত্যেকটী বক্তব্য। মিথ্যাকে তিনি কোন অজুহাতেই প্রশ্রয় দিতে নারাজ। যখন কিছু দিন আত্মগোপনের পর তিনি প্রথম কবিতা লিখতে পুনরায় ব্রতী হন, সে সময় ভূমিকায় বলেন :

মরি নাই, মরি নাই, নেভে নাই জীবন প্রদীপ;
হয় নাই চির রুদ্ধ মোর বিপ্ল বিকাশের দীপ।

* * *

চাহিব না পিছু ফিরে, মানিব না বাধা বিঘ্ন কোন;
আপন বীর্য্য রেখায় প্রতিষ্ঠিব আদর্শ নূতন।

কিছুদিন পরে দেখা গেলো, ঋষিদেব রায় লিখেছেন :

লজ্জিত কেন তুমি, কেন নিজেরে ভাব পঙ্কিল ছোট!
কি অপরাধ তোমার; অন্যায় কি ক'রেছ যা' অমার্জ্জনীয়?
তোমার তো কোন দোষ নেই,
স্বেচ্ছায়ও বা যদি যেতে হ'তে ব্রতী—
মেটাতে দেহের দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা
কি তাতে আসে যায়?
সতী কে জগতে?
অবগুণ্ঠনের তলে সবাই সমান।
তাও যদি না হয়, তাতেই বা কি?
ক্ষণিকের সাময়িক একটা শৈথিল্য ঝঙ্কারে—
নিঃশেষিত হ'য়ে যায় কি সমস্ত সৌরভ;
ফুরিয়ে যায় নারী জীবনের যা কিছু সম্পদ?
তোমরা যদি হও এমনি ক্যাসেরার প্যাট,
মিথ্যা বুদ্বুদ;
বৃথা তবে তোমাদের বিকাশ,
অমার্জ্জনীয় অপরাধ কর জগতে জীব রূপে এসে।

তোমরাই তোমাদের শ্রেষ্ঠ শত্রু,
বন্ধনের নাগপাশ, সাব জেলের কাস্তম সেল।
অবিচারের প্রতিকার চাবে না;
প্রতিবাদ জানাবে না বিভৎস অন্যায়ের জন্য;
অবনত মস্তকে আত্ম সমর্পন ক'রবে দুষ্টের যরযন্ত্রে।—
যাকে দেখবে একটু সচেতন, কুৎসা ছড়িয়ে দাও তাকে দমিয়ে,
এতে সত্যিকারের কোন পবিত্রতা নেই
পুষ্প আসে না বরণ ডালা নিয়ে;
তিলে তিলে কর আত্মহত্যা—
অখণ্ডনীয় মহাপাপ।
যদি বাঁচতে চাও,
হ'তে চাও স্বর্গের অধিবাসী
বিদ্রোহ কর অসত্যের প্রতিকারের দাবী জানিয়ে;
দৃঢ় শক্তিতে কহ :
আমরা বাঁচতে চাই মানুষের অধিকারে;
অসাম্যতার চাই উচ্ছেদ —
উন্মুক্ত স্বাধীনতায়
আমাদেরও আছে জন্মজগত অধিকার
দুষ্ট পক্ষপাত নীতির ক'রতে হবে উদার সংশোধন।

এত ধর্ম্মভীরু তোমরা
এতটুকু বোঝ না, মিথ্যাকে বরদাস্ত করা শ্রেষ্ঠ অন্যায়, পাপ;
সত্য প্রকৃত ধর্ম্ম
তার পবিত্রতা রক্ষা করাই বারানসী ধাম।
প্রকৃতির দেওয়া যে স্বচ্ছন্দতা, সেটাই সত্য
বন্ধনটা কুৎসিত।
ভুলে যাও তুমি অপবিত্র—লুণ্ঠিতা;
মন যদি বলে, মন যদি বলে তুমি নিষ্পাপ শেফালী—
জেনো তবে এই পৃথিবীতে তুমিই আদর্শ সতী;
অনুশোচনার প্রয়োজন নেই সে দুঃস্বপ্নের।
—দিখে যদি তোমাকে কেউ আশ্রয় না দেয়,
এগো, আমি রাখবো তোমাকে আমার বুকের অভ্যন্তরে;
অরুপণ প্রেমে তোমাকে ক'রবো স্নাত—অভিষিক্ত
অর্ঘ্য সাজাবো হৃদয়ের অর্ঘ্য রাশি দিয়ে।

নজরুল ইসলাম যদিও 'সাম্যের গান' গেয়েছেন ; লুণ্ঠিতা, নির্য্যাতিতাকে দেখিয়েছেন সম্মান ; শ্রদ্ধা প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হন নি ; টমাস হুড্ও তাদের জন্ম দুঃখ প্রকাশ ক'রেছেন, চেষ্টায় তাদের অনেকের নিষ্পাপতা প্রমাণ ক'রেছেন, কিন্তু এমন ক'রে আশ্বাস, উপদেশ আর আশ্রয় কেউ দিয়েছেন কিনা জানি না। যা কিছু মিথ্যা তার বিরুদ্ধেই যেন এর বিরাট অভিযান। এমন কি সতীত্বের গোঁড়ামীকে নারী জাতির প্রতি একটা ভীষণতর অবিচার বলতেও তিনি কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই। পুরুষের প্রত্যেকটী অধিকার ইনি মেয়েদের জন্মও অনুমোদন ক'রছেন উদার ভাবে ; উৎসাহ দিচ্ছেন যুগদেবতার মত। মানুষ যাকে পাশ কাটিয়ে চলে, করে ঘৃণা, ইনি তাকে স্থান দিচ্ছেন হৃদপিণ্ডের খনিতে। বিশেষ ক'রে তিনি প্রচার ক'রেছেন স্বেচ্ছায় যারা স্খলিতা নয়, তাদের দোষ দেওয়া মূঢ়তা। কারণ মন যার কলুষিত নয়, সে নির্দ্দোষ ; মনের পবিত্রতাই সব।

'নিদ্রাভঙ্গ' নামক একটী কবিতায় কবি আত্মপ্রতারণাকে দিয়াছেন অভিশাপ। রীতি-নীতিকে ক'রেছেন উপেক্ষা ; ব'লেছেন যত সব বন্ধন আসে সে গুলোর প্রত্যেকটাই হলো অক্ষম ভঙ্গুরদের চক্রান্ত। তাঁর মতে মিথ্যাটাই সত্য, সত্যটাই মিথ্যা ; সত্য সুন্দর নয় ; আবরণটাই মনোরম। যে পাপ করে সে পাপী নয়, সে সরল অকপট মন নিয়ে চলে আধুনিক সমাজে রীতিমত সেই শ্রেষ্ঠতম দুষ্ট। তাই তিনি ব'লছেন :

ভুল, মহাভুল ক'রে এসেছি জীবন ভ'রে—
তখন বুঝিনি, হৃদয়হীন পঙ্কিল পিশাচ যারা
তারাই দেবতা, তারাই শ্রেষ্ঠ—মহাত্মা।
যাঁরা আমার মত স্নিগ্ধ, শ্বেত শুভ্র অকৃপণ—
অসত্য হিপোক্রেসিকে দেয়না প্রশ্রয়, করে ঘৃণা ;
বিশ্বের চলন্ত প্রবাহে তাঁরাই দুষ্ট—আবর্জ্জনা।
স্বাভাবিকতার স্বাচ্ছন্দে আমার মত যাঁরা
কোন কুমারী মেয়ের বুকে মুখ রাখতে
বন্ধু-পত্নীর ওষ্ঠ চুম্বনে ভীত সন্ত্রস্ত নয়,
সমাজের বুকে তাঁরা বাস্তব বিভীষিকা।
কারণ তাঁরা লুণ্ঠন করেনা নারীর সুষমা,
সৃষ্টি ক'রতে বিরত ভবিষ্যৎ সমাজ-পতি।

উপেক্ষা, নির্য্যাতন আর কুটিল ইঙ্গিতে কবি সম্ভবতঃ পেয়েছেন অসহ্য ব্যথা, সেজন্য হঠাৎ হ'য়ে উঠলেন একজন সাধারণ মানুষ ; চিরজীবনের সঞ্চিত গ্লানিকে মুহূর্তে দূর ক'রে দিয়ে, বঞ্চিত আত্মাকে এবার তিনি লাগাম ছেড়ে দিতে ব্যস্ত :

আজ আমাকে হ'তে হ'বে দুর্দ্দান্ত, কামের তৈমুর ;
শান্ত আবরণের তলে আত্মগোপন ক'রে
হৃদয়হীন উচ্ছৃঙ্খল বাবরণ রূপে
আহরণ ক'রতে হ'বে জগৎ যুবতীর শ্রেষ্ঠ রত্ন—
গৌরবের শাশ্বত ভূষণ 'সতীত্ব'।
তাতেই আমি হ'ব সুন্দর, সত্যব্রত।
ভঙ্গুর অক্ষম শাসিদের মিথ্যা নীতিবাদ কোন
সুপ্ত মূক আত্মাকে অপমান ক'রে রেখেছি অনশনে ;
তখন বুঝিনি যারা উপেক্ষিত, ক্লিব,
অপরের পূর্ণতার ঈর্ষ্যায় তারাই সৃষ্টি করে
যত সব ভিত্তিহীন কুটিল শাস্ত্র শ্লোক—
বিধিবদ্ধ সমাজ শৃঙ্খলার পাপ আবেষ্টন।
কি অসংশোধনীয় অন্যাই না ক'রেছি
জীবনের একবিংশ বর্ষ ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে ;—
ভোগের শ্রেষ্ঠ অংশটাই ক'রেছি শুষ্ক।
যে সময় মানুষ করে সৃষ্টি; ভাসে পুষ্পে পুষ্পে।
সে চরম মাহেন্দ্র মুহূর্তকে করিনি অনুভব
শয়তান সংযমের মায়ায় ছিলাম বন্দী।
আজ আমার বন্দীত্বের চির অবসান,
প্রায় প্রত্যেকেই যেমন সাধুতার ভণ্ডামী তলে
সতর্ক শিথিল চোখে বক্রভরি' পান করে
অফুরন্ত মদিরা, অনুভবে পূর্ণ হস্তে
প্রশস্ত মন্থন বেদীর প্রচুরতা, ডুবে রক্ত নগ্ন সরোবরে
আমিও তেমনি ক'রে হ'বো সাধারণ, শান্ত সুকুমার।
এতদিন যা' বুঝিনি ; যা'কে আনিনি অনুভূতিতে
তার রূপ আজ হ'য়েছে প্রকাশ ; ভ্রান্ত আমি।
সত্য মিথ্যা' ন্যায় অন্যায় কবির কল্পনা—
ছিংসুটে লম্পটদের শঙ্কিত শাসন ;
আসলে রূপ তা'র উল্টো,—সম্পূর্ণ ভিন্ন,
ন্যায়ই অন্যায়, সত্যই মিথ্যা, পুণ্যটাই পাপ।

ভক্ত "চতুর"

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ. বি এল্

গঙ্গার কূলে ভক্ত "চতুর"
করে সুখে বস-বাস।
কৃষ্ণের নাম জপে দিবা-নিশি
মুখে সুমধুর হাস॥

প্রভাতে উঠিয়া অবগাহি জলে,
পূজে দেবতারে পুষ্পে ও ফলে,
মধ্যদিবসে দেবতার ভোগ—
অন্ন কত সুবাস,
সুরসাল কত ব্যঞ্জন রচি,
দেয় মিটাইয়া আশ।

সন্ধ্যায় যবে ঢলে পড়ে রূপ
গঙ্গায় করে আলা;
হেসে উঠে দূরে নীল পর্ব্বত
রক্ত পরাগ ঢালা;
তখন বাজায় আরতি মধুর,
কত গীত গাহে সুমধুর সুর,
শীতলি রচিয়া করায় শয়ন,
গলায় পরায় মালা;
প্রেমের আলোকে উজল তাহার
তামসী হৃদয় কালা।

পত্নীও তা'র সহায়তা করে
দেবতার সেবা কাজে;
স্বামীর আদেশ পালে অবিরত
উষায় নিশীথে সাঁঝে।
দেবতার সেবা হ'লে সমাপন
স্বামীকে রমণী করায় ভোজন;
শোয়াইয়া করে চরণ সেবন,
হর্ষ পুলক মাঝে।
সহধর্ম্মিণী "চতুর" গৃহিণী
স্বামীর সকল কাজে॥

একদিন এল গুরু "চতুরের"
দেখিতে শিষ্যে তাঁর;
মূর্ত্ত দেবেরে পাইয়া "চতুর"
পাইল স্বর্গদ্বার।

পত্নীরে তা'র করিল নিয়োগ,
সেবিতে গুরুরে, দিতে তাঁর ভোগ;
চরণ সেবন করিতে রাত্রে
নিয়োজিল পরিবার।

হোথায় গুরুর মনের ভিতরে
উদিল কাম-বিকার!
গুরু করে ভোগ শিষ্য-পত্নী
কামের বিষম ফলে!
হায় নারী তুমি, তোমারে দেখিয়া
মুনির মানস টলে!
শিষ্য পত্নী না করে বিচার,
আপনারে নাহি দেখে একবার,
কামের তাড়নে সাধনার ফলে
ফেলিল অতল জলে—
শাস্ত্রের বাণী লঙ্ঘন করে
গুরুর পতন তলে!

প্রভাতে উঠিয়া কহিল স্বামীরে
গুরুর সকল কথা,
চক্ষের জলে জানাইল নারী
আপন মনের ব্যথা।
"চতুর" কহিল—তবে কিবা ভয়?
জনম সফল জানিয়ো নিশ্চয়;
গুরু করেছেন তোমা অঙ্গীকরে,
নাহি হও অবনতা।
কিসের দুঃখ? ধন্য জীবন!
দূর কর সব ব্যথা।

গুরুরে প্রণাম করিয়া "চতুর"
কহিল মনের সুখে,—
"এতদিনে মোরে দিলে যে মুক্তি
দূর করি' সব দুখে।
আমার বলিতে যাহা কিছু সব,
আজি হ'তে হ'ল তোমার বিভব,
নামাইয়া দিলে মহাভার মোর—
মুক্ত করিলে বুকে,
দয়ার আদি নাম হইল তোমার
রহ হেথা মনোসুখে।"

ট্র্যাজেডি আমি ভালোবাসি কেন?

[পত্রাকারে প্রবন্ধ]

শ্রীমহেন্দ্র নাথ

সুমিত্রা !—

তুমি জানতে চেয়েছো বন্ধু, ট্র্যাজেডি আমি ভালোবাসি কেন? কি সুখ, কি শান্তি, কি আত্মতৃপ্তি আমি পাই 'ট্র্যাজেডি'র বৈচিত্র্যের পেছনে নিজকে চালিয়ে নিয়ে? তাকে ভালো না বেসেতো থাকবার জো আমাদের নেই; তাকে এড়িয়ে চলবার ক্ষমতা আর উপায়তো আমাদের নেই; কারণ, জীবনটাই যে একটী 'ট্র্যাজেডি' বন্ধু! এই যে বৈচিত্র্যময় জীবন—তার হাসি কান্না, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন আনন্দ-বিষাদের মাঝে সেই একই সুর ছায়ার মতো জীবনের পিছু পিছু ছুটে চলেছে, তাকে উপেক্ষা করবার মতো শক্তি সামর্থ্যতো মানুষের নেই, আর থাকবেই বা কী কোরে, তা' কি তুমি বোঝ না? যেদিন একটা চরম রহস্যময় কুহেলীর আবছায়া ছিন্ন কোরে' আর এক রহস্যময় লীলা চাঞ্চল্যের মাঝে অজ্ঞাতে আমরা এসে পড়ি, সেদিন হতেই যে বিরহের আরম্ভ! এই জন্মের পূর্ব্বে, আমরা যাঁর সাথে, যাঁর সনে প্রাণে এক হ'য়েছিলাম, তাঁর কাছ থেকে এবং সৃষ্টি বৈচিত্র্যের প্রবেশাধিকার যেখানে ছিলো না, সেই অতীন্দ্রিয় আলোক পরিধি হ'তে কি আমরা চির-নির্ব্বাসিত নই? সেখানকার প্রতি ধূলি কণা এবং প্রতিটি শিরা উপশিরার সাথে আমরা এক নিবিড় মিলনে আবদ্ধ ছিলাম, সেখান হ'তে কি আমাদের প্রাণের যোগ ছিন্ন হয়নি? জীবনের প্রথম উন্মেষ থেকে এই যে বিরহের, বিচ্ছেদের আরম্ভ,—জীবনের সায়াহ্নে, জীবনের পরি-সমাপ্তিতে আবার তার পুনরভিনয়! এমনি এবেই তো জন্মমৃত্যুর গতানুগতিক আবেষ্টনীর মাঝে—তার আবর্ত্তন বিবর্ত্তন মাঝে 'ট্র্যাজেডি'র নূতন সুর—নূতন প্রবাহ প্রাণের সমস্ত অনুভূতিকে ব্যাকুল চিন্তায় দিশেহারা করে তোলে; আমরা নিছক হাস্যোদ্দীপক রসের সন্ধান পাই কই? কাজেই 'ট্র্যাজেডি'কে ভালো না বেসে থাকবার তো উপায় নেই। জীবনের মাঝে যা ওতঃপ্রোতভাবে জড়ানো—যাকে ছাড়ানো সাধারণের সীমার বাইরে, যার উপস্থিতিকে অস্বীকার করা যায় না, তাকে তো ভালোবাসতেই হয়; কেউ হয়তো তাকে ভালোবাসে নিতান্ত দায়ে পড়ে; কিন্তু আমার ভালোবাসার মধ্যেতো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই; আমার মনের স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি, কেন জানি আমায় তাকে বন্ধু বোলে'—প্রিয় বোলে' মেনে নেয়ার অনুপ্রেরণা জানিয়ে দেয়! তাই তো আমার কাছে ভালো লাগে 'ট্র্যাজেডি'—ইহার মাঝেই আমি পাই আনন্দ। কেন জানি, ইহাই আমার প্রাণে কোন্ এক রহস্যময় মায়ালোকের সন্ধান দিয়ে যায়; কার একটা মঙ্গলময় অস্তিত্ব, মধুর—আবির্ভাব আমার অন্তরে জাগিয়ে তোলে। দুঃখ আছে বোলেই তো, মানুষ ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে; দুঃখ যদি না থাকতো, তা' হ'লে মানুষ তা' কোরতো কি সুমিত্রা!

পরিদৃশ্যমান জগতের যেদিকে তাকানো যায়, সে দিকেই বিরহের আভাষ, না পাওয়ার ব্যথা আর হতাশার দীর্ঘশ্বাস—অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষার অনুশোচনা! বসন্তে পৃথিবীর বুকে, পত্রে-পুষ্পে-কিশলয়ে, আম্র মুকুলের সুবাসে যে বিচিত্র সম্ভারের সমাবেশ হয়, যে পুলকের স্পন্দন তার প্রতিটি শিরা উপশিরাকে এক অনাস্বাদিত আবেশে আত্মহারা কোরে তোলে, যার কণামাত্র আস্বাদন কোরে'—তুমি আর আমি হয়তো তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়ি, পরিনতিতে আমরা কি দেখতে পাই?—সেই অভাব, অভিযোগ, দৈন্যের হাহাকার! পৃথিবীর বুকের মাঝে যেমন না পাওয়ার ব্যথা বেদনা, তোমার আর আমার মাঝেও সেই একই সুর কি অহরহ ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হয় না? কি যেনো, পাইনি, কি যেনো হারিয়ে গেছে!—পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে যাকে পাওয়ার জন্য, যা, উপভোগ করবার জন্য উদ্গ্রীব হ'য়ে ছিলাম, তাকে যেনো পাইনি, তা' যেন উপভোগ কোরতে পারিনি!

এই অপূর্ণতারও একটা সার্থকতা আছে, সুমিত্রা! পৃথিবীর বুকে এই অপূর্ণতা আছে বোলেইতো সে গতিশীল; তার মাঝে অভাব অভিযোগ আছে বোলেই তো সে কর্ম্মের অনুপ্রেরণা নিয়ে উদ্দাম আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, নিত্যনব অনুসন্ধানের প্রতি, নিত্য নব সৃষ্টির প্রতি আপনার কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত কোরে। একটা দুর্দ্দমনীয় আশা নিয়ে শুধু এগিয়েই চলে—পেছনে ফিরে চায় না। এ সৃষ্টিটাই অসম্পূর্ণ—এর পরিপূর্ণতা, অনবদ্য প্রকাশ নেই বোলেই তো স্রষ্টার মনেও তৃপ্তি নেই; তাই নূতন সৃষ্টির প্রেরণা অহর্নিশি তাঁকে নূতন সৃষ্টি পরিকল্পনার অধীর কোরে তোলে; আর পৃথিবীর বুকে তার প্রতিচ্ছবি, সেই মানসমূর্ত্তি, বৈচিত্র্যময়রূপে, নিত্য নব ঐশ্বর্য্যসম্ভারে ভরে' দিয়ে যায়; তবুও থেকে যায় তার মাঝে অসম্পূর্ণতা—স্রষ্টার মনে থাকে অতৃপ্তি!—এ' বিরাট বিশ্ব-সৃষ্টির পরিকল্পনা প্রথম যেদিন তাঁর মানসপটে রেখাপাত কোরল, সেদিনকার সেই পরিকল্পনার সাথে আজকের পৃথিবীর কোন সম্বন্ধই ছিলো না। যুগ যুগান্তর ব্যাপী সাধনার ফল—আজকের এই পৃথিবী, এই গ্রহ-নক্ষত্র, এই আকাশ-বাতাস, দৃশ্যমান জগতের যা কিছু আছে সব,—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ যা' পেয়ে' মাতাল; কিন্তু তৃপ্তি নেই—সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মাঝে যেমন পরিপূর্ণতার জন্য সাধনা, স্রষ্টার মনেও থাকে তাকে সম্পূর্ণতার মাঝে গড়ে' তোলবার জন্য সাধনা—বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। আমার কি মনে হয়, জানো, সুমিত্রা!—আমার মনে হয়, এই বিশ্বের মাঝে যেদিন, পরিপূর্ণতা আসবে, যেদিন, তার আর কোন অভাব অভিযোগ থাকবে না, চাওয়া আর পাওয়ার কোনো কথাই উঠবে না যেদিন, জেনো সুমিত্রা, সেদিনই তার মাঝে এসে পড়বে একঘেয়ে জীবনধারা, বৈচিত্র্য হারিয়ে সে হ'বে অভিনবত্বহীন; যুব-ধর্ম্মী কর্ম্ম প্রেরণা হ'বে পঙ্গু—স্থবির! আর সেদিনই পৃথিবীর সারা দেহে—সারা মনে প্রাণে ঘনিয়ে আসবে মৃত্যুর আঁধার; তার সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু হারাবে তাদের বৈচিত্র্য—আনন্দের আস্বাদ তাদের মাঝ থেকে পাওয়া হ'বে অসম্ভব!

তারপর দেখো,—কালো চুল এলিয়ে বর্ষা যখন বিশ্বের দুয়ারে এসে হাজির হয়, তোমার—আমার, সারা বিশ্ববাসীর প্রাণে একটা অপূর্ব্ব পুলকের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে;—সেদিনকার সেই মেঘমেদুর রাত্রির রুদ্ধ স্তব্ধতার মাঝে জীবনের কামনার ধনকে বাহুবেষ্টনের মাঝে পাবার আকাঙ্ক্ষার সন্ধান দেয়, যদি সে চলে না যায়, তা' হ'লে তোমার আমার মন কি তাতে সায় দিতে পারে? তাতে কি মানুষের মনে তৃপ্তি আনতে পারে? সে চলে যায় বোলেই তো, তুমি পুজোর অর্ঘ্য সাজিয়ে, প্রাণের সমস্ত আবেগ আকুলতা দিয়ে, তাকে আহ্বান করো; একদিন নয়, দু'দিন নয়, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তুমি তাকে আহ্বান করো। তারপর সে আসে—আবার চলে যায়; আর তোমার মন তার আবির্ভাবের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

সুমিত্রা!—না পাওয়ার একটা ব্যথা আছে জানি কিন্তু তার মাঝে সার্থকতার সন্ধানও পাওয়া যায়; তখন সেটা হয় নিবিড়! বিরহই তো মিলনের আনন্দকে গভীর, গোপন পুলকে সার্থক কোরে তোলে। কবি বোলেছেন—

"বিরহের দুঃখ তাপে
প্রেম হ'ল পূর্ণ বিকশিত।"

তাই তো বলি বন্ধু, বৈচিত্র্যহীন মিলন বিরহের চেয়েও বিরক্তিকর।

তারপর যা বোলছিলাম—'ট্র্যাজেডি'কে ভালো না বেসে থাকবার উপায় নেই সুমিত্রা! কারণ, তোমার আর আমার জীবনটাই যে একটা ট্র্যাজেডি বন্ধু! যাকে ভালোবাসি, যার দুটি পাতলা ঠোঁটের পরশ প্রাণে একটা অব্যক্ত পুলকের হিল্লোল জাগিয়ে তোলে, যার লীলাচাঞ্চল্যের মাঝে আমার প্রাণকে, আমার সর্ব্ব অনুভূতিকে ডুবিয়ে রাখতে চাই, জগতে যাকে অদেয় কিছুই থাকে না, তার আর আমার মাঝেও সেই বিরহের অভাব—'ট্র্যাজেডি'র আত্মপ্রকাশ। মাঝে মাঝে ক্ষণিক মিলনের আনন্দের মাঝে, আমরা এই রূঢ় সত্যটা ভুলে যাই; কিন্তু দেখি, তাকে আবার ছেড়ে যেতে হ'বে—আবার একটা অবশ্যম্ভাবী ব্যবধান এসে আমাদের দু'জনকে আলাদা কোরে দেবে। এই যে চিন্তা, এই যে ব্যথাতুর অনুভূতি ইহাই মিলনের অপরিতৃপ্ত আনন্দকে ব্যথার কালিমায় ঢেকে দেয়; জোছনা ভরা আকাশে আবির্ভাব হয়, বাদলদিনের কাজল কালো মেঘ পুঞ্জ। আমরা মিলনের আনন্দ নিবিড়ভাবে উপভোগ

কোরতে পারি না; কী যেনো একটা অতৃপ্তি—একটা অপূর্ণতার আভাষ থেকেই যায়। তাইতো কবি গেয়েছেন :—

'দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে, বিচ্ছেদ ভাবিয়া'

তৃপ্তির আর পরিসমাপ্তির কোনো মূল্যই নেই। জীবনের চলার পথে তা শুধু বাধাই দেয়—তারা শুধু পিছনেই টেনে নেয়, এগিয়ে চলবার ক্ষমতা, সম্মুখে তাকাবার শক্তি দে'বার অধিকার তাদের নেই! যেখানে তৃপ্তি—যেখানে সমাপ্তি, মানুষের, শুধু মানুষের নয়, সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতির কর্ম্ম প্রেরণা সেখানে অচল, সেখানে সে পঙ্গু। আমার চোখে যে তুমি সুন্দর, আমার কানে যে তোমার কণ্ঠস্বর মধুর, তার পেছনে র'য়েছে 'ট্র্যাজেডি'র প্রকাশ; তার পেছনে র'য়েছে তোমার আমার মাঝে দীর্ঘ ব্যবধান। বাস্তবিক পক্ষে জগতে তৃপ্তি নেই, মিলনের আনন্দ নেই;—অবশ্য তা' থাকা বাঞ্ছনীয়ও নয়। সত্যি নয় কি, সুমিত্রা!

তুমি হয়তো আমার বোহেমিয়ানায় আর বড় বড় বুলি আওড়াতে দেখে, বিরক্ত হ'য়ে উঠেছো, হয় তো জবাব দেবে,—"সন্তোষই সুখের মূল" অথবা "তৃণাদপি সুনীচেন, তরুরিব সহিষ্ণুনা" ইত্যাদি। কিন্তু আমি বলি—সব মিথ্যে, সব ফাঁকি, জীবনের মাঝে এদের এতোটুকু দাম নেই, বন্ধু! এ'সব বৈষ্ণবতা তোমার আমার মতো মানুষের চলার পথে প্রযোজ্য নয়; শুধু তোমার আমার নয়, কোনো একটা জাতি, কোনো একটা সমাজ—যাদের প্রাণে কর্ম্মের চাঞ্চল্য আছে, উদ্দ্যমতা আছে, তাদের পক্ষে এ' সকল প্রযোজ্য নয়; এদের সৃষ্টি হ'য়েছে বোলেই তো আমরা আজ ঘৃণ্য, হেয়; জগতের দরবারে আমাদের কোন অধিকার, কোনো দাবী নেই।

তারপর এই বোলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ ক'রব যে, এই 'ট্র্যাজেডি'ই সমগ্র বিশ্বজগতের মাঝে নিত্য নব বৈচিত্রের সন্ধান দেয়, আর মানুষ একঘেয়ে জীবনধারা হ'তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। Mother বলেছেন : The sorrows of life, if rightly received, will be to us, like the strokes of the sculptor on his marble, forming us to fairer shape, making us fitter to adorn the Temple of Eternity.

কাজেই দেখা যায়, দুঃখ—ট্র্যাজেডি অথবা অন্য যে কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থা হ'তেই হ'ক না কেন, তার মাঝে একটা মঙ্গলময় আভাষ আছে; 'ট্র্যাজেডি'র দুঃখ, তার ব্যথা, বেদনা অর্থহীন নয়, তার মাঝে একটা গূঢ় রহস্য আছে এবং সেই দুঃখকে এড়িয়ে চলা, তোমার আমার অথবা অন্য কারও ক্ষমতার বাইরে। ভেবে দেখো, বন্ধু, বিজয়া-নরেন, ললিতা-শেখরের মিলনের মাঝে "ট্র্যাজেডি"র সংঘাত ছিল বলেই তো, তাদের মিলন হ'য়েছিল মধুর, নিবিড় প্রীতির আতিশয্যে মাধুর্য্যময়। তেমনি শকুন্তলা দুষ্মন্ত, উমা আর শিবের চরম মিলনের পরিপূর্ণতাও ছিল বিরহের ঘাত প্রতিঘাতের মাঝে। কাজেই বিরহের একটা সার্থকতা আছে—তা' উদ্দেশ্যহীন নয়।

মনে আছে সুমিত্রা, 'শেলীর' সেই কথাটা? হ্যারিয়েটকে ত্যাগ ক'রবার সময় তিনি বলেছিলেন—Constancy has nothing virtuous in itself,—on the contrary it is vicious. কবির এই সামান্য দু'টো কথা আমাদের অন্তরের কোমলতায় আঘাত করে জানি এবং একটা নির্ম্মমতার ছবি আমাদের মনে রূপায়িত ক'রে তোলে তাও জানি; কিন্তু ভেবে দেখো, তখন এ'কথা বলা ছাড়া, আমার প্রিয় কবি শেলীর আর কোন উপায়ই ছিল না। কারণ, নিরবিচ্ছিন্ন মিলনের আনন্দ তা'র শিল্পী মনের অনুভূতিশীল প্রেরনাকে বিষিয়ে তুলে পঙ্গু ক'রবার উপক্রম ক'রেছিল। তাই জীবনের সেই একঘেয়ে যন্ত্রনাময়—আনন্দের পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্যই তিনি, তাঁর আর তাঁর প্রিয়ার মাঝে সৃষ্টি ক'রলেন একটা নিষ্ঠুর ব্যবধান। তুমি হয়ত ব'লবে সুমিত্রা, শেলীর পক্ষে তা' উচিৎ হয়নি। আমি তা' হ'লে ব'লব—না, অত্যন্ত উচিৎ হয়েছে; কারণ, তিনি যদি তা' না ক'রতেন, তা' হ'লে তিনি কিছুতেই বাঁচতে পারতেন না; আর যদিও তিনি বাঁচতেন, এ' হ'ত তাঁর পক্ষে মৃত্যু—অতি ভীষণ মৃত্যু!

আচ্ছা, বর্ষণরত বাদলা রাত যদি রোজই আসে, রোজই এসে সে যদি তোমার মনের কোঠায় আলোড়নের সৃষ্টি করে, তবে, তাকে কি তুমি প্রাণ খুলে' অভিনন্দন ক'রতে পারবে? না, সে তোমার মনের খোরাক যোগাতে পারবে? না, সে তা' পা'রবে না। তুমি চাইবে, শরতের সোনালি জ্যোছনা

ভরা আকাশের তলে ব'সে কল্পনার স্থতোর জাল বুনতে, তুমি চাইবে রাশি রাশি শেফালির শ্বেত শুভ্র কোমলতাকে নিবিড় ভাবে উপভোগ করতে—তোমার চোখে মুখে, তোমার গোলাপী গালের 'পরে তাদের পরশ সোহাগ দিতে। সত্যি নয়কি ?

তুমি বোধ হয় বিরক্ত হ'য়ে উঠছো। কাজেই আর কিছুই ব'লব না।—এ'বার বোধ হয়, বুঝতে পেরেছ, স্থমিত্রা, 'ট্রাজেডি' আমি ভালবাসি কেন ? নিতান্ত আবেগের বশে এতো কথা লিখে ফেললাম ; একে না হয়, নিছক পাগলামী ব'লেই মনে করো বন্ধু !—

রসমুক্তি

উস্কখুস্ক শোচনীয় চেহারা একজন অভিনেতা বেতার স্টেশনের কর্ম্মকর্ত্তার সামনে এসে দাঁড়াল।

"আপনাদের নাট্যাভিনয় বিভাগে একটা কাজ পেতে পারি কি ?"

"আপনি অভিনেতা ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"বিনা-'অডিয়েন্সে' অভিনয় করার অভিজ্ঞতা আছে কি ?"

প্রশ্ন শুনে অভিনেতা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল, বলল, "আজ্ঞে, জনশূন্য প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় কবার ফলেই তো আমি এখানে এসেছি।"

*

দু'জন ডাক্তার একসঙ্গে রুগীকে পরীক্ষা করে পরামর্শাদির জন্যে পাশের কামরায় ঢুকলেন—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দরজাটা ভাল করে বন্ধ করা হল না, তার ফলে রুগীর কানে তাঁদের কথাবার্ত্তা পৌঁছাতে লাগল।

একজন ডাক্তার বললেন, "আপনার ভুল হয়েছে।"

দ্বিতীয় জন প্রতিবাদ করলেন, "কক্ষনো না, আমি ঠিকই ধরেছি।"

এই সময়ে রুগী একটা চাপা আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌তেই ডাক্তারেরা ত্রস্ত হয়ে বাদানুবাদ থামিয়ে ফেল্‌লেন—কিন্তু তার আগেই প্রথম ডাক্তার এই ইঙ্গিতটা করে ফেলেছেন, "এখন আপনার ইচ্ছেমতই কাজ হোক—কিন্তু ময়না তদন্তের সময়ে আমি আপনার ভুল দেখিয়ে দেব।"

শ্যামবাবু : "আপনার ঘরের এই সব আসবাব পত্রগুলি বড় চমৎকার তো।"

রামবাবুর বালকপুত্র : "এ সব জিনিষ বাবাকে যিনি বেচেছেন তিনিও বোধ হয় এখন সেটা বুঝতে পেরেছেন—তাই এখনো আসা যাওয়া করছেন।"

*

একজন ছাত্রের কোনও দুষ্কর্ম্ম সম্বন্ধে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও একজন প্রফেসরের মধ্যে কথা হচ্ছিল। প্রফেসরের ইচ্ছা ছাত্রটির রীতিমত শাস্তি হোক, বললেন, "ভগবান আমাদের চোখ দিয়েছেন ন্যায় অন্যায় দেখবার জন্যে।"

প্রিন্সিপ্যাল একটা হাই তুলে তুড়ি দিলেন, এবং মাথা নাড়িয়ে বললেন, "নিশ্চয়। কিন্তু চোখের পাতাও দিয়েছেন বটে।"

* *

ক্রুদ্ধ খরিদ্দার : "আপনাদের দোকানের ম্যানেজার কৈ ? আমি আশা করি তার কিছু বুদ্ধি বিবেচনা আছে।"

সহকারী : "তা আছে বলতে হবে—আপনাকে আসতে দেখেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।"

*

"তুমি যে বিবাহিত তা তোমায় দেখেই বুঝা যায়—জামার ঘাড়ের কাছে, বা বোতামগুলো আর ছেঁড়া দেখছি না।"

"তা বটে। আমার বৌ এসে প্রথমেই ঘাড়ে ধরে কাপড় চোপর শেলাই করতে শিখিয়ে দিয়েছে।"

"একটা হাতী কেনবার মত টাকা থাকলে ভারী সুখী হতাম।"

"হাতী নিয়ে কি করবে?"

"হাতী কে চায়—চাই টাকা।"

*

স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া হচ্ছে। স্বামী বললেন, "মেয়েদের কেন পাখী বলা হয় এইবার বুঝতে পারছি।"

"তাই না-কি? কেন শুনি?"

"কারণ, তুমি কেবল কিচির মিচির করছ।"

"হুঁ' একটা পোকা সংগ্রহ করতে পারলে সব পাখীই এমন করে।"

একদিন

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত বি, এস-সি

চক্কোত্তি দা' ব'ললেই সবাই তাকে চিনতে পারে। কোথায় তার দেশ, কোথা থেকেই বা সে এসেছে এ সব কেউ জানে না, জানবার দরকার ও বোধ হয় করে না। নাম তার কেউ জানে না কিন্তু চক্কোত্তিদা' কে চেনেনা এমন লোক সে পাড়ায় এবং তার আশে পাশের অনেকখানি জায়গাতেই কেউ নেই। এ হেন দাদা কলকাতারই একধারে এক বস্তির অন্ধকার এক ঘরে আস্তানা নেয়। সংসার ব'লতে বছর চারেকের এক ছেলে ছাড়া আর কেউ তার নেই। আর কেউ না থাকায় তার দুঃখ আছে ব'লেও মনে হয় না—বাড়ীতে যতক্ষণ সে থাকে ছেলেটাকে নিয়েই পড়ে থাকে। ছেলের কান্না থামাতে না পারলে নিজের গালেই হয়ত' চড় কসিয়ে দেয়, তাতেও ঠিক না হ'লে পাশের ঘরের কৈলাশের দরজার সামনে তাকে ধুম্ ক'রে বসিয়ে দিয়ে অন্ধকার ঘরের জানলার সামনে গুম্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আকাশ পাতাল ভাবনা হয়ত' সে সময় তাকে ঠেলে নিয়ে চলে কোন্ হারানো দিনের পথে। একটা কিছু তার জানা ছিল কিন্তু সে পথ আজ বন্ধ, অনেকদিন,—বছর চারেক আগে সমস্ত গোলমালেরই একটা সিদ্ধান্ত মিলত, কিন্তু সে-দিন আর নেই। সে কলহও নেই, সে অভিমানও নেয়—আছে শুধু সে-সবেরই স্মৃতিচিহ্ন হ'য়ে ওই ছেলেটা। ও ভাবতে চায় না—অন্ধকার ঘরের জানলা দিয়ে দূর আকাশের দিকে চাইলেই যেন চিন্তাগুলো একযোগে তাকে আক্রমণ করে। জোরে জানলাটা বন্ধ ক'রে সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

চক্কোত্তি ছাপাখানার কাজ করে। দশটা থেকে ছ'টা পর্য্যন্ত। কিন্তু ছ'টায় শেষ হন না, সাতটা আটটা পর্য্যন্তও জের টানতে হয়। সময়ে সময়ে পাড়ায় সকালে আটটা পর্য্যন্ত চায়ের দোকানে যে আড্ডাটা বসে সেটাই তার সব চেয়ে প্রিয়। পৃথিবীর সবকিছুর বিনিময়েও সে ওই আড্ডাটা চায়। পন্টু, রামরতন, মাষ্টার এমনি অনেকেই সেখানে এসে জড় হয়। মাষ্টার লোকটি বেশ কিন্তু। কোনদিন ছাত্র পড়ায় নি, পড়াবার মত বিদ্যেও তার নেই তবু সে যে কেমন ক'রে সবার মাষ্টার ব'লে চ'লে আসছে তা কেউ জানে না। সমালোচক সেখানে কেউ নেই যে তাদের চোখে আঙুল দিয়ে ভুল ধরিয়ে দেয়—সবাই চায় আনন্দ, মাষ্টার অথবা প্রফেসর হ'য়ে যাওয়াও সেখানে আশ্চর্য্য নয়। রবিবার এই আড্ডাটা বসে একটু বিশেষ ভাবেই। কেউ আর উঠে যেতে চায় না। বাড়ী ঘরের কোন চিন্তা আছে এ তাদের দেখে বোঝা যায় না সেদিন। গোটা দু'য়েক 'হাফ্ কাপ' চায়ের সঙ্গে হাজার কথা তাদের সেদিন বলা চাই-ই। চায়ের নেশার চাইতেও এ নেশা তাদের বড় ক'রেই ধরে। টেবিলের ওপর বুকের আর কনুইয়ের ভর রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে তারা অনর্গল কথা ব'লে চলে।

ঘাড়টাকে একটু কাত ক'রে মাষ্টার বলে, কি হে পঞ্চু কাল নাকি তোমার একটা ফাঁড়া গেছে শুনছি! ক'লকাতার রাস্তার ফাঁড়াগুলো সব পকেট ছেড়ে হাতের ওপরই এসে আশ্রয় নেয় দেখছি।

হাত নেড়ে পঞ্চু বলে, আর ব'ল না হে মাষ্টার, ক'লকাতার মানুষগুলোও যেমন রাস্তাগুলিও হ'য়েছে তেমনি। কোনটা যে যমের দোর তা' বুঝবার উপায় নেই। রাস্তা তৈরী হ'য়েছে মানুষের জন্যে না মোটরের জন্যে তা কে জানে।

চক্কোত্তি বলে, কেন হে বাপু, পায়ে চ'লবারও ত' একটা পথ ক'রে দিয়েছে—সে-সব ত্যাগ ক'রে বৈরেগী হ'য়েছ নাকি?

চায়ের কাপটা সশব্দে টেবলের ওপর রেখে পঞ্চু বলে, আরে দাদা ওসব তোমাদের পোষায়। ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়াগুলোর মত চোখ বুঁজে হাঁটার অভ্যেস আমার নেই। রাস্তা দিয়ে কত কি যায়—তা' না দেখলে আমার ঘুমই হয় না।

রামরতন বলে, নাও এবার, কি বিপদেই পড়া গেল। বলি কোথায় একটু মৌজ ক'রব না বাধিয়ে দিলে তর্ক। ফাঁড়াটা কি শুনিই না ছাই। নেশা কেটে গেলে তখন আমার জ্ঞান থাকবে না ব'লে দিচ্ছি।

প্রসাদ হাত বাড়িয়ে একবার রামরতনের কাপটা নেড়ে দেখে, তারপর হতাশ হ'য়ে বলে, সবটাই শেষ ক'রেছিস্ মাইরি। দিতে বল্ না একটা হাফ্—তোর পায়ে পড়ি রামু, তুই আছিস্ ব'লেই ত টিকে আছি।

রামরতন চটে ওঠে, বলে, কেন, কিসের জন্যে দেব' তোকে? কাজ কর্ম্ম করিস্ না কিছু, তবু অত চা খাবার ঝোঁক কেন বাপু। আমরা, হ্যাঁ, একি তোর মত, কাজ করি—লায়েক হ'য়েছি। আগে আমাদের মত লায়েক হ' তারপর সমান সমান হওয়া যাবে।

জিভ কেটে প্রসাদ বলে, আর তোর সমান হব আমি, বলিস্ কি? অধর্ম্ম হবে যেরে? তুই হলি গিয়ে হ্যাঁ, আর আমি? কি যে বলিস্ তুই—বল্ না মাইরি দিতে—

মাষ্টার বলে, ওহে নরু দাও ত' ও ছোঁড়াকে একটা—জ্বালালে দেখ্ছি। তারপর কি হ'ল হে পঞ্চু?

রামরতন হাত নেড়ে বলে, না হে, না মাষ্টারের কথা শুন' না—পয়সা আমিই দেব' খন। ও অমন কত যায়—, কি বলিস্ রে পেসাদ? তারপর একটু গম্ভীরভাবে পঞ্চুর দিকে চেয়ে বলে, আরম্ভ ক'রে দাও—ফাঁড়াটাড়া গুলো জেনে রাখা ভাল, কেমন ক'রেই বা আসে আর কেমন ক'রেই বা কাটান যায় তা' বেশ ক'রে অভ্যেস করা দরকার।

পঞ্চু বলে, আরে জানইত মোটরের নম্বর দেখা আমার একটা অনেক দিনের অভ্যেস বেশ একটা আনন্দ পাওয়া যায় কিনা। ইংরিজী জান্লে ও সব সখ একটু বাড়ে জানইত' দাদা। দেখি ভারী চক্চকে একটা গাড়ী আসছে, মনে হ'ল যেন আমারই ওটা। কিন্তু নম্বর? রাস্তার মাঝখানে এগিয়ে গিয়ে চেয়ে থাকি ওটার দিকে—উঃ আর একটু হ'লেই হ'য়েছিল আর কি! বাঙ্গালী বাবুরা কি ব'লে ওঠে আমাকে লক্ষ্য ক'রে—হয়ত' আমাকে গাড়ী চাপতেই ডাকছিল কি বল মাষ্টার?

মাষ্টার কি বোঝে তা সেই জানে—শুধু ঘাড় নাড়ে।

চক্কোত্তি দা বলে, কেন হে বাপু বিপদের মধ্যে যাওয়া। ইংরিজী জানলেও সে-সব একটু চেপে যেতে হয় ভায়া। দাদা পেয়ালাটার দিকে মাথাটা আরও একটু ঝুকিয়ে দেয়।

রামরতন বলে, বাপ্ রে, ওসব রাস্তার ধার ঘেঁসেও যেতে নেই। ভাল কথা অফিসের যদু মিত্তী ব'লেছিল—মন্ত্রীরা নাকি আজকাল মোটর চাপ্তে পারে না। মিথ্যে কথা, কি বল মাষ্টার। মন্ত্রীরা মতলব দিয়ে শেষকালে রাজাকেও হাঁটাবে নাকি?

মাষ্টার জোরে ঘাড় নেড়ে বলে, পাগল হয়েছিস্ কি দুঃখু ওদের যে ওরা হাঁটতে যাবে? সিঁড়ি দিয়ে নামতে না নামতেই অমন দু' চারটে গাড়ী এসে যায়।

রামতন বলে, আরে তা নয়—কি সব স্বদেশী মন্ত্রী নাকি হ'য়েছে আজকাল; তারা সব হেঁটে বেড়ায়।

প্রসাদ বলে, স্বদেশী মন্ত্রী? স্বদেশী রাজাও হ'য়েছে নাকি? ওরা সব হাঁটতে সুরু করেছে⋯তবেইত' মুস্কিল দেখ্ছি। লাট সাহেব মোটরে যায় তাতেই রাস্তায় হাঁটতে দেয় না পুলিস, এবার থেকে ত' বাড়ীতেই প'ড়ে থাকতে হবে দেখছি। এ দোকানটাকে বাড়ীর পাশে নিয়ে যাওয়া

যায় না? কি দাদা তুমি যে ব'লছ না কিছু—তুমিই ত' খোঁজ টোঁজ রাখ এর।

দাদা ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরা স্বদেশী রাজা মন্ত্রীর কথা ছাপাই বটে—ছাপার অক্ষর মিথ্যে হবে না সে ঠিক। তবে আমাদের ভাবতে হবে না, ও সব হাঙ্গামা এ দেশে হয়নি। আমরা দিব্যি বেড়িয়ে বেড়াব, চা খাব আর মোটর দেখব।

প্রসাদ যেন নিশ্চিন্ত হয়, বলে, তা হ'লেই হ'ল। তুমিই আমাদের একটু বাঁচিয়ে চ'লো দাদা। এ দেশের জন্যে স্বদেশী রাজা মন্ত্রী ছাপিয়ে দিয়ো না যেন—তুমি না ছাপলে আর ভয় কি আমাদের, কি বল মাষ্টার!

মাষ্টার কিছুই না ব'লে ঘাড় নাড়ে—পকেট থেকে একটা বিড়ি বার ক'রে চক্কোত্তিদার হাতে দিয়ে আর একটা নিজে ধরিয়ে নেয়।

পঞ্চু আর রামরতন একসঙ্গেই ব'লে ওঠে, কি হে মাষ্টার আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি! বলি বার কর না আরও।

মাষ্টার বলে, আরে তোরা হচ্ছিস্ ছোট, নিজে থেকেই কি দিতে পারি, তবে চাইলে, হাঁ, শাস্তরেই ব'লেছে অতিথি ফেরাতে নেই। ছ'টো বিড়ি বার ক'রে সে ওদের সামনে ফেলে দেয়।

প্রসাদ বলে, দাদা আমাকে কিন্তু একটু পেসাদ হবে ওসব টাটকা জিনিষ আমার পোষায় না।

চক্কোত্তি এরই মধ্যে বিড়িটা অর্দ্ধেক শেষ ক'রে ফেলে, বাকীটা প্রসাদের হাতে দিতে গিয়ে আবার ফিরিয়ে এনে লম্বা দু'টো টান দিয়ে বলে, এই নে এসব বেশী খাওয়া ভাল নয়রে—কি সব বড় বড় রোগ নাকি এতে হয়। এক বিড়িওয়ালা একদিন ব'লছিল যে, সাহেবরা সাদা ব'লেই সিগেরেট বানিয়েছে আমরাও বিড়ি বানিয়েছি আমাদের গায়ের রং দেখেই। আসলে দুই-ই নাকি এক। বিড়িতে আমাদের তাই কোন ক্ষতিই হবে না। কথাটা সত্যি ভেবেছিলুম—কিন্তু এর মধ্যে আরও অনেক কথা আছে। দাদা অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়তে থাকে।

রামরতন বলে, বাঃ লোকটার মাথা আছে দেখছি, কিন্তু আবার কি কথা থাকতে পারে দাদা? দাদা মাথা নেড়ে হেসে বলে, সেদিন অফিস একটু সকাল সকালই হ'য়ে যায়—তাই একটু ঘুরে আসতে আসতে দেখি একজায়গায় অনেক লোক জমেছে, কে একজন কোঁচান ধুতি আর সিল্কের চাদরওয়ালা ভদ্রলোক বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিনিই ব'ললেন, এ সব খাওয়া ভাল নয়, বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য এমনি সব কারণেই নাকি নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, ভয় হ'য়েছিল রোগ-গুলির বড় বড় নাম শুনে। শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়েছিলুম, বক্তৃতা শেষ ক'রে গাড়ীতে উঠে ভদ্রলোক একটা মস্তবড় চুরুট ধরালেন—বুঝলুম বাঙ্গালীর গায়ের রং কালো। বিড়ি ওয়ালা মিথ্যে বলেনি, তবে রংটারই একটু ভুল ক'রে ফেলেছে।

পঞ্চুর ছেলে এসে বলে, মা ডাকছে তোমায়, ব'ললে অনেক সময় হ'য়ে গেছে—আর আড্ডা দিতে হবে না।

পঞ্চু তাড়া দিয়ে ওঠে, বলে, যা এখান থেকে, তোর আর জ্যাঠাম ক'রতে হবে না। আড্ডা দিতে হবে কি না সে 'আমি বুঝব'। পঞ্চুর মুখ বিকৃত হ'য়ে ওঠে।

ছেলেও কম যায় না, বলে, আর একটু দেরী হ'লেই মা কিন্তু ভাত ডাল সব উনুনে ঢেলে দেবে, এতক্ষণ হয়ত'—।

চক্কোত্তি উঠে পড়ে, বলে, অনেক দেরী হ'য়েছে হে পঞ্চু, আর দেরী ক'রে কাজ নেই। সবাই উঠে পড়ে। পঞ্চু তবু একবার মুখ বিকৃত ক'রে বলে, দেরী হয়েছে, আর দেরী হ'য়েছে! রোজই ত' সকাল সকাল হয়রে বাপু। রবিবার দিন একটু আরাম ক'রতেও কি ছাই দেবে?

* * * *

প্রেসের কাজ শেষ ক'রে ফিরতে চক্কোত্তির প্রায় রোজই একটু রাত হ'য়ে যায়। যে সোজা মাঝারি আকারের গলিটা তাকে প্রথমেই পার হতে হয় তার দু'ধারের বাড়ীগুলোর কোনটারই শুচিতা ছিল না। বিশেষ এক ধরণের লোকেরাই এসব বাড়ীতে যাতায়াত করে। আসবার সময় দু'ধারেই দরজার সামনে দণ্ডায়মানা নারীরা তার দৃষ্টি এড়ায় না। অনেকরই হয়ত এ পথ দিয়ে যেতে লজ্জা করে এই সময়ে—তার কিন্তু এতটুকুও বাধে না। ওদের মুখের দিকে সে বেশ স্পষ্ট ভাবেই তাকাতে পারে, ওদের মুখের পাউডার আর রং, ঠোঁটের কালো রং ঢাকবার ব্যর্থ প্রয়াস, চোখের কোনের কাজলটুকু পর্য্যন্ত ও একবার মাত্র তাকিয়েই বুঝতে

পারে। আজ সাড়ে তিন বছরেরও ওপর এই পথেই তার যাওয়া আশা—এ পথের কি না জানে সে? প্রথম প্রথম তারও অসুবিধে হ'ত বই কি! বছর চারেক হ'ল সে ক'লকাতায় চলে এসেছে, দু'এক মাসের মধ্যেই এ চাকরী সে জুটিয়ে নেয়। এদের মুখের দিকে চাইলে প্রথম প্রথম তার বুক শুকিয়ে উঠত। নারীর একি বিকৃত রূপ? স্ত্রীর কথা মনে হ'ত—চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসতে চাইত। নিজেকে সামলে নেবার জন্যে ছাপাখানার খাটুনীর কথা সে মনে ক'রতে চাইত কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে ভেসে উঠত ওই যন্ত্রের পাশে তার শিশু পুত্রের মুখ।—

চক্কোত্তির অভ্যস্ত চোখ আজ ব'লে দিতে পারে ওই লাল বাড়ীটার সামনে কজন দাঁড়িয়ে থাকে, কেমনই বা তাদের চেহারা—ওই হলুদে রংয়ের বাড়ীটাতে রোজ কি কি গান হয়। একটা জিনিষ সে একটু গম্ভীর ভাবে নজর দিয়ে আসছে। চাক্‌রীতে যোগ দেবার মাস খানেক পর থেকেই সে ভাল করে দেখে আসছে ওই ছোট্ট সুন্দর দোতলা বাড়ীটাকে। বাড়ীটাকে কে যেন অতি আদরে ঘিরে রেখেছে। সুন্দরীর মত সেটা যেন সব সময়েই সেজে থাকে। ওরই অধিকারিনীকে সে বার বার না দেখে পারেনি। বছর আঠার উনিশের মেয়েটা—অপরূপ তার রূপ, স্নিগ্ধ তার মুখশ্রী। এদের মধ্যে ওরূপ মহা আশ্চর্য্যের ব্যাপার। চেহারা দেখে তাকে ওদের দলের মনে ক'রবার কোন কারণই হ'তে পারে না।

মাঝে মাঝে জানলার সামনে তাকে সে দেখেছে। একটা মোহময় আবেশ তুলে সে দাঁড়িয়ে থাকত। প্রায়ই একটা বিরাট চক্‌চকে মোটর তার দরজার সামনে দেখা যেত—বাড়ীর ভেতর থেকে ভেসে আসত তার সুমিষ্ট গান, ঘুঙুরের শব্দও শোনা যেত মাঝে মাঝে।

চক্কোত্তি অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখেছে কতদিন। তার নিজের অন্ধকার ঘরের কথা সে তখন ভুলে গেছে—ভুলে গেছে তার ছেলের কথা।

পাশের দরজার কোন মেয়ে হয়ত বলে উঠেছে, অত কেন বাবু, এসব দেখলে গা জ্বলে যায়, বয়েস একদিন আমাদেরও ছিল। হাঁ করে তাকিয়ে থাকবার কি আছে বাবু?

অপর কেউ হয়ত বলেছে, কটা দিন সবুর কর না বাছা, তারপর সবই এক হয়ে যাবে। অমন গাড়ীও আর থাকবে না—লোকজন ফাঁ ক'রেও আর চেয়ে রইবে না।

ওদের কথায় চক্কোত্তির চমক ভেঙ্গে গেছে, মাথা নীচু ক'রে ও আস্তে আস্তে নিজের পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনি হ'য়েছে কতদিন—কতদিন ওই মেয়েটি তাকে বিদ্রূপ ক'রেছে কিন্তু তবুও এ পথ সে ছাড়েনি। এটা তার সোজা পথ হয়ত আরও কিছুর।

সাড়ে তিনটে বছর মাত্র কেটে গেছে। এরই মধ্যে ওই ছোট্ট সুন্দর বাড়ীটা বিমর্ষভাব ধারণ করেছে। ওর ভাগ্যলক্ষ্মী যেন ওকে ছেড়ে গেছে—সেই গাড়ীখানা আর দেখা যায় না। ধীরে ধীরে রূপান্তরিত ওই বাড়ীটা যেন চক্কোত্তিকে সজাগ করে তোলে। বাড়ীর দরজার দিকে নজর দিয়ে আজ সে দেখতে পায় একটী কুৎসিৎ মেয়েকে। গত কয়েকদিন সে অন্যমনস্কের মত হেঁটেছে। আজ ওই মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে সে যেন চমকে যায়।

মেয়েটি হাত নেড়ে তাকে ডাকে, ও অবাক হ'য়ে যায়—বিশ্বাস হয় না। মেয়েটি কিন্তু তবু ছাড়তে চায় না, হাত নেড়ে ডাকতেই থাকে।

চক্কোত্তির কৌতূহল হয়, এগিয়ে গিয়ে বলে, ডাকছ আমায়?

মেয়েটি বলে, ভেতরে একবার আসবে? এসোনা, সত্যি, ভয় নেই। একটা মাত্র ক—কথা বলব, আর কিছু না। আসবে না? ওর কথা বন্ধ হ'য়ে আসে, মুখ চোখের আকুল আবেদন দেখে চক্কোত্তি স্থির হ'য়ে থাকতে পারে না।

ওর সঙ্গে ভেতরে যেতে যেতে চক্কোত্তি বলে, কি দরকার? আমি ত' তোমায় চিনি না। ঘরের মধ্যে এসে মেয়েটি তার বিছানাটা দেখিয়ে বলে, ব'স।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে চক্কোত্তি বিছানার একধারে ব'সে পড়ে।

মেয়েটি খানিকক্ষণ মাথা নীচু ক'রে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে মাথা তুলে বলে, মাত্র বছর তিনেকের মধ্যেই আমার এই চেহারা হ'য়ে গেছে। এর আগে আমাকে নিয়ে হ'য়েছে কত বিবাদ, কত অভিমান কিন্তু আজ তারা ফিরেও চায় না। এর প্রতিশোধ নিচ্ছে

পারব'না জানি, সে পথও আর নেই। পেটের চিন্তাই আজ বড় হ'য়ে উঠেচে।

চক্কোত্তির মুখে একটা তীব্র হাসি খেলে যায়, বলে, প্রতিশোধ কি সত্যিই তোমরা নাও না? তোমাদেরই অনেকে স্বামীকে অসহায় ফেলে রেখে যায়—স্বামীর কি হয় তাতে বোঝ? তোমাদেরই কাছ থেকে বিভিন্ন রোগ নিয়ে যায় অনেকে আর অনেক স্থলেই সে সব ছড়িয়ে পড়ে তাদের স্ত্রী পুত্রের মধ্যে। সেই নির্দ্দোষ মেয়েদের বুকের তীব্র হুতশ্বাসের কি কোন মূল্যই নেই মনে কর? কিন্তু কি জন্য ডেকেছ তাই বল।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে মেয়েটি বলে, কিছু দেবে না আমায়, খেতে পাচ্ছিনে যে। পকেটে যে কটা পয়সা ছিল তাই বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও উঠে দাঁড়িয়ে বলে, খেতে না পাওয়াই উচিত।

পথ আগলে মেয়েটি বলে, খেতে না পেয়ে শেষ হ'য়ে যাওয়াই ভাল তা জানি—তাতে কারও কিছু না হ'লেও আমাদের খুবই উপকার হয়। কিন্তু দোষ কি শুধু আমাদেরই? ছেলেবেলা থেকেই এসব দেখে এসেছি, তখন থেকেই শুনে আসছি আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বড় বড় গাড়ীওয়ালা বাবুদের মুখে। এই বছর তিনেকের মধ্যেই আমার দেহের যে অবস্থা হয়েছে তা' দেখেও কি বলতে হ'বে দোষ শুধু আমাদেরই।

ওর হাত ঠেলে বেরিয়ে আসতে আসতে চক্কোত্তি বলে, ও সব শুনতে চাইনে—বুক যার পুড়েছে সে তোমার কথা শুনতে চাইবেও না।—

বাড়ী ফিরে এসে ও ওর ঘুমন্ত ছেলেটার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন দেখতে চায়। পাশে দেওয়ালে টাঙান আয়নাটার দিকে চেয়ে নিজের মুখ দেখতে পেয়ে সে কতকটা শান্ত হয়।

* * *

রবিবারের আড্ডা ঠিক সময়েই বসে। মাষ্টার, রামরতন, পণ্টু, এমন কি প্রসাদও বাদ যায় না।

মাষ্টার তেমনি ভাবেই ঘাড় কাত ক'রে বলে, সংসারের কোথায় যে কি ঘটে তা' কেই বা ব'লতে পারে দাদা। আমার এক বন্ধু আছে—বাপের পয়সাও তার কম নয়, লেখাপড়ায় সে আমারই মত। বাপ বললে, চাকরী কর, ও কিন্তু সে কথায় কোন জবাব না দিয়ে পাড়ার ছেলেদের রাজ্যের কাজ মাথায় নিয়ে বেড়ায়। থিয়েটার থেকে সুরু করে খেলার মাঠ পর্য্যন্ত তার অবাধ গতি। অচেনা তার কেউ নেই। কিন্তু বাপ কি সে সব শোনে! কাজের চেয়ে অকাজের নেশায় যে মেতে থাকে তার দিকে ফিরে তাকানর অভ্যেস ভদ্রলোকের নেই। ছেলেকে বললেন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে। ছেলে মায়ের কাছে এসে একটু হেসে বলে, আমাকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলা কেন বাবু? কতক্ষণই বা থাকি আমি বাড়ীতে? দু'বেলা দু'টো খাই আর রাত্রে ঘণ্টা কয়েক। ওইটুকু সময় বাবাকে বলে ঠিক করে নিও, বুঝলে? অভাব যখন নেই তখন কেনরে বাপু অমন করে তাড়া দেওয়া?

প্রসাদ বলে, উঃ, বাবা যদি কিছু রেখে যেত মাইরি, তা'হলে যা হ'ত। তোকেও খাওয়াতুম রাম্, চা—এমন কি বিড়িও।

রামরতন তার মাথায় একটা চড় কসিয়ে বলে, থাম, টাকা রেখে যাবার জন্যেই আমাদের বাপ পিতাম' জন্মে ছিলেন কিনা? একবার পেতুম সামনে ত' মনের ঝালটা মিটিয়ে নিতুম—তাদের আর কি, নিশ্চিন্ত হয়েই কেটে পড়েছেন কিন্তু তার পরে তাল সামলায় কে?

মাষ্টার বলে, তুমিই কি ছেলের জন্যে কিছু রেখে যেতে পারবে ভাব? কপালে করাঘাত করে রামরতন বলে, ছাই, ওসব ভাবাভাবির মধ্যে আমি নেই, একেবারে খাবার না রেখেই যেতে হবে, ওপরে ব'সে ও ছোঁড়ার গালাগালি শুনতেই হবে—নির্ঘাৎ।

দাদা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, দুটো টাকা ধার দাও দেখি মাষ্টার।

মাষ্টার বলে, তোমার আবার দরকার কিসের।

চক্কোত্তি হাসে, বলে, দরকার কি শুধু একজনকে নিয়েই হয় ভাই? ওটা অপরের হ'লেও অনেক সময় কাঁধে চেপে বসে। ওই দরকারের জন্যেই আজও আমায় খাটতে হবে—এর আগে কোনদিনই বেশী খাটবার দরকার ত হয়নি।

ওরা সকলেই বিস্মিত হ'য়ে ওঠে, মাষ্টার ঘাড় নেড়ে বলে, তাইত।

চক্রোত্তি বলে, তাইত'র কিছু নেই মাষ্টার। যে যেটুকু পায় সে সেইটুকু আদায় ক'রে নিতে ছাড়ে না। প্রেসাদ রামরতনের চায়ের কাপে ছোঁ মারে—রামরতন মাষ্টারের বিড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। এমনি হয়। চার বছর আগেকার একটা ঘটনাই আমার কাঁধে ভর করেছে—ওদের সকলেরই বোধ হয় এক অবস্থা হয়, তাই একজনকে দিয়ে আর একজনের কথা মনে করতে হয়—একটু চট্‌পট্‌ দাও হে মাষ্টার।

দু'টো টাকা পকেটে ফেলে নিতান্ত অন্যমনস্কের মতই চক্রোত্তি দা' ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

রবিবারের আড্ডা আর তেমন করে জমে না। দাদা কিছু বেশী উপায়ের জন্যে সেদিনও খাটতে যায়। দাদা না থাকলে আড্ডার সবচেয়ে বড় অংশটাই ফাঁক পড়ে যায়—সেই ত' বিচারক, সে যা না ছাপে তা' সত্যি হ'তে পারে না যে।



কংগ্রেস সভাপতি কর্ত্তৃক পরিকল্পিত 'জাতীয় শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা' কমিটির প্রথম অধিবেশনে নানাবিধ আলোচনা হয়। ভারতের শিল্পোন্নতির বিপুল সম্ভাবনা ও সুযোগের অভাব নাই। কিন্তু শুদ্ধমাত্র কুটীর শিল্প দ্বারা বর্ত্তমান জগতে সকল প্রয়োজন মিটাইয়া বাঁচিয়া থাকা চলে না—সেইজন্য বৃহদাকার কল-কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে না পারিলে যুদ্ধ বিগ্রহের দরুন বা অন্য কোন কারণে বৈদেশিক আমদানি বন্ধ হইলে ভারতের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইতে পারে।

*

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার পরীক্ষকমণ্ডলী ভারত সরকারের নিকট যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই যে সব বিষয়ে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প'ড়েন নাই পরীক্ষার সময়ে সেই সব বিষয় লইয়া থাকেন, তাঁহারা মনে করেন যে সামান্য সামান্য পড়িয়া কাজ চালান যাইবে। পুঁথীগত বিদ্যার দ্বারা কাজ হইবে—এই বিশ্বাসেও বহু অযোগ্য ছাত্র পরীক্ষা দিতে বসেন।

*

মিঃ জিন্নার মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্য যে কি চাহেন গান্ধীপ্রসাদপণ্ডিত বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ বহু চেষ্টা ও গবেষণার ফলেও তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ইদানীং জিন্নারই জাতভাই উদার হৃদয় আজাদ সাহেব একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। ইহাতেও এক শ্রেণীর মুসলমানগণ আপত্তি করিতেছেন—একটা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন সুবিধাবাদী প্রতিষ্ঠানকে সারা ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করা জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের পক্ষে মোটেই প্রীতিকর হইবে না।

*

ভারত সরকারের আইন-সচীবের পদ এতদিন তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্বাধীনচেতা বাঙ্গালী ব্যবহারজীবীদেরই একচেটিয়া ছিল—এবার, কি কারণে বলা যায় না, স্যর নৃপেন্দ্রনাথের অবসর গ্রহণের পর স্যর জাফরুল্লা খাঁকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। স্যর মন্মথ নাথ অস্থায়ীভাবে কিছুকাল ঐ কাজটি করিয়াছিলেন—কি কারণে তাঁহাকেও ডিঙ্গাইয়া যাওয়া হইল তাহা রহস্যাবৃত।

*

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে স্যর সর্ব্বপল্লী যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একস্থানে তিনি বলিয়াছেন, "নিজেদের স্বার্থ, আন্তর্জাতিক ভদ্রতা এবং ন্যায় বিচারের অনুরোধেই বৃটেনের ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তন করা উচিত।'''ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্র এমন হওয়া

উচিত যাহার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন প্রদেশ, ও দেশীয় রাজ্য সমূহের মধ্যে ঐক্যবৃদ্ধি হইতে পারে।...ভারতবর্ষের ধর্ম্মগত ঐতিহ্য গণতন্ত্র সমর্থন করে। গণতন্ত্রের আদর্শ হইতে ভারতবর্ষ যদি বিচ্যুত হইয়াই থাকে, পরাধীনতা ও দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া ভারতবর্ষ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।"...

*

প্যালেষ্টাইনে আরবদের বিতাড়িত বা পদানত করিয়া ইহুদীদের বসবাসের স্থান করিয়া দিবার সাধুসঙ্কল্প ইংরাজদের এতদূর উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে তাহারা মনুষ্যত্বের সীমা পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিতে ইতঃস্তত করিতেছে না। তাহারা কোনও কোনও সহর বোমার মুখে উড়াইয়া দিয়া, গৃহবাড়ী ধ্বংস করিয়া, আত্মরক্ষা প্রয়াসী ব্যক্তিদের হত্যা করিয়া 'জন-কল্যাণে' আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

*

ফরাসীদেশে জার্ম্মানীর রাজদূতকে গুলী করিয়া হত্যা করায় এক ইহুদী যুবক ধৃত হয়। তারপর হইতে জার্ম্মানীতে হতভাগ্য ইহুদীদের উপর নির্য্যাতন চরমে উঠে। বলিতে গেলে, এক কুলী মজুরীগিরি ছাড়া ইহুদীদের জীবিকা উপায়ের সমস্ত পথই বন্ধ হইয়া গিয়াছে—গড়ে একজন জার্ম্মানের জন্য শতজন ইহুদীকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইতেছে। বর্ব্বরতার যে সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে ইতিহাসের কুত্রাপিও তাহার তুলনা মিলে না।

*

দেরাডুনের সরকারী সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীর সংখ্যা বৎসরে বৎসরে কমিয়া আসিতেছে—ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া একশ্রেণীর ব্যক্তি বলিতেছেন যে, সামরিক কর্ম্মচারীদের মধ্যে 'ভারতীয়' ও 'ইউরোপীয়' ইউনিট্ গঠন, বেতন ও ভাতা প্রভৃতিতে এই বর্ণবৈষম্য, এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সৃষ্ট সামরিক ও অসামরিক শ্রেণীবিভাগ ছাত্র হ্রাসের কারণ। যদি এই সকল কৃত্রিমতা তুলিয়া দেওয়া হয় এবং সকল প্রদেশগুলি হইতে যুবকরা যোগ্যতানুসারে সৈন্য হইবার সুযোগ পায় তাহা হইলে সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে।

চীনের ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র সচীব মিঃ চেন বলিয়াছেন, 'জাপানের সহিত শান্তিস্থাপনের অর্থ চীনের স্বাধীনতা ও জাতীয়তার বিলোপ সাধন। যদি চীনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সামরিকশক্তি আধুনিক কায়দায় শক্তিশালী করা যায়, তাহা হইলে শত্রুকে এমনভাবে বাধা দিতে পারি যাহার ফলে জাপান কখনো চীনে স্থায়ী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হইবে না। চীন যে শুধু অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী শত্রুর সহিত লড়িতেছে তাহা নহে—আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতেও সে অক্ষম। এই কারণেই বিদেশী বন্ধুর নিকট হইতে সমর সম্ভার সাহায্যের প্রয়োজন।" সহানুভূতিশীল সোভিয়েট রুশিয়ার নিকটেই এই সাহায্য বেশী পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া তাঁহার মত।

* *

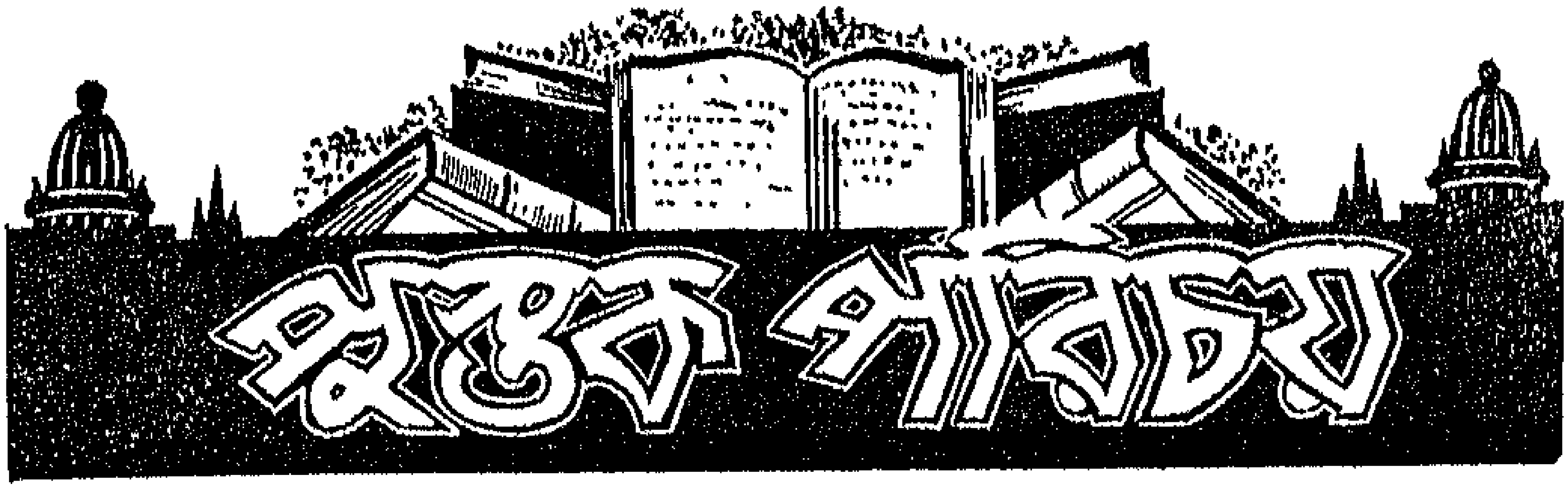
সোভিয়েট বিরোধী জারপন্থী রুশিয়ানদের দলভুক্ত করিয়া নাৎসী জার্ম্মেনী রুশিয়া জয় করিয়া সমগ্র মধ্য-এশিয়া পর্য্যন্ত জার্ম্মান সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছে—জনৈক রুশিয় সেনানায়ক এইরূপ এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি নিজেও জারপন্থী এবং হিট্লার ইহাকে ষড়যন্ত্রে টানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। লোভ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

* *

বাংলাদেশে পাট অর্ডিন্যান্স প্রচলিত হওয়ায় বিভিন্ন চটকলের প্রায় পঁচিশ হাজার শ্রমজীবী বেকার হইয়া পড়িয়াছে, এবং দুই লক্ষ শ্রমিকের বেতন হইতে বিপুল পরিমানে অর্থ কাটা যাইতেছে। পাটের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ চাষীর দুর্দ্দশার একশেষ দাঁড়াইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স দ্বারা কেবলমাত্র শেতাঙ্গ ও অবাঙ্গালী ধনীরা উপকৃত হইয়াছেন মাত্র। বাংলার হকাই মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনাস্থা প্রস্তাবের আক্রমন হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার পুরস্কার স্বরূপ, এবং দেশের অগনিত জনতায়, অধিবাসীদের সুখ সুবিধার প্রতি অন্ধত্বের ফলে হকাই মন্ত্রীমণ্ডলী এই পাট অর্ডিন্যান্স প্রচলিত করিয়াছেন।

* *

অর্চ্চনা সম্পাদক মহাশয় গত দুইমাস যাবৎ সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাগত আছেন।



দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোঃ— (ইংলণ্ড প্রথম অংশ), ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা প্রণীত। ৯ নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা, ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য সাড়ে চারি টাকা মাত্র।

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা "দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো" নাম দিয়ে ইয়োরোপের নানা দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আলোচনা গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে করিতেছেন। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি কয়েকটী দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আলোচনা বেশ সুচিন্তিত ভাবেই করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে তিনি শুধু ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস তথ্য সঙ্কলন করেন নাই, তাহার সহিত তিনি সুচিন্তিত আলোচনা করিয়া আমাদের বেশ ভাল ভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, কোন ঘটনা বা ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে বহু উত্থান পতনের ভিতর দিয়া ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রসঙ্গত প্রদত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার লক্ষ্য ছিল, ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বিবর্তন বর্ণন ও ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় কাঠামো আইনের সম্পর্ক কথা পরিস্ফুট করা। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় কাঠামো, আইন ও তাহার প্রয়োজন আলোচিত হইবে।"

বর্তমান গ্রন্থে ডক্টর লাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সুগভীর অনুসন্ধিৎসা ও সূক্ষ্ম বিচার নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞান বর্দ্ধনকারী এই সুবিরাট ও সুচিন্তিত গ্রন্থ প্রত্যেক জ্ঞানলিপ্সুর গৃহে এবং বঙ্গদেশের প্রত্যেক পাঠাগারে রক্ষিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আমরা অনুভব করি।

দি ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি ঃ (চতুর্দ্দশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) জুন, ১৯৩৮। ডক্টর নরেন্দ্র নাথ লাহা কর্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক চাঁদা—(ভারতে) আট টাকা বারো আনা, (ভারতের বাহিরে) চৌদ্দ শিলিং। ৯ নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল বুক এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত।

উপরিলিখিত ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ভারতীয় ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব এবং ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি লইয়া প্রতি সংখ্যায় জগতের চিন্তাশীল লেখকগণের দ্বারা আলোচিত হইয়া থাকে।

বর্তমান সংখ্যাটী Winternitz স্মৃতি সংখ্যা। এই সংখ্যার ভূমিকা লিখিয়াছেন ডক্টর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহা ভিন্ন আরও ছাব্বিশটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ পত্রিকার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে।

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা মহাশয় নানা উপায়ে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। এ জন্য তাঁহার নিকট আমাদের বঙ্গভাষা ভাষী মাত্রেই কৃতজ্ঞ থাকিবে।

সম্পাদকীয়

আজ আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে—হিন্দু মুসলমানের বিরোধীতা এটা শুধু বাঙালা দেশকে নয় সমগ্র ভারতবর্ষকে করেছে হীন, ঘৃণ্য। হিন্দু মুসলমানদের ভিতর একটুকুও ভেদ থাকা উচিত নয়। আজ সমগ্র জাতি এদের সাম্প্রদায়িক কলহ দেখছে আর হাসছে। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া—তারা উভয়েই সদর দরজা এবং 'খিড়কী' দরজার ধারে বাস করে তারা উভয়ের ঘরের লোক—প্রতিবাসী। এটা যদি আমরা সকলে একযোগে স্বীকার ক'রে চলায় পথে এগিয়ে যাই তা হ'লে দু'দিনও লাগে না স্বরাজ নিতে। আজ আমরা আমাদের দোষেই নীচ, হীন, বিধ্বস্ত। এরই জন্যে আমাদের দেশে চারিদিকে হাহাকার। মুষ্টিমেয় অন্ন পায় না একগ্লাস জল পায় না।—এজন্য কে দায়ী!

কোটী কোটী লোকের মধ্যে যদি চার পাঁচ জন লোক এগিয়ে যায় এবং বলে আমাদের স্বরাজ দাও—যতক্ষণ না স্বরাজ দেবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের প্রাণপাত কোরব—তাতে শাসকদের কি আসে যায়। যদি পাঁচ সাত জন লোক মরে ত মরুক আমরা তো বেশ আছি বাবা—ব্যাঙ্কের টাকার সুদে দু' বেলা ভাত খাচ্ছি আর সহরের বুকে মটর নিয়ে বেড়াচ্ছি কিন্তু ক'জন?—কে আবার এত সুখ সম্পদ ছেড়ে "দেশের কাজ কর" "স্বরাজ দাও" ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামায়। এই তো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্র মোহন, যতীনদাস দেশের জন্যে প্রাণ বলি দিলেন তাতে—আর আমাদের কী?—আমরা তো ঠিকই আছি কাজ কর্ম্ম করছি আর কোন রকমে জীবনটাকে কাটীয়ে দিচ্ছি—কেন? আমরাও মানুষ আমাদের ভিতরও প্রাণ আছে তবে কেন আমরা আমাদের জীবনটাকে উপভোগ কোরব না—কেন আমাদের ছেলেরা দু' বেলা দু'মুঠো "ডাল ভাত" খেতে পাবে না—সেটা কী আমাদের অধিকারের বাহিরে—ওরে অপগণ্ড মূর্খের দল আজ যদি একযোগে তোদের মায়ের পূজায় নিজেদের বলি দিতে পারিস কালই দেখবি তোদের আর কোন অভাব নেই, দৈন্য নেই, লাঞ্ছনা নেই—তখন হবে সৌন্দর্য্যের বিকাশ—তখন আমাদের জননী আমাদের সহচর্য্যে হবেন দেবী মুক্তহস্তা যখন যা চাইব হাত ভরে দেবেন তবুও তাঁর দান ফুরাবে না—তিনি আমাদের অন্ন পরিবেশন কোরবেন আমাদের প্রত্যেকেরই পাতে তখনই সেটা হবে সুন্দর—তখন তিনি হবেন দেবী—আমরাও তখন সমগ্র জগতের কাছে হেয় হ'য়ে থাকব না—আমরা ফিরে পাব মুখে সম্মান—আমাদের পূর্ব্ব গৌরব ফিরে আসবে—

এস ভাই হিন্দু—মুসলমান, আজ আমরা "মাভৈঃ রবে" একযোগে মাকে ডাকি ও মায়ের সেবায় রত হই—তা হ'লে আমাদের দৈন্য দুর্দশা ঘুচবেই ঘুচবে—সেই হবে আমাদের শান্তি—সেই হবে আমাদের আশা ও ভবিষ্যৎ।

আমরা গভীর শোক সন্তপ্ত চিত্তে জানাইতেছি যে তরুণ শিল্পী কুমারী মনোরমা দত্ত বিগত ১৬ই কার্ত্তিক মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দার্জ্জিলিং মহারাণী হাই স্কুলের জনপ্রিয় ছাত্রী ছিলেন, এবং তাঁহার মেধা ছিল অসাধারণ; স্কুলে প্রত্যেকবার প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। তাঁর পিতামাতা ও ভাইভগ্নিদের সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

অর্চ্চনা

৩৫ বর্ষ } অগ্রহায়ণ—১৩৪৫ { ১০ম সংখ্যা

মৃত্যুর স্বরূপ

শ্রীঋষিদেব রায়

মৃত্যুর স্বরূপ একটা বিরাট রহস্যাবৃত। কেউ একে আহ্বান ক'রে হাসি মুখে বরণ ক'রে নেয়, কেউবা তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। যারা মৃত্যুর ভ্রূকুটীকে স্মিত হাস্যে উপেক্ষা ক'রে বন্ধুভাবে, পুতুল খেলার মত বরণ ক'রে নেয়, তারা প্রকৃতস্থ নয়, একটা সাময়িক উত্তেজনা কিম্বা নৈরাশ্য হ'তেই ঐরূপ পথে পা অগ্রসর ক'রে দেয়। এদের কাককেও বীর আখ্যায় ভূষিত করা চলে, কাকেও বা ব'লেতে হয় কাপুরুষ।

যারা কর্ত্তব্যের জন্য আত্মবলী দেও তাঁরা বীর আর যারা লজ্জা এবং নৈরাশ্য হ'তে আত্মহত্যা করে তাদের মানুষরূপে আগমন হ'য়ে থাকে অভিশাপের প্রভাবে।

যারা লজ্জা এবং নৈরাশ্য থেকে আত্মহত্যা করে তারা প্রকৃতস্থ তো নয়ই; কারণ উপায়ান্তর না দেখে মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়ে তারা নিজেকে মুছে ফেলে পৃথিবীর বুক থেকে। যারা কর্ত্তব্যের মহৎ প্রেরণায় আত্মাহুতি দেয় তাঁরাও প্রকৃতস্থ নয়, কর্ত্তব্যের একটা অসীম অদৃশ্য শক্তি তাঁদের বিভ্রান্ত ক'রে ব্রতী করে মৃত্যু পথের।

স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ পারে না নিজেকে ভূ-উরস থেকে স'রিয়ে নিতে, নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে। মৃত্যু কল্পনায় প্রত্যেকের চোখই বড় হ'য়ে ওঠে, বুক কাঁপে ঢক্ ঢক্ ক'রে। যখন চিন্তা করা যায় মৃত্যুর রূপ হৃদপীণ্ড শূন্য হ'য়ে যায়, উদ্দীপনা, আশা, আকাঙ্খার সামনে স'রে আসে মিশ্ মিশে কালো পর্দ্দা। নৈরাশ্যের সমুদ্র বুকে পাশাপাশি ব'সে সবাই তখন ভাবে; কেন এসেছিলাম পৃথিবীর বুকে, কেনইবা হ'য়েছি মায়ায় বন্দী। সব প'ড়ে থাকবে, আর আমি যাবো ভস্মসাৎ হ'য়ে? উঃ কি ভীষণ পরিণাম! কাজ র'য়েছে কত, কল্পনা ক'রেছি অজস্র, সব ফেলে চ'লে যেতে হবে? না পারবো না, আমি পারবো না বিদায় নিতে পৃথিবী হ'তে। আমার এত সব আমিই থাকবো না? ভস্মিভূত হ'য়ে মিশে যাবো মৃত্তিকায়; আর চিন্তা করা চলে না, মূর্চ্ছনা আসে।

আমার এই সুন্দর পৃথিবী, মনোরম বাড়ী, ঐ স্নিগ্ধ কানন, স্নেহময়ী মাতা, কল্যাণকামী ভাই-ভগিগণ, প্রেমময়ী প্রিয়া, অগণিত বন্ধু-আত্মীয়জন এদের আমায় ছেড়ে যেতে হবে অস্তিত্বহীনে? যে সব গ্রন্থ লিখবো, কার্য্য ক'রবো ব'লে মনস্থ ক'রেছি, সেগুলো থাকবে কল্পনা হ'য়ে, বাস্তবে তাদের প্রকাশ হবে না? মিথ্যা সব! মায়ার বন্ধন আরও জড়িয়ে ফেলে, অন্ধকার আসে ঘনিয়ে। কোন উপায়ান্তর না দেখে অন্তরাত্মা কাঁদে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতে।

এমন যে প্রিয় জীবন। যার অমঙ্গল চিন্তায় মানুষের মন হ'য়ে ওঠে চঞ্চল, তাকে কি কেউ পারে সজ্ঞানে নষ্ট ক'রতে, কক্ষনো নয়। যারা আত্মবলি দেয় কিম্বা আত্মহত্যা করে তাদের অনেকে স্বাভাবিক প্রকৃতস্থ অবস্থায় ও-কাজ করে ব'লে আমরা দেখে থাকি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা নয়, আমরা যখন তাকে দেখি তখন হয়তো তার অবস্থা স্বাভাবিক থাকে কিন্তু কার্য্যক্ষণে তারা প্রকৃতস্থ থাকে না। এখানে তিন শ্রেণীর আত্মবলীর কথা আসে। একশ্রেণী বাধ্য হ'য়ে আত্মবিসর্জ্জন দেয়, আর এক শ্রেণী ভেবে ভেবে শেষে আত্মহত্যা করে, অপর সম্প্রদায় আকস্মিক কারণে নিজেকে মুছে ফেলে।

প্রথম শ্রেণী, সৈনিক সম্প্রদায়, এরা কোন একটা কিছুর প্রভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয়, দ্বিতীয় শ্রেণী সম্ভ্রম রক্ষার কিম্বা আশার পথ খুঁজে না পেয়ে নিজেকে স'রিয়ে নেয়, তৃতীয় সম্প্রদায় আকস্মিক কারণে অর্থাৎ কাকেও রক্ষা ক'রতে অথবা কোন প্রিয়বস্তু উদ্ধার ক'রতে গিয়ে নিজকে বিসর্জ্জন দেয়।

এরা কেউ সজ্ঞানে এমনিভাবে মৃত্যুকে বরণ করে না। সৈনিকগণ দলপতির উৎসাহদীপক কথা, দেশের মঙ্গল এবং আরও দু' একটী কারণে তন্ময় বিভ্রান্ত হ'য়ে নিজেকে ভুলে যায়; স্মৃতিশক্তি, মায়া মমতা থাকে তখন দূরে স'রে, কলের পুতুলের মত সে নিজ্জ্বানে যায় অগ্রসর হ'য়ে মৃত্যুর কোলে। দ্বিতীয় সম্প্রদায়, সামাজিক কারণ, প্রণয়ভঙ্গ, দুঃখ অভিমান এবং নৈরাশ্যের চাপে এরূপ মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয় যে, সূক্ষ্মজ্ঞান নিয়ে নিরিক্ষণ ক'রলে যে কেউ তার ভবিষ্যতের কথা ব'লে দিতে পারে। অবশ্য কোন কোন সময় এরা হঠাৎ ও এরূপ অপ্রকৃতস্থ হ'য়ে পড়ে। তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ স্নেহ কিম্বা সহৃদে বিভ্রান্ত হ'য়ে আত্মোৎসর্গ ক'রে থাকে; কেউ আগুনে পুড়ে ম'রছে, কূপে পতিত হ'চ্ছে, জলে নিমগ্ন হ'চ্ছে—দেখে মস্তিষ্কে আসে একটা প্রবল আলোড়ন, তাতে আত্মবিস্মৃতি হয় এবং সেইক্ষণে তাঁরা কার্য্যে ব্রতী হ'য়ে কৃতকার্য্য হয়, নচেৎ ডুবে যায় অতলের তলে।

মৃত্যুর আর একটা দিক আছে। অনেকেই মনে করেন মৃত্যুটা অত্যন্ত যন্ত্রনাকর। কিন্তু মোটেই তা নয়। মৃত্যুর পূর্ব্বেই যত অস্বস্তি। অদূর আগত মৃত্যুর চিন্তায় মানুষ যত কষ্ট পায়। অজানিতের ভয়ে মৃত্যুমুখী এত সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ে, যার আকার বাইরে পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়; আমরাও তা দেখে অনুভব করি এবং তার কষ্টে সহানুভূতি জানাই। কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উহা শুধু ভয়, সন্ত্রাস ও উপসর্গের অস্বস্তি। অনুভূতি না থাকলে মৃত্যুর স্বরূপ প্রকাশ করা চলে না, তাই মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসা একজন যুবকের ব্যক্ততা এখানে তুলে দিচ্ছি। যুবকটী অকস্মাৎ ভীষণভাবে আহত হয়। আঘাতের দরূণ তার শরীর হ'তে এত রক্তপাত হয় যে ক'লকাতার বড় বড় ডাক্তারগণও তার চিকিৎসা ক'রতে গিয়ে বিচলিত হ'য়ে পড়েন। উপস্থিত হিতৈষী এবং চিকিৎসকগণ প্রতিক্ষা ক'রেছেন তার শেষ নিঃশ্বাসের। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার, 'আহত আর মাত্র তিন মিনিট আছে, ব'লে চ'লে গেলেন। কিন্তু ২।০ মিনিট পরে তার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হ'লো এবং পরে সুস্থ হ'য়ে তিনি আমাদের সাহায্যকর নিম্ন লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন:

আমার সম্মুখে মৃত্যু এলো মালা নিয়ে' অন্ধকার, শুধু ঘন অন্ধকার বিস্তৃত হ'য়ে আছে আমার চতুস্পার্শ্বে। সে অন্ধকারের ব্যাপক আবেষ্টনীতে একা আমি, দৃষ্টিতে এমন কেউ নেই আমাকে আশা দেয়, বাঁচবার আলো দেখায়। প্রথমে মায়া হ'লো জীবনের জন্য। আত্মীয় পরিজনের মূর্ত্তি একে একে ফিল্মের ফিতার মত চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে বা দিকে স'রে যেতে লাগলো; আরও কত মায়া এলো জালের মত পেখম বিস্তার ক'রে; শঙ্কা, ক্রমাগত ঢুকে ঢুকে আশঙ্কার অস্বস্তি আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে তুললো, কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় নেই। যেন কঠিন অর্গলবদ্ধ গুহায় আমি অবস্থিত, কি ক'রে পালাব এই স্থান হ'তে, পথ নেই; কেবল জমাট অন্ধকার।

হঠাৎ বেপরোয়া হ'য়ে গেলাম, তখন মৃত্যু আমার কাছে ভয়ের নয়, নির্ভয় তখন আমি। নিশ্চিন্ত নির্ণয় ক'রে নিলাম মৃত্যুকে ক'রবো বরণ। কোনরূপ ভয়ের এতটুকু রেশ নেই, মুক্ত আমি। অগ্রসর হ'তে লাগলাম সম্মুখের দিকে, আনন্দে ফুল্লিত তখন আমার মন। শান্তির আবেশে ভুলে গেলাম পৃথিবীর কথা, মায়া-মমতা তখন হ'লো মিথ্যা।

দূরে একটা আলো দেখলাম, স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় সে আলো। আশা হ'লো উৎসাহ এলো তার কাছে যাবার। এগিয়ে চ'লেছি, ধপ ক'রে নিবে গেলো। এমন সময় কানে এলো, ডাক্তার ব'লছেন: না আর ভয় নেই, দু' মিনিট পূর্ব্বে রোগীর যে অবস্থা ছিল এখন তা কেটে গেছে।

এই যুবকটীর অনুভূতি দিয়ে বলা যায়: মৃত্যু যতক্ষণ নিকটবর্ত্তী হ'য়ে না আসে তখনি সে ভয়ের, যখন সে আসে তখন তাকে আপনা থেকেই বরন ক'রতে হয়। এতে যন্ত্রনা নেই, আলোড়ন নেই, শুধু শান্তি, ক্লান্তি আছে বটে কিন্তু তা মনমুগ্ধকর রমণীয়।

মিনতি

শ্রীমেঘেন্দ্র লাল রায়

চাঁদের আলো এসে পড়েছে মিনতির ছোট ঘরে। সে যখন অবসর পায় জানলার কাছে বসে চাঁদের আলোতে তার মনকে ছেড়ে দেয়। নানান কথা ভাবে—অতীতের ইতিহাসের পাতা ওল্টায়—আজও সে বসেছে সেই রকমই উদ্দেশ্য নিয়ে—আর ঠিক এই সময়ে পাশের বাড়ী থেকে মেয়েলী-সুরে কে যেন গাইছে: "এমন চাঁদনী রাতে কে গো আসিলে। উজল নয়নে কে গো হাসিলে—।" মিনতি ভাবলে *ঠিক এই রকমই চাঁদিনী রাতে পাঁচ বছর আগে তার বাবার* কাছে বাড়ীর ছাতে এই গান সে গেয়েছিল, বাবা তার কতোই খুশী হয়েছিলেন। আজ তিনি কোথায়? তাদের বাড়ীই বা কোথায়? তার গানই বা গেল কোথায়? মেয়েটীর গান শুনে তার মনে হ'ল গান গেয়েছে ভালই কিন্তু দরদ কৈ? প্রাণে তো একটা আবেগ আনলে না— সে নিজে বোধ হয় এ গান একদিন ঢের ভাল গাইত। কল্পনার রাজ্যে স্মৃতির জোয়ার অনেক দূর তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে—সে কল্পনার স্রোতে বেশ ভেসে চলেছিল কিন্তু এই স্রোত হঠাৎ রুদ্ধ হ'ল মাধবীর প্রবল ডাকে—

সে তাড়াতাড়ি ওপরে ছুটলো—। মাধবী চ'টে দাঁড়িয়ে আছে। মিনতি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে: "কী হয়েছে দিদি—!" মাধবী চ'টে বললে: "কী আবার হবে—আমার মাথা আর মুণ্ডু—নাঃ, আমায় বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে।" মিনতি বললে: "কেন কী হয়েছে বলো না"—মাধবী বললে "তোকে মানা করে দিয়েছি যে এ হারমনিয়াম্ বাজাস নে— কখনো কী এ রকম হারমনিয়াম চোখে দেখেছিস্—গান তুই না করলে বাঁচিস নে না? তোর গান কিছুই হয় না বুঝলি।" মিনতি কাঁদ কাঁদ স্বরে বললে "তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি দিদি, কখনো আর তোমার হারমনিয়াম্ ছোঁব না"—পা ছুঁয়ে সত্যি সত্যিই দিব্যি করলো। মাধবী শান্ত হয়ে বললে: "মা বিশ্বপতিদা' বাইরে আছেন তাড়াতাড়ি এক কাপ চা করে দে।"

মিনতি তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে গিয়ে গরম জল এনে চা-র সরঞ্জাম সব বাইরে নিয়ে গিয়ে চা পেয়ালায় ঢেলে দিল বিশ্বপতির সামনে। বিশ্বপতি তাকে দেখেই বললে: "এসো এসো মিনতি, তুমি আমার কাছে আসো না কেন? আমি বাঘ না ভালুক?" মিনতি করুণ সুরে বললে: "সর্ব্বদাই কাজ করি সময় পাই না—এই নিন্ চা।" বিশ্বপতি হেসে বললে: "চা নিচ্ছি—কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি কেন? বসো না একটু" এই সময় ঝড়ের মতন মাধবীর মা ঘরে প্রবেশ করে বললেন: "মিনতি, এক কাপ চা দিতে কতো দেরী হয়? *পুরুষ মানুষ দেখলে আর নড়তে চায়নে—আর* আমার সঙ্গে অনেক কাজ আছে" বিশ্বপতি অপ্রস্তুত হয়ে বললে: "ওর দোষ নেই—আমিই ওকে আটকে রেখেছিলাম" মাধবীর মা সে কথার আর কোন উত্তর না দিয়ে দমকা হাওয়ার মতন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মিনতিকে নিয়ে। নিজের ঘরে ঢুকেই আবার তিনি আরম্ভ করলেন: "তোকে বলে দিয়েছি দু'বার করে ঘর ঝাঁট দিতে তা' তোর কিছুতেই মনে থাকবে না? আবার সখ কতো, বিশ্বপতির সঙ্গে দুটো রসের কথা বলা চাই, হারমনিয়াম্ বাজাতে ইচ্ছে করে, গান করতে ইচ্ছে হয়—কতো সাধ যায় রে চিতে…" মিনতির চোখ জলে ভরে গেল—কিন্তু তাতেও যে সে নিস্তার পায় না—। মাধবীর মা আবার বললেন: "হারমনিয়াম্ বাজাতে জানিস্ নে—বেসুরো গলা—গান তোর কস্মিন কালে হবে না"—নিশ্চয়ই! যখন তাঁর মেয়ে মাধবী ভাল গান করেন তখন তিনি গান কিছু না বুঝলেও যে যথেষ্ট বোঝেন একথা মেনে নিতে হবে। মাধবীর মা চ'টে বললেন: "আর নেকা কান্না কাঁদতে হবে না, নে শীগগীর ঝাঁটা নিয়ে ঘর ঝাঁট দে।" চোখে জল নিয়ে মিনতি ঘর ঝাঁট দিল। ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ হলে মাধবীর মা বললেন: "কী ময়লা কাপড় পরে থাকিস্—লোকের বাড়ী বি মেথরাণীও তোর চেয়ে পরিষ্কার কাপড় পরে—খুকী তো তোকে কতো শাড়ী দিয়েছে—ও তো তিন দিনের বেশী এক শাড়ী পরে না— নতুনই থাকে—তা সে সব পরা হয় না—দেয়া হয় না? অনু আজ চিঠি লিখেছে এই নে—অনুই তোর মাথা খাচ্ছে"—চিঠি ছুড়ে ফেলে দিলেন।

মিনতি চিঠি কুড়িয়ে নিলো। তার মনে হোল যে অপমানের মাত্রার তীব্রতা আজ এতো বেশী বোধ হয় এই চিঠির জন্যই। মিনতি নিজের ঘরে গিয়ে বার বার চিঠি প'ড়ে তার বুকের মধ্যে চিঠিখানি রেখে দিলে। মিনতির প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো—তার একমাত্র প্রাণের বড় ভাই, তার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা অনাথ চিঠি লিখেছে।

তার মনে হোল যে সে এতই পরাধীন যে তার ভাইয়ের চিঠিও প্রথমে পড়বার তার অধিকার নেই, তার বাবা মার জীবিতাবস্থায় সে যে স্কুলে পড়েনি তা নয়, সে যে সত্যিই একদিন ভালো গান করতে পারতো তাও মিথ্যা কথা নয়, তার চেহারা যে মাধবীর চেয়ে হাজার গুণ ভাল এ কথা কোন বিশ্বনিন্দুকও অস্বীকার করতে পারবে না কিন্তু সব সত্যি হলেও সে গরীব সুতরাং ব্যবহারিক জগতে এ সবই মিথ্যা। তার গরীব নিরাশ্রয় একমাত্র ভাই অনাথকে এম-এ পাশ করতে বাড়ী বন্ধক রাখতে হয়েছিল, মার গহনা সব বিক্রী করতে হয়েছিল অর্থকষ্টে চিকিৎসা অভাবে মা মারা যান। কিছুদিন পর বাপ পৃথিবী হ'তে বিদায় নেন। এম এ পাশ করেও অনাথ ক'লকাতায় অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে কোন চাকুরী পেলে না—শেষকালে টাটানগরে সামান্য মাইনেতে চাকুরী পেলো অডিট ডিপার্টমেণ্টে—সে পত্রে লিখেছে : যদিও তার মাসিক মাইনে পঞ্চাশ টাকা কিন্তু কোয়ার্টার আছে—চাকুরী এখনও পাকা হয় নি, পাকা হ'লে তাকে নিয়ে আসবে।

মিনতি মাঝে মাঝে ভাবে তাকে কেন এত কষ্ট পেতে হয়! এ তো সত্যি কথা, মাধবীর বাবা তার বড় মামা, আপন মামা। সে ভাবতো যে মামা বেঁচে থাকলে হয় তো তার এ কষ্ট হোত না, কিন্তু তার কপালে মামাও থাক্‌লেন না।

আজ মাধবীর বাড়ীতে সঙ্গীতের বিরাট জলসার আয়োজন হয়েছে—মাধবী আজ হারমনিয়াম বাজাবে; গাইবে, আর অন্নপূর্ণা খেমকার নৃত্য হবে—মস্ত জল্‌সা—ঘরের সব স্থানটা কারপেটে আবৃত হয়েছে। মাধবীর বিশেষ বন্ধু সত্যেন সন্ধ্যা থেকে কখন গ্রীন লাইট কখন ইয়োলো লাইট কখন রেড লাইট নাচের সময় ফেলবে এ সব রিহার্সাল দিয়ে ঠিক করে নিয়েছে। মিনতির আজ কাজের অন্ত নেই—চায়ের খাবারের সরঞ্জাম করতে করতে প্রাণ প্রায় বেরোবার জোগাড় হয়েছে; তার ওপরে মাধবী ও মাধবীর মার অসংখ্য ফরমায়েস তামিল করা ও নির্বাকভাবে তাঁদের অকথ্য গালাগালি এবং তিরস্কার সহ্য ক'রতে হচ্ছে।

গানের খুব জমকালো আসর—গান হচ্ছে—মাধবীর গলা মিষ্টি—বেশ সুন্দর গান করে—অন্নপূর্ণা খেমকাও দেখতে সুন্দরী নাচেও ভালো। সুন্দর নাচ হয়েছে। তবে মাধবীর গানই হচ্ছে প্রধান আকর্ষণ। মাধবী দেখতে সুন্দরী—গৌরবর্ণা—দোহারা চেহারা—বেশ লম্বা—তাতে কলেজে এম্ এ পড়ে—বাপ অনেক টাকা গাড়ী বাড়ী রেখে মারা গিয়েছেন সুতরাং কোন চিন্তা নেই। মাধবীই বাপ মার একমাত্র সন্তান—সুগায়িকা। গায়িকা হিসাবে সে সেই দু'চারজন নামজাদা গাইয়ের সুখ্যাতি পেয়েছে, মাধবীর মা অতি চতুরা, তিনি অবিলম্বে সেই খ্যাতি কল্‌কাতায় প্রচার ক'রবার ব্যবস্থা ক'রলেন—নামও হোল খুব—মাধবীর গান রেকর্ডে হু হু করে বিক্রী হচ্ছে—হৈ হৈ ব্যাপার।

মাধবীর গান অন্নপূর্ণা খেমকার নাচ সব শেষ হয়ে গিয়েছে—কিন্তু তখনও গানের আসর ভাঙ্গবার সময় হয়নি—আর আসর তখনও ভাঙ্গবার কোন সম্ভাবনা ছিল না যদি বিখ্যাত গাইয়ে দেবব্রত শর্ম্মা টেলিফোনে না জানাতেন যে তার আজ গাইবার উপায় নেই, কারণ গলা ভাঙ্গা আছে। তাঁর গান রাত নয়টার আগে আরম্ভ করা নাকি তাঁর ওস্তাদের মানা আছে।

বিশ্বপতি নিজে খুবই ভাল গান করে। বিশ্বপতিকে সকলে ধর্‌লে গান করবার জন্য—কিন্তু বিশ্বপতি কিছুতে গাইলেনা। বিশ্বপতি জোর করে টেনে এনে বসালো মিনতিকে হারমনিয়ামের কাছে। মিনতি গাইতে রাজী নয় বিশ্বপতিও নাছোড়বান্দা। সকলেই অবাক্—সে মেয়ে এতোক্ষন নিতান্ত দীনভাবে চা-পান-খাবার সকলকে দিচ্ছিল সে যে গান করতে পারে একথা কেউ এতোক্ষণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করেনি—কিন্তু মিনতি যখন হারমনিয়ামের কাছে এসে আসরের মাঝে ব'স্‌লো সকলেরই দৃষ্টি পড়লো, তখন মিনতির ওপরে, কী সুন্দর তার মুখ, কী সুন্দর বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ, কী নিখুঁৎ তার মুখশ্রী, অযত্ন তাচ্ছিল্য অপমান গঞ্জনা তার উজ্জ্বল গৌরবর্ণকে ম্লান ক'র্‌তে পারেনি। যদিও সে দুঃখী

লাঞ্ছিতা পদাহতা। কিন্তু ভগবান তাকে সৌন্দর্য্যের বিভূতি দান ক'রেছেন। মানুষের কী সাধ্য তাকে হীন করে। রমণীদের মধ্যে সে ব'সলো রাণীর মত—যদিও দুঃখে তার মুখ ম্লান কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তাকে আরো বেশী সুন্দরী মনে হচ্ছিল। মাধবীর মা বা মাধবী বিশ্বপতির এ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন নি। মাধবী তাচ্ছিল্যের হাঁসি হেঁসে মিনতিকে বল্লে: "কী গান করবি?"—মিনতিরও ঠিক ঐ কথাই মনে হয়েছিল—তাই তো, সে কী গান ক'রবে। কতো নূতন গান, সুন্দর সুন্দর সুর দেওয়া গান মাধবী দেড় ঘণ্টা গেয়েছে তারপর তার সেকেলে মান্ধাতার আমলের পুরোনো গান কি এঁদের ভাল লাগ্‌বে—? সে বিশ্বপতিকে ব'ললে, তার গান মনে প'ড়ছে না কিন্তু বিশ্বপতি কিছুতেই ছাড়্‌বে না —মিনতির মনে ভয় হ'তে লাগ্‌লো—সে কতো কাল নিয়মিতভাবে গান করা ছেড়ে দিয়েছে—হারমনিয়ামে বেশী হাত দিতে সাহস হয় না পাছে তার মামীমা বা মাধবী তিরস্কার ক'রেন। যখন বাড়ীতে কেউ থাকে না তখন চুরী ক'রে সে হারমনিয়াম বাজিয়ে কখন কদাচিৎ গান ক'রেছে সত্য কিন্তু তাও ধরা পড়ে গিয়েছে শুধু মামীমা কিংবা মাধবীর কাছে নয় বিশ্বপতির কাছেও। বিশ্বপতি যদি হঠাৎ তার গান না শুনে ফেল্‌তো আজ তার এ বিড়ম্বনা সহ্য করতে হোত না। কী ক'র্‌বে, বাধ্য হয়ে মিনতি ধরলে করুণ সুরে কেদারা আর ছায়ানট মিশিয়ে একগান: "কেন করুণসুরে বীণা বাজিল, সখি আমারি দুয়ারে কেন আসিল নিশি ভোরে যোগী ভিখারী"। রবিবাবুর মান্ধাতার আমলের পুরোনো গান শুনে মাধবী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকিয়ে মুখ টীপে হাস্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লো। মাধবী যখন মুখ টীপে হাঁস্‌ছে তখন অন্য মহিলারাও তদ্রূপ ক'র্‌তে অগ্রসর হ'লেন। এই রকম আসরে যে সব পুরুষ বা মহিলা গান শুনতে আসেন তারা সবাই সঙ্গীত প্রিয় তা নয়; সামাজিকভাবে মেলা মেশা ও তার সঙ্গে গান এই দুই জিনিষই একসঙ্গে পাবেন এই আশা করে আসেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই মাধবীকে সুখী ক'র্‌বার জন্যই এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে যোগ দিয়েছেন।

কিন্তু গান যতো অগ্রসর হ'তে আরম্ভ হোল মাধবীর মুখ টীপে হাঁসবার আর প্রবৃত্তি হোল না। মুখমণ্ডল তার গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়ে উঠ্‌লো, বিশ্বপতির মুখে আনন্দ ফুটে বেরোচ্ছে। ছায়ানট ও কেদারার করুণ সুর যেন গানের কথার মধ্য দিয়ে ঘরের মধ্যে সকলকেই উপস্থিত আচ্ছন্ন করেছে। একজন খুব বড় গাইয়ে সেদিন উপস্থিত ছিলেন সে আসরে। যদিও তার নাম ক'ল্‌কাতার গাইয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়বার এখনও সুযোগ পায়নি তবে একাধারে বড় গাইয়ে পণ্ডিত সমালোচক ও লেখার বিশেষ খ্যাতি থাক্‌বার দরুণ সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর মতামতের দাম ছিল খুব বেশী, গাইয়ে ও শিক্ষিত সমাজে। গান শেষ হওয়ার পর তিনি উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসা ক'রে বলে উঠ্‌লেন: "কেশোরা বাই যে সব তান বহু সাধনা ক'রে গলা থেকে বার করেছে সেই সব তান এঁর গলায় আপনিই বেরোচ্ছে—এতো ভগবানের অনুগ্রহ, অথচ আপনারা এঁকে গান শেখানোর ব্যবস্থা করেন নি—আশ্চর্য্য"। আশ্চর্য্য কিছুই নয়, মিনতি হাজারই ভাল গান ক'র্‌তে পারুক্‌ কিন্তু সে গরীব তার গানের কোন কদর না হওয়া খুবই স্বাভাবিক—। মিনতিকে সকলে আবার গান গাইতে ব'ললে। সে আর গাইলে না। উঠে গেল। মিনতির কাছে আজ হোল মাধবীর বিরাট পরাজয়। গান শেষ হয়ে গিয়েছে—অভ্যাগতেরা সব একে একে চ'লে গিয়েছেন। বিশ্বপতি যায়নি—তাকে মাধবী থেকে ব'লেছে।

বিশ্বপতি মিনতিকে এক পেয়ালা চা দিতে ব'লে ছাতে গিয়েছে। মাধবী তার বেশ পরিবর্ত্তন ক'রতে নিজের ঘরে প্রস্থান করেছে। বিশ্বপতি একলা ব'সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। খানিক পরেই মিনতি অপরাধী মত চা নিয়ে এসে দাঁড়ালো। বিশ্বপতি তার হাত থেকে চা নিয়ে তাকে ব'সতে বললে মিনতি জড়ানো ভাষায় ধীরে ধীরে ব'ল্‌লে: "সে দিন তো শুনেছেন মামীমার কথা—আবার"। বিশ্বপতি ব'ল্‌লে: "কী গানই আজ গেয়েচো মিনতি তোমার গানের করুণসুর যেন আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। সত্যিই তুমি গানের রাণী"। মিনতি চ'লে যাচ্ছিল কিন্তু বিশ্বপতি তাকে ছাড়লে না বুকের কাছে টেনে নিয়ে এলো। মাধবী এসে হঠাৎ এই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত চটে ব'ল্‌লে—"একী"। বিশ্বপতি মিনতিকে ছেড়ে দিয়ে ব'ল্‌লে "বড্ড ভাল গেয়েছে মিনতিকে তাই একটু আদর ক'রছিলাম—তুমি তো একটা

কথাও ব'ল্লে না—এক মুহূর্ত্তে তোমার সব গান ও ভাসিয়ে দিলে ?"

বিশ্বপতি আর মাধবীর বাড়ীতে বড় আসে না। মাধবীর মা ভয়ানক চ'টে গিয়েছেন বিশ্বপতির ওপরে। মিনতির জন্যই এমন ভাল শিকার ফস্কে গেল ? কি দুর্দৈব। মিনতির অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে, কথায় কথায় তাকে কদর্য্য উপহাস ক'রেন মা ও মেয়ে। কেঁদে কেঁদে তার দিন কাটে—দাদাকেও কিছু লিখ্‌তে পারে না কী ভাব্‌বেন তিনি।

মিনতি বিশ্বপতিকে ভালবেসেছে—সে দীর্ঘকাল মামার বাড়ীতে থেকে একদিনের জন্যও কখন একটা মিষ্টি কথা শুনেনি কেবল নির্য্যাতন অপমানই সে পেয়েছে—বিশ্বপতির মধুর ডাক, তার দুঃখে নীরব সহানুভূতি সে কী ক'রে ভুলতে পারে ? সে যে সত্যিকারের বড় গায়িকা তা প্রমাণ করা বিরাট্ মজলিসে একী শুধু সহানুভূতি না ভালবাসা ? মিনতি বিশ্বপতিকে ভালোবেসেছে, কিন্তু বিশ্বপতি কি তার মুখ চেয়ে দেখবে আর ? বিশ্বপতি প্রকাণ্ড বড়লোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবক, মাধবীর সঙ্গে বহুকাল থেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশা মেশা করে, একী হ'তে পারে যে মাধবীকে ছেড়ে সে মিনতিকে বিয়ে করবে ? গান ভাল লাগা এক কথা বিয়ে করা আর এক কথা—তবে সে রাত্রে এমন ক'রে জড়ালো কেন ? হয়তো ভাবের আতিশয্যে সেটা ক্ষণিকেরও হ'তে পারে। এই রকম নানান চিন্তায় তার দিন কাটছে হঠাৎ একদিন সকালে অনাথ এসে উপস্থিত। সে যে কয়বার এসেছে এক একটা কাণ্ড করে গিয়েছে। সেই কারণেই বোধ হয় অনাথকে এ বাড়ীর সকলে ভয় করতো। এবারে এসেও সে এক কাণ্ড ক'রেছে। সে যখন রিক্সতে বসে ভাঙা সুটকেশ কোলের উপর রেখে গেটের মধ্যে ঢুকলো নূতন পশ্চিমে দ্বারোয়ান গোঁফ উঁচু করে একটু বিরক্ত হয়েই দাঁড়ালো—ভাঙা সুটকেশ নিয়ে পায়ে ছেঁড়া স্যাণ্ডাল, গায়ে আধ ময়লা জামা, দাড়ী কামানো নয়, এক পা ধুলো নিয়ে সে যখন রিক্স থেকে নেমে সোজা দোতলার সিঁড়িতে উঠছে, দ্বারোয়ান ইঙ্গিতে অনাথকে ডেকেছে। ঃ অনাথ তার কাছে গিয়ে বললে ঃ "সেটা আমার মামার চাকর দাঁড়িয়ে আছে ?" তারপর চটে বললে ঃ "লে চলো সুটকেস্ বড়া সাহজাদা ধরসে—উল্লুক।" দ্বারোয়ান বকুনি শুনে ভড়কে গিয়ে সেলাম করে সুটকেশ নিয়ে চললো সঙ্গে। অনাথ ওপরে গিয়েই ডাকলো ঃ "খুকী"—তার জলদগম্ভীর স্বর ছিল তার মামার মতন—চেহারায়ও মামার সঙ্গে আশ্চর্য্য রকম সাদৃশ্য ছিল, অতি সুশ্রী বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি। মিনতি ডাক শুনে "দাদা দাদা" বলে কাছে ছুটে এলো।

মাধবী তাড়াতাড়ি এসে অনাথকে প্রণাম করে বল্লে ঃ "দাদা কখন 'এলে"—। মাধবীর মা তাড়াতাড়ি এসে বল্লেন ঃ "বাবা অনু—কি ভাগ্য আমাদের যে পায়েরধুলো পড়ছে তোমার—"। অনাথ মামীমার পায়েরধুলো নিয়ে বল্লে ঃ "মামীমা খুকিকে নিতে এসেছি আজই—আসছে সপ্তায় খুকীর বিয়ে, টাটানগরেই হবে।" বিয়ের কথা শুনে মা ও মেয়ে চম্‌কে উঠলেন। মামীমা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কার সঙ্গে বিয়ে ?" অনাথ হেসে বললে "যার সঙ্গে বিয়ে তিনি তোমাদের খুবই পরিচিত লোক—ভাল কথা তিনি একটা চিঠি দিয়েছেন মাধবীকে।" মামীমা রেগে বললেন ঃ "কে বিশ্বপতি ?" অনাথ চিঠিটা মাধবীর হাতে দিয়ে বল্লে "হ্যাঁ মামীমা।"

চিঠিতে কি লেখা ছিল জানা গেল না—তবে বিশেষ সুবিধের কথা কিছু লেখা ছিল না নিশ্চয়ই, চিঠি প'ড়ে রেগে মাধবী তখনই সেটা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেল্‌লো। মিনতি নির্ব্বাক বিস্ময়ে মাধবীর দিকে তাকিয়ে থাক্‌লো—। অদৃষ্টের কী পরিহাস !

বিবাহ সম্বন্ধে একটী কথা

জি, সি

আমাদের জীবনে যৌন-মিলন কি প্রকার রূপ পরিগ্রহণ করিয়া গভীর ভাবে প্রকাশ পাইতেছে এবং আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি-বিশ্বাসের সহিত এই যৌন-মিলন কোন সম্বন্ধ সূত্রে জড়িত আছে ?—এরূপ প্রশ্ন প্রায়ই উঠিতে দেখা যায়। বিষয়টি এমনই গভীর ও জটিল যে, বিষয়ের গুরুত্বে সকলের মনে ইহার সম্বন্ধে প্রচুর পরিমাণে অস্পষ্টতা থাকিয়া যায় এবং এই জন্যই যৌন-নীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও অদ্ভুত মত প্রত্যহ আমরা শুনিয়া থাকি। ইহার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে ডাঃ যতীশ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'দাম্পত্য বিজ্ঞান-' এ লিখিয়াছেন :—অচির কালের জন্যই হউক অথবা স্থায়ী ভাবেই হউক একাধিক নর-নারীর একত্র বাসের ফলে যে যৌন-মিলনের সৃষ্টি এবং শেষ পর্য্যন্ত সন্তানের জন্মদান ও পালনেই যাহার পরিণতি তাহারই নাম 'বিবাহ' এবং এই ভাবে যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠির রচনা হয় তাহাকে বলে পরিবার। জন্তু অথবা মানুষ যাহারই হোক, বিবাহ এবং পরিবার বলিতে আমরা সাধারণতঃ এইরূপই বুঝি। সুতরাং এই মিলনের স্থিতিকাল ও মিলন-প্রয়াসী ব্যক্তির সংখ্যা সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা থাকা স্বাভাবিক। যাহা হউক সন্তানের মঙ্গল চিন্তার উপর নির্ভর করিয়াই ইহা স্থিরীকৃত হয়। দেখা যায়, কেবলমাত্র মানুষের মধ্যে নহে, উচ্চ শ্রেণীর জন্তুদের মধ্যেও এই যৌন-মিলন নব-জাত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ কালকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান থাকে। অপর পক্ষে অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যেই স্ত্রী এবং পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান হওয়ায় মানুষই হউক অথবা জন্তুই হউক একটিমাত্র স্ত্রী এবং একটি মাত্র পুরুষ হইতেই গোষ্ঠির উদ্ভব,—অর্থাৎ মিলন ব্যাপারে অনেক ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও একনিষ্ঠতাই গোড়ার কথা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে সন্তানকে কেন্দ্র করিয়াই বিবাহের গতি এবং সন্তানের মঙ্গল চিন্তা ব্যতীত বিবাহের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। যে সমস্ত ইতর প্রাণীরা জন্মলাভ করিবার পর হইতেই আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাণ ধারণের ভার আপনিই বহন করিতে সক্ষম তাহাদের পরিবার বলিয়া কিছু নাই এবং বিবাহের প্রয়োজনও তাহারা বোধ করে না।

স্বাভাবিক মনোনয়নবৃত্তি অনুসারে বংশানুক্রমে জন্তুদিগের মধ্যে যে বিবাহ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত আছে এবং নিম্ন শ্রেণীর মানুষের রীতি বা প্রথাকে অবলম্বন করিয়া সভ্যতর সমাজে নৈতিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ প্রভাবে যে বিধি চলিয়া আসিতেছে, সে বিবাহ বিধি সন্তানের উদ্দেশ্যেই। এমন কি সভ্য সমাজেও যে শ্রেণীর মধ্যে বেশীর ভাগ বিবাহ ফলপ্রসূ নহে সেখানেও যাহাতে সন্তানের জন্মলাভ ঘটিতে পারে এই ভাবেই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

এক শ্রেণীর মতবাদী আছেন যাঁহারা জগতের যাবতীয় ঘটনাকে গলাইয়া যেমন করিয়াই হউক তাঁহাদের ব্যক্তিগত মতের ছাঁচে ঢালিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহাদের কর্ম্মকার বৃত্তির হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য বিভিন্ন মতের অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে। কিন্তু স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার প্রায় সমতুল্যতা দেখিয়া আমরা বলিতে পারি যে, উচ্চ শ্রেণীর অনেক প্রাণীদের ন্যায় মানুষের মধ্যেও মোটের উপর ন্যূনাধিক পরিমাণে চিরস্থায়ী একনিষ্ঠতা বিরাজ করিতে চাহে। এই ব্যাপারটির তাৎপর্য্য গভীর অর্থে পূর্ণ। কারণ ইহা হইতেই বুঝিতে হয় যে আমরা একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রেরণা লইয়া আছি। জন্তুদের ন্যায় মানব সমাজেও যৌন সম্বন্ধ বোধ একটি স্বাভাবিক রীতিকে অনুসরণ করিয়া চলে; এই সম্বন্ধবোধ স্বাভাবিকত্বের দুই দিকেই অবিরত দোলা দিতেছে; এবং যে রীতিকে অনুসরণ করিয়া এই দোলা দুলিতেছে তাহা কৃত্রিম, তাহাকে জোর করিয়া স্থাপিত করা হইয়াছে,—এ মতবাদের স্থান কোথাও নাই। জগতের যাবতীয় প্রকৃতি বিরুদ্ধ রীতির যদি উচ্ছেদ সাধন করিতে পারা যায় তবুও যৌন-সম্বন্ধবোধের স্বাভাবিক অনুক্রম বর্ত্তমান কালের মতই স্থূলভাবে বহিয়া যাইবে। সিসেরো (Cicero) বলিয়াছেন, : স্বভাবের চরম অভ্যস্থিতিই ধর্ম্ম। হলব্যাক (Hollbach) এই কথাই অন্যভাবে বলিলেন :—

Art is only Nature acting by the help of the instruments she had herself made.

ইহার পূর্ব্বে সেক্সপীয়র এই সত্যটিই উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন: প্রকৃতির ভাণ্ডারে রস যাহা কিছু দান করিতেছে তাহাই প্রকৃতির রসসৃষ্টি। রীতি ও ধর্ম্ম এই দুই স্তম্ভের জোরেই একনিষ্ঠতা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; একনিষ্ঠতা ইহাদের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে মানুষের প্রয়োজন এবং প্রথার উপরে। এই প্রয়োজন ও প্রথাই একনিষ্ঠতার যথাযোগ্য অনুমোদন। অথবা cope এর মতে মত দিয়া বলা যায়: Marriage is not the creation of law but the law is its creation. crawley তাঁহার আদিম যৌন সম্বন্ধবোধ বিষয়ক গবেষণায় আগাগোড়া কথার উপরেই জোর দিয়া বুঝাইয়াছেন: ধর্ম্ম এবং নীতি একটি সম্বন্ধে বহু লেখক একদা যে রূপ মত পোষণ করিতেন আমাদের বিবাহ পদ্ধতি সে রূপ জোর করিয়া স্বাভাবিক বৃত্তির মুখে একটা লাগাম আঁটিয়া দেওয়া নহে; সৃষ্টির আদিকাল হইতে তরল অবস্থায় যে বৃত্তি আমাদের মনে আশ্রয় লাভ করিয়াছে বিবাহ-পদ্ধতি সেই তরল মতিরই স্থূল দানায় রূপান্তরিত। এ কথা আমাদের বিশ্বাস করিতেই হইবে যে বিবাহের গতানুগতিক পদ্ধতি বা রূপ ইহার এক কণাও মূল্যবৃদ্ধি করিতে পারে নাই, বরং কোন কোন দিক দিয়া এই রূপ পদ্ধতি সমাজের ক্ষতিকর।

একনিষ্ঠতার ভিত্তি যদি এমনি দৃঢ় হয় তাহা হইলে যে বিবাহের পদ্ধতি অনুষ্ঠানকে ক্ষণস্থায়ী ধর্ম্ম ও নৈতিকতার দিক দিয়া বড় করিয়া দেখা হয় না, দেখা হয় পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাবেরও পূর্ব্বেকার এক নিয়মশৃঙ্খলা রূপে, তাহার আসল কোন পরিবর্ত্তন অহেতুক। একনিষ্ঠতা মনোবৃত্তির এক বিচিত্র স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। পারস্পরিক মিলন এবং ঘনিষ্টতা কম হইলে সে অবস্থায় এই মনোবৃত্তি বা প্রেরণাকে নিয়মানুসারে সম্পূর্ণ যথাযোগ্য ভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। মনোবৃত্তির অবস্থান্তর, যাহাকে প্রকৃতিস্থতার দুই দিকের অবশ্যম্ভাবী দোলন বলা হইয়াছে তাহাও স্বাভাবিক কিন্তু যুগল-মিলনই হইবে নিয়ম:

ইহার কারণ প্রদর্শন করিতে Havelock Ellis এর ভাষায় বলিতে হয়:...union in couples must always be the rule because the numbers of the sexs are always approximately equal, while the needs of the emotional life, even apart from the needs of offspring, demand that suchunions based on mutual attraction should be so far as possible permanent

---

শূন্যতার রূপ

—নির্ম্মলা চন্দ

কুমিল্লা সহরের পশ্চিমপ্রান্তে একটা পুকুরের পশ্চিম-দিকে বেশ সাজানো আলগা একখানা বাড়ী। দালানের পূবদিকে বারান্দার দেহঘেঁষে একটা মস্ত প্রসারিত বাগান। চৈত্রের খট্‌ খটে রূপালী রোদ তার সর্ব্বদাহ তেজে ছোট ছোট ফুলগাছগুলাকে রাঙা ক'রে তুলেছে। বড়গাছগুলাও মলিন, শুষ্ক। জনপ্রাণির সাড়াশব্দ নেই, সর্ব্বময় নিস্তব্ধতা। বারান্দার এক কোণে মুখোমুখী দু-খনা কেদারায় দু-জোন মানুষ কথা বলছিল। একটি যুবক—জিতেন্দ্রনাথ, অপরটি তার মাসতুতো বোন স্নিগ্ধা।

জিতেন্দ্র কর্ম্মঠ যুবক, সবটাতেই তরস্ত, সব্যসাচি। পারবোনা একথাটা কেউ তার মুখে শোনেনি কোন দিন। তার এমন কাজ নেই, যে করেনি। সামান্য মারপিট, ডাকাতি হ'তে খুন; অপর দিকে করুণা হতে পরের জন্য আত্মোৎসর্গের সীমা পর্য্যন্ত ছিল তার গতি। টুকরো কথায়, সবই তার দ্বারা সম্ভব হয়েছে। নারী-স্বভাবঃ সশঙ্কঃ কোন দিনই স্নিগ্ধা মনুষ্যতার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্না নয়। তবে মায়া, দয়া, আর স্নেহ-ভক্তিতে জিতেন্দ্রের উপযুক্ত বোন।

অনেকক্ষণ ঘূর্ণিবাতাসের খেলা, ঐছোট কাকগুলোর

আনন্দ স্নান, বুড়ো পাতার ঝরণা প্রভৃতি দেখে স্নিগ্ধা জিতেনকে বললোঃ জিতুদা তোমার এ্যাডভ্যাঞ্চার-লাইফের একটা গল্প বলনা? জিতেন একটু উদাসের সুর টেনে বললোঃ না স্নিগ্ধ, ওসব আর ভাল লাগেনা ভাই, এখন ভাবি কি অন্যায়ই না করেছি জীবন ভ'রে। উঃ কি সে সব মর্ম্মন্তুদ কাণ্ড, ভাবলে আমারই অন্তর শিউরে ওঠে এখন।

স্নিগ্ধা বুঝলো কোন অজ্ঞাত অনুশোচনায় জিতেনের মন এখন করুণ ব্যথায় ভরপুর। এ অবস্থায় উত্তেজক কোন কাহিনী তাঁর কাছে জানিতে চাওয়া শূন্যতা মাত্র। এর চেয়ে একটী করুণ কাহিনী জানবার আশা করাই বাঞ্ছনীয়। এরূপ ভেবে সে বললো ঃ তা হলে একটা করুণ অংশ।

স্নিগ্ধার দিকে জিতেন কিছুক্ষণ একান্ত মনোযোগের সাথে কি যেন দেখে নিয়ে বললো ঃ বেশ বলি, তারপর ক্ষণিক সময় একটু ভেবে নিয়ে বলতে লাগলো ঃ—

সেবার আমরা থার্ড ইয়ারে পড়ি 'শৈলশ্রী হাই'তে আমার রুমমেট ছিল চারু। আমরা তাকে মফঃস্বলের কোন এক বড় জমিদারের ছেলে ব'লে জানতাম। সেও বলত সেকথা, এদিকে তার ব্যয় বাহুল্যেরও পরিচয় দিত ঃ সে বিশিষ্ট অভিজাত বংশের ছেলে। আমাদের সাথে বড় একটা মিশতে চাইত না, কারণ আমরা সাজ সজ্জায় তার আভিজাত্যতার অনেক নিয়ে। আমরাও কেহ বড় তার সাথে মিশতাম না, সে ছিল এত বড় হোষ্টেলে বহু জনবেষ্টিত হয়েও একা। অবশ্য বাইরে তার অনেক বন্ধু ছিল যারা ওর সাথে সমান চালে চলতে পারতো।

একদিন চারুর এক আত্মীয় এলেন। তাঁর কাছে জানতে পারলাম চারু ফাঁকা। জন্ম তার অতি সাধারণ বংশে, দেশের বাড়ীতে তার মা আছেন আর দুটী ভাইবোন। দারিদ্রতার সাথে যথেষ্ট সংগ্রাম ক'রে তাঁরা জীবন রক্ষা করছে। কিছুদিন পরে চারুকে একটু নিভৃতে পেয়ে ব'ললাম ঃ চারুবাবু একটু বুঝে চ'লবেন। এমনি বেদীহীন ভাবে আপনি বেশীদিন আপনার আভিজাত্য রক্ষা ক'রে চলতে পারবেন নি। এক পশলা বৃষ্টির জলেই হয়তো বালুর বাঁধ ধ্বসে যাবে। আমার জীবনে এরূপ অনেক ঘটনাই এসে আবার চলে গেছে। আমাদের কাঠামো দৃঢ় থাকা সত্বেও তিষ্ঠিতে পারি নাই। সেদিন আমার ওপর একটু অসন্তুষ্ট হয়ে চারু কেটে প'ড়ল।

তিন দিন অতীত না হতেই চারুর বাড়ী হতে এক চিঠি এলো ওর ভাই বীরুর ভীষণ অসুখ, শীঘ্র চলে যেতে। চিঠিখানা ছিল কার্ডে, পড়ে আবার বাক্সে রেখে দিলাম। চারু চিঠি পেয়ে একটু বিচলিত হয়েছে ব'লে মনে হ'ল। কিন্তু সেদিন বাড়ী যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। আমি কিছু ফল আর সামান্য শক্তিকর ঔষধ নিয়ে ঢাকা মেলে ফরিদপুরের ছোট্ট একটা পল্লীতে তাদের বাড়ী গেলাম। সেখানে যেয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তা বর্ণনার বাইরে। গ্রামের একধারে নোংরা একটা পল্লী, চারদিক আবর্জ্জনা আর জলায় পরিব্যপ্ত। তারই এক প্রান্তে জীর্ণ একখানা চেলো ঘর চারুর পৈতৃক সম্পত্তি। ঘরে প্রবেশ করতেই দারিদ্রতার চরম দৃশ্য! যা কোনদিন দেখিনি বা কল্পনায় আসেনি। টিনের চালের নীচে ঘুনে কাটা বাঁশের মাচা তার ওপর রাজ্যের যত আবর্জনা সাজান। সেগুলোই আবার এ সংসারের প্রাণবস্তু। ওপাশে একটা মাটির হাঁড়ি আর টুটা ফাটা কয়েকখানা কাঁসা, এনামেল এবং পাথরের বাসন।

মেঝে একখানা হোগলার ওপরে কালো কাপড় পাতা শয্যায় মুমূর্ষু বীরু শুয়ে আছে, এক পাশে শত ছিন্ন বস্ত্রে লোলচর্ম্মা মা, বয়স খুব বেশী হলে আটত্রিশ হ'তে চল্লিশের মধ্যে, কিন্তু দারিদ্রতার নিষ্পেষণে আজ সে বৃদ্ধা। তারই পাশে মলিন ছিন্ন বস্ত্রে আবৃতা একটি মেয়ে, শঙ্কিত চোখে দাঁড়িয়ে কনিষ্ঠের অন্তিমতা নিরীক্ষণ ক'রছে। আমাকে দেখে দুজনেই নিজেদের একটু ঢাকতে চেষ্টা ক'রলেন, কিন্তু সে প্রচেষ্টা নিষ্ফল হলো যার আবরণ নেই সে আবৃত হবে কি দিয়ে? তাদের সঙ্কোচতা অথচ বেশ একটা করুণতা উপলব্ধি করলাম, ব'ললাম ঃ মা, আপনাদের সঙ্কুচিত হবার প্রয়োজন নেই, আমি চারুর বন্ধু আপনার সন্তান, রাণীর ভাই।...ডাক্তারের কথা জিজ্ঞাসা ক'রতেই তাঁরা বললেন ঃ অর্থের অভাবে এ পর্য্যন্ত ডাক্তার আনা হয়নি। ডাক্তার আনার ব্যবস্থা ক'রে বীরুর মুখে ক'লকাতা হতে আনা এক ডোজ ওষুধ ফেলে দিলাম।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্র নাথ

—প্রকাশ সরকার

বিগত ১৯৩৭ সালের নবেম্বর মাস হইতে বাঙলার মনীষীদের ওপর দুষ্ট গ্রহের একটা বিরাট আক্রমণ পরিলক্ষিত, হইতেছে, এবং উহার জন্য দেশবাসী ক্রমেই গভীর চিন্তিত হইয়া পড়িতেছেন। শেষ পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হইবে, তাহা অনুধাবন করাও দুঃসাধ্য।

১৯৩৭ সালের নবেম্বর মাসে ভারতের গৌরব, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানীক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু—এ মরজগৎ হইতে বিদায় নেন, তৎপর দুই মাস অতিবাহিত না হইতেই বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতী ধর্ম্মপ্রাণ আচার্য্য হেরম্ব মৈত্র জগদীশ চন্দ্রকে অনুসরণ করেন। ইহার পর নাট্যকার ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ সতীশ চন্দ্র বাগচী, বিখ্যাত প্রত্নতাত্বিক ডাঃ ননীগোপাল মজুমদার, ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ বিশিষ্ট নেতা এবং মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের সহকর্ম্মী ঢাকার যতীশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙালার জ্যোতিষ্কগণ একে একে আমাদের বন্ধনের অতীত প্রয়াণ করেন। অবশেষে ৩রা ডিসেম্বর শনিবার প্রত্যুষে দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ঋষিকল্প আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও বাঙলা মায়ের রত্নবক্ষের অনেকটা স্থানশূন্য করিয়া অমর্ত্যলোকে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর কলিকাতায় ব্রজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি জেনারেল এসেম্ব্লিস্ ইনষ্টিটিউশনে (স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) ভর্ত্তি হন। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ করিবার পর তিনি জেনারেল এসেম্ব্লিস্ ইনষ্টিটিউশনের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সেই বৎসরেই সিটি কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৫-৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি নাগপুর মরিস কলেজের প্রথমে অধ্যাপক পরে অধ্যক্ষ, ১৮৮৭-৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ এবং ১৮৯৬-১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কুচবিহার হইতে কলিকাতায় আসিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত George V Professor of Philosophy অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মহিশুররাজের আহ্বানে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলরপদে নিযুক্ত হন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনেই মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় একটী শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-তীর্থরূপে পরিণত হয়। শুধু মাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে নহে, মহীশূর রাজ্যের রাজনীতিক্ষেত্রের সংস্কারকার্য্যেও তাঁহার নিপুণ হস্তের চিহ্ন বর্ত্তমান। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মহীশূর গঠনতন্ত্র সংস্কার-সমিতি নিযুক্ত হইলে তিনি উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং গঠনতন্ত্রের নূতন খসড়া প্রস্তুত উপলক্ষে রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়া মহীশূরের মহারাজার নিকট হইতে "রাজতন্ত্রপ্রবীন" উপাধি লাভ করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল স্যার উপাধিতে ভুষিত হন।

বাহিরের জগতে আত্মপ্রচার করিতে ব্রজেন্দ্রনাথ কোনদিনই চেষ্টা করেন নাই। প্রাচীন ঋষিদিগের মূর্ত্ত প্রতীকরূপে তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ সরলতা, প্রজ্ঞা এবং অমায়িকতার দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিতেন। ব্রজেন্দ্রনাথকে অনেকে শুধু দর্শনাচার্য্যরূপে জানেন। বাস্তবিক তাঁহার জ্ঞান মাত্র দর্শনশাস্ত্রেই আবদ্ধ ছিল না, ইংরাজি, সংস্কৃত, অঙ্কশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েই তিনি জ্ঞানের আকরস্বরূপ ছিলেন। এমন কি অতি-আধুনিক বাংলাসাহিত্যের প্রতিটি খুঁটিনাটী পর্য্যন্ত তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি বহুভাষাবিদ ছিলেন। ইংলণ্ড, ইতালী এবং ইউরোপের বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ভূয়োদর্শনেরও অধিকারী হইয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে এক একস্থানে আন্তর্জাতিক মহাসভায় গভীর গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া বিদেশে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

তাঁহার সংসর্গে যাঁহারই ক্ষণকাল আসিবার স্থযোগ হইয়াছে তিনিই কিছু না কিছু নূতন শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছেন। পারিবারিক জীবনে ব্রজেন্দ্রনাথ আদর্শ হিন্দু ছিলেন। নিজে বহু পূর্ব্বেই বিপত্নীক হইয়াছিলেন। একান্নভুক্ত পরিবারের অধীনে থাকিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্দ্রনাথ শীলের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ থাকিতেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের উদ্যোগে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের ৭২তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উপলক্ষে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রচিত যে প্রশস্তি পঠিত হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার প্রতি দেশবাসী কতদূর শ্রদ্ধান্বিত ছিল তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছিল। এখানে আমরা সেই প্রশস্তিটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্দ্ধে উঠেছ
সমুচ্চ মহিমায়
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব
দৃষ্টির সীমায়
সাধনা-শিখর শ্রেণী, যেথায়
গহন গুহা হ'তে
সমুদ্র বাহিনী বার্ত্তা চলিছে
প্রান্তরভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি' যেথা
মায়া কুহেলিকা
ভেদি' উঠে মুক্ত দৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্গ
পড়ে তাহা লিখা
প্রভাতের তমোহরে লিপি,
যেথায় নক্ষত্রলোকে
দেখা দেয় মহাকাল আবর্ত্তিয়া
আলোকে আলোকে
বহ্নি মণ্ডলের জপমালা,
যেথায় উদয়াচলে
আদিত্য বরণ যিনি মর্ত্ত ধরণীর
দিগঞ্চলে
অনাবৃত করি দেন অমর্ত্ত্য রাজ্যের
জাগরণ
তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছাসিয়া—
শোন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্র, হেরিলাম
মহান্ত পুরুষ—
তমিস্রের পার হ'তে তেজোময়,
যেথায় মানুষ—,
শুনে দেববাণী। সহসা পায় সে
দৃষ্টি দীপ্তমান্
দিক্ সীমাপ্রান্তে পায় অসীমের
নূতন সন্ধান।
বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্ব মাঝারের
তপোবনে
সত্যদ্রষ্টা, যেথা যুগ-যুগান্তরে
ধ্যানের গগনে
গূঢ় হতে উৎসারিত জ্যোতিষ্কের
সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে
কল্পনার পটে—
নিত্য-সুন্দরের আমন্ত্রণ। সেথাকার
শুভ্র আলো
বরমাল্যরূপে তব সমুদার
ললাটে বুলালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি, মোরে তুমি
মান বন্ধু বলি'
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর
ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্ব্বাদ, বিদায়কালের
অর্ঘ্য মোর

বাহুতে বাঁধিনু, তব সপ্রেম শ্রদ্ধার
রাখীডোর ॥

ব্রজেন্দ্রনাথের বিদ্যাবত্তার তুলনায় তাঁহার রচিত পুস্তকের সংখ্যা অত্যধিক না হইলেও তাহার প্রত্যেকটিই অসীম জ্ঞানের নিদর্শন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তিনি নিজের জীবনী রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই অমূল্য গ্রন্থখানি "ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট" শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন।

বাঙ্গালোরে অবস্থানকালে তিনি একবার সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হন। কলিকাতায় দ্বিতীয়বার উহা আক্রমণের পরই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হয়। দৃষ্টিহীন অবস্থায়ও তাঁহার জ্ঞানচর্চ্চার বিরতি ছিল না।

স্বপ্ন সঙ্গিনী

শ্রীমহেন্দ্র নাথ

স্বপনের মাঝে জেগে রও তুমি স্বপন সোহাগী মোর,
বাস্তব মাঝে নাহি যেনো বাজে তোমার নূপুর ধ্বনি ;
মাঝে মাঝে তুমি ডাক দিও মোরে পরিচিত প্রিয় নামে,
কায়া হ'য়ে প্রিয়া নাহি দিও ধরা লোলুপ কামনা মাঝে।
দু'টি ফুল তুমি দিও গো ভাসায়ে—অলক বাঁধন হ'তে,
কল্পনা স্রোতে আসিবে হেথায় নিঝুম নিরালা রাতে,
সে' দু'টি কুসুম বুকে রাখি আমি—তোমার ধেয়ানে রত,
নিশুতি রাতের নীরবতা মাঝে পুলকে কাটাবো নিশি।
মেঘের আড়ালে লুকাইয়া তনু নীল-অঞ্জন মাঝে
ইসারায় তুমি ডাকিয়ো আমারে ছায়া পথ বিহারিণী ;
ডাক শুনি' আমি রহিবো তাকা'য়ে মুগ্ধ কুরঙ্গ সম,
অসীমার মায়া টানিবে আমারে শুধু অসীমের পানে।
তোমার বেণীর উড়ে পরা চুল চুমিয়া আঁখির পাতা
অজানা মায়ার গানে গানে মোরে করিবে তন্দ্রাহত ;
তারপর তুমি ভুজ বন্ধনে—টাক সীঁথি পরা বধূ,—
বাঁধিয়া আমারে খেলিয়ো যতনে শুধু ছিনিমিনি খেলা।

মানসিক দুর্ঘটনা

শ্রীসুবোধ চন্দ্র সিংহ

গভীর রাত্রিতে রূপালী ঘরের বাহির হইয়া আসিল। পোর্টিকো হইতে গেট পর্য্যন্ত লাল কাঁকড় বিছানো। চলিলে পায়ের শব্দ হইতে পারে ভাবিয়া জুতাজোড়া খুলিয়া নিঃশব্দে কাঁকড়ের রাস্তা দিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইল। তবু শব্দ হইতেছে। কাঁকড়গুলি সময় বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। সে একবার থামিল। চারদিক অন্ধকার। বোধ হয় আজ অমাবস্যা, কারণ আকাশে চাঁদ নাই। রাস্তার দুইপাশে বাগানের গাছগুলি অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া আছে। হেনাহেনার তীব্র গন্ধে বাগানটা আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

হঠাৎ মনে হইল তাহার দেবর জ্যোতিষ ঘুম না হইলে উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া সিগেরেট খায়। মনে হইতেই তাহার বড় ভয় হইল। শরীর আড়ষ্ট হইয়া গেল। উপরের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, না,—খুব সম্ভব কেহ নাই; ঘরেও আলো জ্বলিতেছে না, বোধ হয় সকলেই ঘুমাইতেছে।

রূপালী গেটের বাহিরে আসিয়া চারিদিকে চাহিল। প্রশান্ত অন্ধকারে এতক্ষণ কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল, সে নিঃশব্দে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কেহ কোন কথা কহিল না। রূপালী জুতা পরিয়া পিচের রাস্তায় নামিয়া তাহার সঙ্গে উত্তর দিকে অগ্রসর হইল। সামাজিক স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছচারিতার উপর বিতৃষ্ণা এবং বিদ্রোহের ভাব রূপালীর চাপা ঠোঁটে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রশান্তর চোখ বাঞ্ছিতাকে অধিকার করিবার আনন্দে উজ্জ্বল।

খানিকক্ষণ হাঁটিবার পর রূপালীই প্রথম কথা কহিল, আচ্ছা প্রশান্ত, তোমার কি মনে হয় আমার জন্যে চিরদিন তোমার এই আগ্রহ থাকবে?

কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া প্রশান্ত বলিল,—সমস্ত জীবন দিয়ে যা প্রমাণ করতে হবে আজকের মুখের কথায় তা তুমি বিশ্বাস করবে কি করে?

রূপালী গম্ভীরভাবে বলিল,—বিশ্বাস করি না। সমস্ত জীবন দিয়ে তুমি কি প্রমাণ করবে তা জানি। পুরুষকে বিশ্বাস করতে আর প্রবৃত্তি হয় না। তুমি ত আমার স্বামীরই জাত!

প্রশান্ত তাহার কথার কোন জবাব দিল না। যদিও পুরুষ সম্বন্ধে রূপালীর এই সিদ্ধান্তের মূলে পিতার দ্বিতীয়বার বিবাহের ইতিহাস এবং স্বামীর নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই ছিল না তবু প্রশান্তর জীবনেও তাহার কথা কয়টী যেন অজানিতভাবে ব্যঙ্গ করিয়া গেল।

সেও ত রূপালীর সঙ্গে স্বামীস্ত্রীভাবে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়া গৃহ ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছে? প্রশান্তরও স্ত্রী ছিল। রূপালী কি তবে তার…ভাবিতেও তাহার বড় কষ্ট বোধ হইল।

রূপালীর বাপের সঙ্গে তার প্রভেদ কি কিছু নাই? কী প্রভেদ সে বুঝিতে পারিল না অথচ একটা মস্তবড় প্রভেদ আছে তাহা গভীরভাবে অনুভব করিল।

গড়িয়াহাটা ও রাসবিহারী এভিনিউয়ের মোড়ে কোন গাড়ী নাই? প্রশান্ত এদিক ওদিক চাহিল, নিদেন পক্ষে একটা রিক্সা হইলেও চলিত,—কিন্তু কোথাও কিছু না দেখিয়া সে যেন একটু লজ্জিত হইল। একটা গাড়ী ঘোড়ার কোন বন্দোবস্ত না করিয়া একটী অল্পবয়স্কা সুন্দরী মেয়েকে লইয়া শীতের রাত্রিতে পায়ে হাঁটিয়া চলা যেমন বিপদজনক তেমনই বিসদৃশ্য।

রাস্তার দুইধারের দোকানপাট সব বন্ধ। সহরের এইদিকটার লোক চলাচল সামান্য একটু রাত হইলেই থামিয়া যায়। নিস্তব্ধ রাস্তার উপরে এই দুইটী পলাতক নরনারীর মৃদু পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন আভাস নাই। সমস্তই প্রাণহীন ও নিঝুম্।

প্রশান্ত বলিল,—তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে রূপালী। আর একটু হেঁটে যেতে হবে; ফাঁড়ির কাছে গাড়ীর আড্ডা আছে।

রূপালী হাসিল। কিন্তু তা যেন হাসিই নয় কান্নারই একটা রূপান্তর।

কহিল,—কষ্ট হচ্ছে, খুবই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তা হেঁটে চলার জন্যে নয়। সংসারকে ছেড়ে যাচ্ছি, আর ছোট-ভাইকে আর দেখতে পাবনা বলে'।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার ভাইয়ের বয়স কত হল ?

বয়স অনুধাবন করিতে গিয়া রূপালীর চক্ষে তার ছোট ভাইয়ের চঞ্চল এবং উদ্দাম মুখখানির কথা মনে পড়িয়া গেল। সে এখন কি করিতেছে ? নিশ্চয়ই ঘুমাইতেছে। কিন্তু কার কাছে এই মাতৃহীন শিশু শুইয়া আছে ? বাবার কাছে বোধ হয় তাহার আর স্থান নাই। তবে কি সে একা !

রূপালী শিহরিয়া উঠিল। রাস্তার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল সমস্ত পৃথিবী যেন অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে। কহিল,—মা যখন মারা যান তখন ওর বয়েস পাঁচ,—এই আশ্বিনে এগারোয় পড়েছে।

কিছু একটা কথা বলিবার জন্যই প্রশান্ত বলিয়া ফেলিল, এতদিন পরে তোমার বাবা আবার বিয়ে করলেন কেন ? কথাটা বলিয়াই প্রশান্ত অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া গেল। বোধ হয় তাহার এই অসময়োচিত অভদ্র প্রশ্ন রূপালীকে রূঢ়ভাবে আঘাত করিতে পারে। তা ছাড়া নিজের জন্যও তাহার বড় লজ্জা হইল। এ প্রশ্ন করিবার অধিকার সেও তো সেই মুহূর্ত্তেই হারাইয়াছে যে মুহূর্ত্তে রূপালীকে লইয়া প্রশান্ত ঘরের বাহির হইয়া আসিল।—সেও বিপত্নীক !

রূপালী প্রশান্তর কথার কোন উত্তর দিল না। তাহার চোখের তারা মরুভূমির মত শুষ্ক,—খাঁ খাঁ করিতেছে বটে, কিন্তু মনে ভিতরে অশ্রুপ্লাবনের যেন বিরাম নাই। কেন বিবাহ করিলেন ? কি তাহার প্রয়োজন ছিল ?

হায়রে মানুষের মন ! যাহাকে একদিন সন্ন্যাসী ভাবিতে আনন্দ হইয়াছিল আজ তাহাকে গৃহী ভাবিতেও এত কষ্ট হইতেছে কেন ?

একটা ফিটন মিলিল। প্রশান্ত ও রূপালী পাশাপাশি বসিল। প্রশান্ত ভাড়া লইয়া কোন দর দাম করিল না। গাড়োয়ান যা বলিল তাহাতেই রাজি হইয়া গেল। হুকুমের অপেক্ষা না করিয়াই গাড়োয়ান গাড়ীর হুড্ তুলিয়া দিল। চারিপাশ পরদা দিয়া ঢাকিতে যাইতেছিল রূপালী নিষেধ করিল। তাহারা হাওড়া ষ্টেশনে যাইবে। গাড়ী সেই দিকে অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল।

গাড়োয়ানের সন্দেহ দেখিয়া প্রশান্ত বড়ই বিব্রত হইয়া গেল। রূপালী না জানি কী মনে করিল। কিন্তু রূপালী তখন চোখ বুঁজিয়া গদিতে হেলান দিয়া বসিয়াছিল। রূপালী তাহার অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে। আজ কেন সে প্রশান্তকে অবলম্বন করিয়া নিজের অকলঙ্ক চরিত্রে চিরদিনের জন্য অপযশ অর্জ্জন করিয়া নামগোত্রহীন পথে বাহির হইল ?

তাহার জীবন যাত্রার আমূল পরিবর্ত্তন হইল অতসীকে কেন্দ্র করিয়া—সে কথা ভাবিতেও তাহার সঙ্কোচ বোধ হয়। শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া অতসীর সঙ্গে তাহার আলাপ হইয়াছিল। সে পাশের বাড়ীতেই থাকিত। এত আলাপ হইয়া গেল যে অবসর হইলেই তাহারা পাশাপাশি ছুইছাদে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিত অতসীর তখনও বিবাহ হয় নাই অথচ বয়সে অন্ততঃ তিন চার বছরের বড় রং তত্তো ফর্সা না চেহারাও তেমন ভাল নয় কিন্তু ভারি মিশুক। দুইজনের বয়স, অবস্থা, প্রকৃতি এবং অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিপরীত কিন্তু তবু তাহাদের মধ্যে একটা সহজ বন্ধুত্ব হইল। অতসীর সঙ্গে সত্যই রূপালীর খুব ভাব ছিল এখন মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ। কেন এমন হইল—? যেন লঘু একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে রূপালী এতক্ষণ দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল। হঠাৎ সেই তন্দ্রা হইতে রূপালী জাগিয়া উঠিয়া প্রশান্তর মুখের দিকে চাহিল। দুঃস্বপ্নের ঘোর যেন তখনও কাটে নাই। সে প্রশান্তকে কহিল,—আচ্ছা, তুমি অতসীকে চিনতে ?

প্রশান্ত জবাব দিল,—হ্যাঁ, দেখেছি, চিনি।

রূপালী ঘাড় নাড়িল,...হুঁ, সবাই তাকে চেনে।

যখন বন্ধুত্ব ছিল তখনই সে লক্ষ্য করিয়াছে অতসীকে সকলেই বড় বেশী চেনে। এমন কি তার স্বামীও। এ জিনিষটা রূপালীর ভাল লাগে নাই।

একদিন বলিয়াছিল,—তোমাকে সব্বাই এত চেনে কেমন করে ভাই ?

অতসী বলিয়াছিল,—ভালবাসে বোধ হয়। তোমার কি মনে হয় ?

অতসী বড় ঠোঁটকাটা। মুখে কিছু আটকায় না।

রূপালী ঠাট্টা করিত কিন্তু অতসী সে ঠাট্টা আমলই দিত না। যখন রাগ করিয়া কথা বন্ধ করিত তখন সে ছড়া কাটিত,—যাচ্ছেতাই গান গুণ গুণ করিয়া গাহিত।

রূপালী বলিত,—সবাইকে তোমার প্রসাদ বিলি করে এমন অন্নছত্র খুল্‌লে, পরে একটী মানুষের জন্যে যে কিছুই অবশিষ্ট থাক্‌বে না!

অতসী বলিত,—কিছুই নাই কিনা তাই কিছুতেই ফুরাবে না; থাক্‌লে চুদিনেই ফুরিয়ে যেতো।

যে উত্তেজনা ও আগ্রহ লইয়া প্রশান্ত গভীর রাত্রিতে রূপালীকে লইয়া পলায়ন করিতে আসিয়াছিল এখন ক্রমেই তাহা যেন নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। একদিনের ঘটনা তাহার মনে পড়িল। সেই দিনের ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাহার মনে আজ কেবলই প্রশ্ন জাগিতে লাগিল, রূপালী সত্যই তাহাকে ভালবাসে? যে মুহূর্ত্তে রূপালীর ভালবাসাতে তাহার সন্দেহ জন্মিল সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার সমস্ত জীবন যেন বিস্বাদ হইয়া গেল।

রূপালী গৃহত্যাগ করিল কেন?

একদিনের ঘটনা তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। জানালার ধারে রূপালী সেদিন বসিয়াছিল। চোখের পাতা ফোলা ফোলা, যেন এইমাত্র কাঁদিয়া উঠিয়াছে। রূপালীর স্বামী সেইঘরে আয়নার সামনে মুখ বিকৃত করিয়া টাই বাঁধিতেছিল। প্রশান্ত ঘরে গিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিল। প্রথমেই তাহার বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, রূপালী আজ বুঝি খুব বেলা অব্‌দি ঘুমিয়েছে, চোখের পাতা ফুলে গিয়েছে! এ যে ঘুমের জন্যে নয় প্রশান্ত তা বোঝে। এর ভিতরে কি ব্যথা প্রচ্ছন্নভাবে আছে সেই কথাটা জানিবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে কথা চাপা দিয়া প্রশান্ত মিষ্টার মুখার্জ্জিকে বলিল,—বেরুচ্ছেন নাকি? মুখার্জ্জির বিকৃত মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল। বোধ হয় অদম্য আনন্দ দমন করিবার জন্যই সে মুখের ভাব এমন অদ্ভুত করিয়াছিল। মনে হয় যে কোন মুহূর্ত্তে সেই চাপা হাসি প্রকাশ্যে সশব্দে ফাটিয়া পড়িবে।

তাহার মধ্যে একটা প্রবৃত্তি আছে যা নিষ্ঠুর, নৃশংস এবং আত্মসর্ব্বস্ব,—সেই প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির কাছে স্ত্রীর সম্মান, তাহার সুখদুঃখ, সংস্কার ও অনুভূতি নির্ব্বিচারে অতি তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। অথচ মুখার্জ্জি লোক খারাপ নয়। বরং সমাজে জনপ্রিয় বলিয়া তাহার বেশ খ্যাতি আছে। বহু বন্ধুবান্ধবের মধ্যে তার অধিকাংশ সময় বণ্টন করিতে হয় বলিয়া স্ত্রীর জন্য বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তবু সে স্ত্রীকে ভালবাসে—তার সেই ভালবাসার ভঙ্গী তার একান্ত নিজস্ব ধরণের। সমস্ত মানুষের হইয়াছে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে তার একান্ত নিজস্ব ধরণের। সমস্ত মানুষের উপরে তার বিদ্রূপ, অবজ্ঞা, ও তাচ্ছিল্যের ভাব দাম্পত্যজীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে তার আন্তরিকতার অভাব নাই।

মুখার্জ্জি বলিল,—একটা সুখবর আছে প্রশান্ত!

প্রশান্ত রূপালীর আহত চক্ষুর দিকে চাহিল। তাহার চোখের মিনতি বারংবার স্বামীর বিদ্রূপের অসমর্থন করিতেছিল।

তবু মুখার্জ্জি বলিল,—শ্বশুরমশায় বিয়ে করেছেন, শুনেছ?

প্রশান্ত হাঁ না কিছুই বলিল না। যে চক্ষু মিনতি করিয়াও পরাজিত হইল সে চোখের জল আর বাঁধন মানিল না।

মুখার্জ্জি বলিল,—তাই শাশুড়ীঠাকুরণকে প্রণাম করতে যাচ্ছি।

প্রশান্ত বলিল,—কোথায় তিনি?

মুখার্জ্জি মুচকি হাসিয়া অর্থপূর্ণভাবে বলিল,—তুমি চিন্‌বে না—আমাদের পাশের বাড়ীর একটী বাইশবছরের মেয়ে!

মুখার্জ্জি বলিল,—হ্যা গো হা—শ্রীমতী অতসী—

সে সত্যসত্যই বাহির হইয়া গেল। অনেকক্ষণ তাহারা কোন কথা বলিল না সান্ত্বনা দিবার কিছু নাই বলিয়া প্রশান্ত উঠিবার জন্য উস্‌খুস্ করিতেছিল। হঠাৎ রূপালীর অশ্রু-বিকৃত ভার ভার কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রশান্ত চমকিয়া উঠিল।

রূপালী বলিল,—একটা কথা আছে প্রশান্ত।

প্রশান্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—কি?

রূপালী যেন কিছু উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল,—যে আমার মুখের দিকে চাইল না, যে আমার মনকে অবজ্ঞা

করতেই ভালবাসে, যে আমাকে আঘাত দিয়েই আনন্দ পায় তাকে আমি অন্তরের সঙ্গে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না। আমিও আঘাত দিতে জানি, আমিও অবজ্ঞা করতে পারি, আমি এদের মুখে চুনকালি দিতে পারি, সেই কথাই জানিয়ে দিতে চাই।

প্রশান্ত বলিল,—তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না রূপালী,—তুমি আজ বড় চঞ্চল হয়েছ।

রূপালী বলিল,—না, এই অপমান ভুলবার অবসর দেবো না,—প্রতিমুহূর্ত্তেই দুর্ব্বলতা আসবে তখন আর কিছুই হবে না। আমি এদের সংসার ছেড়ে চলে যেতে চাই—তুমি আমাকে সাহায্য করবে।

রূপালী প্রশান্তর সাহায্য চায়। যাহা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কেবলমাত্র সাময়িক বিদ্রোহ এবং পিতার প্রতি সন্তানের অভিমান মাত্র, প্রশান্তর নিকট সেদিন তাহাই অনাহুত প্রেম বলিয়া কি করিয়া মনে হইল?

রূপালী বিশেষ করিয়া তাহারই সাহায্য চাহিল কেন? পৃথিবীতে আর কি লোক ছিল না?

রূপালী তাহাকে কী বলিতে চাহিল? প্রশান্ত মনের ভিতরে সেদিন কী গ্রহণ করিল? পরামর্শ করিল তাহারা পলায়ন করিবে। রূপালী অথবা প্রশান্ত কেহই এই অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বলিয়াই তাহাদের মানসিক গতি অত্যন্ত অসাবধানে একটা বিপদ সঙ্কুল সঙ্কীর্ণ পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইল।

গাড়ী তখন ধর্ম্মতলা দিয়া অত্যন্ত মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। কচিৎ জনবিরল পথ দিয়া দুই একটা মোটর গাড়ী হুস্ করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। ল্যাম্প পোষ্টের চারিদিকে শীতকালের বিবর্ণ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া স্থির হইয়া আছে। পিচের মসৃণ রাস্তায় ট্রাম লাইনের লোহার রেলের উপরে আলো পড়িয়া মাঝে মাঝে ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছে। কলিকাতা যেন দুরন্ত শিশুর মত সারাদিনের ছুটোপাটীতে ক্লান্ত হইয়া এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

রূপালী বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইল। হিমের রাত্রিতে গাল দুইটা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা গরম হইয়া গিয়াছিল। এখন একটু একটু করিয়া মাথার ভিতরটা শীতল হইতেছে বলিয়া মনে হইল।

প্রশান্তকে বলিল,—বিয়ের পর যখন অতসীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হ'ল তখন কেন জানিনা তার সিঁথির সিঁদুর দেখে আমার প্রথমেই মনে হ'ল এ আমার সেই স্নেহের ভাইয়ের বুকের রক্ত! বুকের মধ্যে যে কি রকম করে উঠল প্রশান্ত! সে আমি জানি, ভগবান জানেন! আমার মুখ দেখে সে কী বুঝতে পেরেছিল সেদিন জানিনা কিন্তু বলেছিল, 'রূপালী মেয়েদের কোন মত নেই, আমাকে তুমি দোষ দিও না। তার দিকে চেয়ে সেদিন সমস্ত নারী জাতির অসহায় ভাবটা চোখে ভেসে উঠেছিল প্রশান্ত!

প্রশান্ত বলিল,—যে সুখী হয়নি মনের মধ্যে তা অনুভব করতে পারি। কিন্তু সুখের অন্বেষণে বেরিয়ে আমরাই কি সুখী হতে পেরেছি?

রূপালী বলিল,—আমাদের দুজনার দুঃখ দুজনকে মিলিত করেছে। আমি তোমার দুঃখকে শ্রদ্ধা করি তুমিও তাই। সুখের জন্য তো বেরোইনি! সুখ কোথায়?

প্রশান্ত বলিল,—তুমি অপমানিত, লাঞ্ছিত, তুমি বিদ্রোহ করেছ!

রূপালী বলিল,—তোমার বিদ্রোহ অদৃষ্টের উপরে। তুমি স্ত্রীকে হারিয়েছ অল্পদিনের পরিচয়ে। তাকে তুমি শ্রদ্ধা করো, ভালবাস, কিন্তু বুভুক্ষু মনকে সান্ত্বনা দেবে কি দিয়ে? সংসার অতি অল্প বয়েসে তোমার শান্তি নিয়েছে কেড়ে, অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে তোমার বুকে, সারা জীবনে তোমার আর শান্তি নেই! তাই তুমি চলেছ আগুনের রাস্তায়, পা পুড়ে যাচ্ছে তবু ভাল লাগছে, বুক ভেঙ্গে পড়ছে তবু তোমার শান্তি নেই! শান্তিময় সংসার নেই বলে তুমিও দুঃখকে বরণ করেছ!

কে যেন প্রশান্তর মনে একটী অতি নিভৃত আগারে আচম্বিতে প্রবেশ করিল। সত্যই ত! সে যেন এইরকমের কথাই বহুদিন ভাবিয়াছে,—অথচ ভাষা দিতে পারে নাই! সেই জন্যই রূপালীর এই কথা কয়টী যেন একটা নূতন বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল। তাহার সারা মন একটা বহু পুরাতন এবং বহু পরিচিত অনুভূতি স্পর্শে যেন রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাহার স্ত্রীর মৃত্যুর কথা মনে পড়িল, যেন এই সেইদিন সে মারা গেছে। মরণের সময় সূর্য্যাস্তের আলো আসিয়া সেই চির বিরহীর মুখের বার্ত্তা চিরদিনের জন্য হরণ করিয়া লইয়া গেল। দিনের সেই শেষ আলোককে সে আজও ক্ষমা করিতে পারে নাই,—আর ক্ষমা করিতে পারে নাই মানুষকে—যারা তাহার স্ত্রীকে অবলীলাক্রমে ভুলিতে পারিল।

প্রশান্ত দুই হাত দিয়া তাহার চোখ দুইটী ঢাকিয়া চুপ করিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে বলিল,—স্ত্রীর মৃত্যুর পরে আমার মনে যে বেদনা, যে শোক তীব্র হয়ে উঠেছিল সংসারের চারপাশে তারই একটা প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়ে এক রকমের একটা সান্ত্বনা সেদিন পেয়েছিলাম। এখনও সেই ঝড় মনের ভেতর রয়ে গেছে কিন্তু বাইরের বিস্মৃত মানুষের মধ্যে আর সে অভিযোগ নেই রূপালী! আমি এই শান্ত সংসারে কি করে বাস করি?

রূপালী বলিল,—সৃষ্টি প্রথমে গোটা পৃথিবীটা যখন একটা আগুনের গোলা ছিল তখন অগ্ন্যুৎপাত হ'ত না,—তার প্রয়োজনও ছিল না। এখন সেই পৃথিবীর উপরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে,—তাতে এখন চির বসন্তের উৎসব চলেছে—কিন্তু ভেতরটা ত' এখনও জ্বলে পুড়ে মরছে—সেই বেদনা একা বহন করা যখন তার দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে তখন সে কিছু কিছু গলিত আগুন এই শান্ত পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিতে চায়!

প্রশান্ত বলিল,—সত্যিই রূপালী তুমি ঠিকই বলেছ। আমি লক্ষ্মীছাড়া হয়েছি, তাই আমি ভালবাসি নষ্ট নীড়, ভালবাসি বেদনা, আকাঙ্ক্ষা করি দুঃখময় জীবন—আরো দুঃখময় জীবন। চাই অন্যকে দুঃখ দিতে—চাই ভেঙ্গে ফেলতে তাদের সুখের ঘর—অন্যের সুখ আমার ভাল লাগে না। তোমার সুখও আমার ভাল লাগেনি। আমি যে দুঃখ সহ্য করেছি মানুষের যেন সে দুঃখ সে দুর্দ্দশা না হয়,—হয়ত এই কথাই আমার বলা উচিত ছিল,—কিন্তু মন বলে আমি যে দুঃখ পেয়েছি—সমস্ত পৃথিবীর মানুষও সেই দুঃখ ভোগ করুক! আমার বুকে যে রক্ত ঝরছে তোমাদের চোখে তার ছায়া একটুও লাগুক না! একটু আগে ভেবেছিলাম তোমাকে আমি ভালবাসি কিন্তু তা নয় রূপালী, আমি আর এই জীবনকে ভালবাসি না, আমি এই শান্ত পৃথিবী থেকে অব্যাহতি চাই। যে সংসার তাকে ভুলে গেল,—যাকে ছাড়া এক মুহূর্ত্তও কাটবে না মনে হয়েছিল—তাদের মুখে আজ আবার আনন্দ উঠেছে ফুটে। দীর্ঘজীবি হোক্ তাদের আনন্দ, তাদের সুখ। আমি জানি,—জানি রূপালী তোমার সঙ্গে বেরিয়ে আসার কী পরিণাম। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে চূর্ণ হবার যে আনন্দ,—তাই আজ আমাকে উন্মাদ করেছে।

রূপালী বলিল,—বুঝেছি,—তোমার কথাটা আরও স্পষ্ট করে বলা যায়। যতক্ষণ নদীর জল অল্প থাকে ততক্ষণ সে তার গণ্ডিবদ্ধ দু'কূলের মাঝখান দিয়ে বয়ে যেতে ভালবাসে। সে তখন গৃহি, একটা ধরাবাঁধা নিয়মের ভেতরে চলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু যখন আসে বর্ষার প্লাবন—ঘোলা হয়ে যায় সেই জল, তার গতি উদ্দাম, বেগ দুর্ণিবার,—দু'কূল ছাপিয়ে ওঠে,—কখনো সবুজ ধানের ক্ষেত ভাঙ্গে; কখনো গভীর রাত্রিতে স্বামী বক্ষ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তার স্ত্রী—! ঘর ভাঙ্গে—সংসার ধ্বসে পড়ে যায়।

প্রশান্ত বলিল,—তোমার রূপকের শেষ দিকটা নিতান্তই ব্যক্তিগত হয়ে গেছে। কথাটা যখন ব্যক্তিগত হয়েই পড়ল তখন একটা প্রশ্নের জবাব তোমাকে দিতে হবে রূপালী।

রূপালী বলিল,—কি?

প্রশান্ত রূপালীর প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। বাহিরে আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে সেইদিকে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল। চাহিয়া দেখিল বাহিরের জগতে একটা পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে—ধীরে ধীরে যে অচেতন হইতে চেতনার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার মনেও যেন একটা কিসের আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে—সেখানেও একটা পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে।

ভিস্তিওয়ালারা রাস্তায় জল দিতেছে। অন্ধকার আকাশের তারাগুলি ম্লান হইয়া যাইতেছে। প্রশান্তর বড় সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। বোধ হয় ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই ভোর হইয়া যাইবে। রূপালীর স্বামী ঘুম হইতে উঠিয়া রূপালীকে খুঁজিবে, তাহার দাদামশায় প্রশান্তকে না দেখিতে পাইয়া বাড়ীতে হৈ চৈ করিতে থাকিবেন।

খানিকক্ষণ পরে দুইপক্ষ নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে তাহারা গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

তাহার ভিতরে যে একটা ভদ্রসংস্কার আছে—যাহার পরিচয় রাত্রির গভীরতা মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল—রাত্রি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন নিদারুণ বেদনা লইয়া একটা দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল।

প্রশান্ত মনে করিল সে ফিরিয়া যাইবে।

রূপালীর দিকে চাহিল। সে তাহার প্রশ্নের জবাবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রূপালী এইমাত্র বলিয়াছে যে তাহারা পলায়ন করিয়াছে ভালবাসে বলিয়া নয়। হয়ত আর কিছুক্ষণ পরে রূপালীও ফিরিয়া যাইতে চাহিবে। সেও আবার অনুরক্ত স্ত্রী হইতে চাহিবে। তাহার মনেও অবসাদ আসিয়াছে,—রাত্রি শেষের অবসাদ।

এই ঘণ্টাখানিকের সান্নিধ্যে প্রশান্তর মনেও এক রকমের একটা আসক্তি জন্মিয়াছে। রাত্রি যেমন প্রভাতের কাছে বিদায় লইয়া যায় তাহারও যদি তেমনই বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে তো তাহাকে নির্ব্বিচারে মাথা পাতিয়া মানিয়া লইবার পূর্ব্বে তাহাদের এই অভিযানের সম্বন্ধকে এমন একটা সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে হইবে যাহা জীবনে যেন সে পরিচয় মুছিয়া না যায়।

তাহার এই একনিষ্ঠ প্রেম, আত্মস্থ সন্ন্যাসীর তপস্যা ভঙ্গ করিল কে? অনুশোচনাতে তাহার মন যতই তিক্ত হইতে লাগিল রূপালীর উপরে ততই একটা বিজাতীয় আক্রোশ গুমরিয়া মরিতে লাগিল। রূপালী কেন এই দুর্ঘটনার পরিণতি হইতে পরিত্রাণ পাইবে? এই অবৈধ যাত্রার স্মৃতি স্বামীস্ত্রীর আলিঙ্গনের মাঝে অহরহ কেন পীড়া দিবে না? আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবেই—।

প্রশান্ত উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল,—আমার হাত যদি পুড়ে থাকে তোমার হাতও পুড়বে।

রূপালী কিছু বুঝিতে না পারিয়া কহিল,—কি বলছ তুমি প্রশান্ত?

প্রশান্ত নিঃশব্দে হাসিল।

নিভিবার আগে দীপশিখা যেমন জ্বলিয়া উঠে রাত্রির উন্মাদনা এবং উত্তেজনার পরিসমাপ্তি হইবার পূর্ব্বে প্রশান্তর মনে তাহা আর একবার প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল।

সে রূপালীকে ভালবাসে না অথচ তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতেও কষ্ট বোধ হইতেছে, সে তাহার প্রথম প্রেমকে এখনও যথেষ্ট সম্মান করে, কিন্তু আজ রাত্রের সঙ্গিনীকেও সে অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছে না।

রূপালী বলিল,—আকাশটা পরিষ্কার হয়ে আসছে—

রূপালীর কথা কয়টী তাহার অনাহারী মনকে একটা নিষ্ঠুর আঘাত করিয়া জাগাইয়া দিল। সে কি করিয়া তাহার মনের এই সহস্র অসংলগ্ন, বিশৃঙ্খল ও অসামঞ্জস্য ভাব রূপালীর কাছে প্রকাশ করিয়া বলিবে?

রূপালী কী বুঝিবে, সে কী বুঝাইবে?

তবু তাহাকে সে কিছু একটা বলিবার জন্য ভিতর হইতে সাড়া পাইতেছিল। তাহার চুলের সৌরভে, তাহার নিঃশ্বাসের উত্তাপে, তার শাড়ী খসখসানি শব্দে, এবং চুড়ির মিঠা আওয়াজের মধ্যে নারীত্বের যে একটা আভাস এই অন্ধকার গাড়ীতেও পাওয়া যাইতেছিল তাহাকে হারাইবার প্রথম সূচনাতে হঠাৎ তাহার রক্তকণাতে একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা বিষাক্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল।

চুলের এই ঘ্রাণে, চোখের এই দৃষ্টিতে, নিশ্বাসপতনের এই মাধুর্য্যে, শাড়ীও চুড়ির এই শব্দে সঙ্গে তাহার বহুদিন আগে পরিচয় ছিল।

অন্ধকারে ভাল করিয়া রূপালীকে দেখা যায় না, তবু সে অনুভব করিতেছিল যে সে একটা নারীর পাশে আজ বসিতে পাইয়াছে,—যে নারী স্বামীকে বঞ্চনা করিতে ও পরমুহূর্ত্তে তাহাকে ছলনায় ভুলাইতে, এবং যাহার সঙ্গে সে মুহূর্ত্তের ভুলে ঘরের বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহাকে পরবর্ত্তী জীবনে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইবার নিপুণ দক্ষতায় পৃথিবীর সমস্ত নারীর সঙ্গে সমান।

সে ডাকিল,—রূপালী—!

রূপালী চমকিয়া উঠিল, সেও যেন কি একটা ভাবিতে-ছিল। কহিল,—কি?

প্রশান্ত বলিল,—তুমি পদ্মা দেখেছ? সর্ব্বগ্রাসী উৎ-শৃঙ্খল রাক্ষসী পদ্মা। দেখেছ?

রূপালী একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল। পথের আলো মুহূর্ত্তের জন্য প্রশান্তর মুখ আলোকিত করিয়া দিল। সে

আলোতে প্রশান্তের চোখে উন্মাদের ছায়া দেখিয়া রূপালী শিহরিয়া উঠিল।

বলিল,—দেখেছি—।

প্রশান্ত সমস্ত দেহের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব বেদনা অনুভব করল। কে যেন তাহার মনকে মোচড়াইয়া মোচড়াইয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পীড়া দিতেছে।

সে বলিল,—পদ্মা যখন একপাড়ে ভাঙ্গন সুরু করে অন্যপাড়ে রেখে আসে নতুন পলিমাটীর চর। লক্ষ্য করেছ?

রূপালী তাহার প্রশ্নের জবাব দিতে দ্বিধা বোধ করিতেছিল। সে তাহার প্রশ্নের গোলক ধাঁধায় দিশাহারা হইয়া তাহার চোখের দিকে চাহিল। সেই চোখের দিকে চাওয়া যায় না কী ভাষা আছে সেই চক্ষে জানি না, মেয়েরা তার ভাষা বোধ হয় খুব সহজে অনুমান করতে পারে।

রূপালী বলিল,—প্রশান্ত, তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাস, সে কথা ভুলে যেয়ো না!

প্রশান্ত বলিল,—ভুলিনি রূপালী! পদ্মা তার কাঁচা পলিমাটীর কথা ভোলে না। একই সময়ে সেই নদীতে সৃষ্টি আর ধ্বংসের লীলা হয়; তাও তো অসম্ভব নয়! কিন্তু সে কথা নয় রূপালী, আমার প্রশ্নকে এড়িয়ে চলো না! পদ্মা যে পাড় ভাঙ্গে বটে রূপালী সেখানে দাঁড়িয়ো না। সে নির্দ্দয়ের মত ভাঙ্গে। নির্দ্দয়ের মত ভাঙ্গে বটে কিন্তু চোরের মত নয়। সে ছিনিয়ে নেয় তাকেই সে তার কাউল অবহেলা করে তার গণ্ডীর মধ্যে এসে দাঁড়ায়। যে জেনেশুনে সেখানে এলো তার অনিবার্য্য পরিণতি থেকে কে তাকে উদ্ধার করবে?

রূপালী ভীত হইয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িবার জন্য পাদানিতে এক পা রাখিবার চেষ্টা করিতেই প্রশান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া ফেলিল।

প্রশান্তর সর্ব্বদেহে যে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের কাঁপন প্রবাহিত হইতেছিল রূপালীর ওষ্ঠে তাহারই ছোঁয়াচ লাগিয়া তার ঠোঁট দুখানি যেন পুড়িয়া গেল। অনেকক্ষণ রূপালী তাহার বাহু বন্ধনের মধ্যে মূর্চ্ছাহিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। কোথা দিয়া কি হইয়া গেল কিছুই যেন ঠাহর করিতে সে পারিতেছিল না। প্রশান্ত তাহার মুখের অতি সন্নিকটে মুখ রাখিয়া দৃঢ় কণ্ঠে কহিল,—রূপালী আমি তোমাকে ভালবাসি না।

রূপালী তাহার বাহুবন্ধনের মধ্য হইতে নিজেকে ছাড়াইবার কোন চেষ্টা করিল না; কেবল তাহার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুর ধারা নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কে যেন কান্নার পাঁচ আঙ্গুল দিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া আছে। কথা কহিবার শক্তি নাই তবু কহিল,—আমিও না।—

প্রশান্ত মৃদুস্বরে কহিতেছিল,—আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি, এখনো ভালবাসি!

রূপালী অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলিল,—আমিও আমার স্বামীকে ভালবাসি।

প্রশান্ত রূপালীকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল,—তুমি আমার সেই একাগ্রনিষ্ঠা ভঙ্গ করেছ!

রূপালী কহিল,—তুমি আমাকে অপমান করেছ।

প্রশান্ত বলিল,—রূপালী এ আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি!

রূপালী মাথা নাড়িল। কহিল,—না সে কথা ঠিক নয়। তোমার দুষ্ট স্মৃতি আমাদের দাম্পত্য জীবনে চিরদিন পীড়া দেবে। তুমি আমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছ। আমি এখান থেকেই ফিরে যেতে চাই।

কোথায়?

ঘরে।

যদি তাঁরা তোমাকে ঘরে না নেন্?

এখনও রাত অনেক আছে, তারা টের পাবে না।

এমন তো হতে পারে—

পারে। হয়ত উনি জেগে উঠে আমাকে না দেখতে পেয়ে খুঁজতে পারেন।

তখন?

হয়ত উনি জাগলে না; না ও তো জাগতে পারেন? এমন ত কতদিন হয়!

ও বুঝেছি। তুমি একবার chance নিয়ে দেখবে ভাল মেয়ের মত আবার সংসার করা যায় কিনা।

রূপালী যখন ঘরে পৌছিল তখন রাত্রির শেষ প্রহর সে ভেজান দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বুকের ভিতরটা ভয়ানক জোরে শব্দ করিতেছে। সে সেইখানে

দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া অতি ক্ষীণ শব্দটীও শুনিবার চেষ্টা করিল।

নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল—

স্বামী ঘুমাইতেছে।—

রূপালী তাহার পাশে গিয়া শুইল। স্বামীর হাতের উপর তাহার ঠাণ্ডা গাল চাপিয়া ধরিল। অন্ধকারের উজ্জলতা দিবালোকের নগ্নশ্রীর কাছে কী করিয়া পরাজিত হইল একথা ভাবিতে গিয়া রূপালীর চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

"মানুষ ও প্রেম"

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার চাটার্জ্জী

বহুদূর হ'তে বহুদূরে তুমি
অসীমের সীমা পারে,
আমার মানসী যেখানেই আছে,
বিশ্বময় খুঁজি তারে!
আমার মাঝারে আমি হারা হ'য়ে—,
কতকাল বেঁচে রবো।
সোনা কুড়াইতে কাঁচ কুড়াইনু—
এ দুঃখ কাহারে কবো।
কত যে সাধনা গড়িল মরতে,
স্বরগের বাসভূমি,
কোন মহাকাল জ্বালে দাবানল,
কোথা ইন্দ্রাণী তুমি।
খুন মাসে গড়া মানব পুতলী—
কূটীল স্বার্থপর,
কোটী অট্টালিকা সেখানে বিরাজে,
কে খোঁজে পাতার ঘর।

দেবতার প্রেম দেবতার প্রেম দেবতা নিয়েছে,
রেখে গেছে শুধু কামনা,
মাটীর মানুষ স্বার্থ মিলায়ে,
প্রেম নামে করে ছলনা।
কে সর্ব্বহারা গান গেয়ে যায়,
প্রেমের জয় গান
বলে দাও ওকে সবহারাটীকে
শ্মশানে প্রেমের স্থান।
ভিক্ মেগে তোর
মিলিবেনা প্রেম,
হেসে দিবে অপমান,
তার চেয়ে ভাল মরু মাঝে একা
বসে থাকা দিনমান।
তবু কেউ যদি নাহি আসে,—
ডাকিস্ তখন "হে মোর মরণ"
কাছে এস আরও কাছে,
তুমি ছাড়া মোর, বাঞ্ছিত নাই
জীবনের মধুমাসে।

‘এরাই তোমাদের দেবতা হোক’

এস আমরা প্রার্থনা করি, “হে জ্যোতির্ম্ময়, সদা আমাদের সত্যপথে পরিচালিত কর”—তা হ’লে নিশ্চিত আঁধারের মধ্যে আলোকরাশি ফুটে উঠবে—আমাদিগকে পরিচালিত করবার জন্য তাঁর মঙ্গলহস্ত প্রসারিত হবে। * * এস, আমাদের মধ্যে—প্রত্যেকে দিবারাত্র * * অত্যাচার নিষ্পিষ্ট ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতের জন্য প্রার্থনা করি। দিবারাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর। * * আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাসি। * * ভারতের চিরপতিত ত্রিশকোটী নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে? তাদের উদ্ধারের উপায় কি? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বল? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পাচ্ছে না—তারা শিক্ষা পাচ্ছে না—কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বল? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? **এরাই তোমাদের ঈশ্বর—এরাই তোমাদের দেবতা হোক্—এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক।** তাদের জন্য ভাব, তাদের জন্য কাজ কর, তাদের জন্য সদা সর্ব্বদা প্রার্থনা কর—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরীবদের জন্য রক্ত-মোক্ষণ হয়। তা না হ’লে সে দুরাত্মা। তাদের কল্যাণের জন্য আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক—আমরা কাজে কিছু করে উঠতে না পেরে লোকের অজ্ঞাতভাবে দেহত্যাগ করতে পারি—কেউ হয়ত আমাদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি দেখালে না, কেউ হয়ত আমাদের জন্য এক ফোঁটা চোক্ষের জল পর্য্যন্ত ফেললে না কিন্তু আমাদের একটা চিন্তাও কখনও নষ্ট হইবে না। এর ফল শীঘ্র বা বিলম্বে ফলবেই ফলবে। * * যতদিন ভারতের কোটী কোটী লোক দারিদ্র ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী ব’লে মনে করি। যতদিন ভারতের ত্রিশকোটী লোক ক্ষুধার্ত্ত পশুর তুল্য থাকবে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক ক’রে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না—আমি তাদের হতভাগা বলি। হে ভ্রাতৃগণ! আমরা গরীব, আমরা নগণ্য, কিন্তু আমাদের মত গরিবরাই চিরকাল সেই পরম পুরুষের যন্ত্রস্বরূপ হ’য়ে কাজ কারেছে। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন, আশীর্ব্বাদ করুন।

* * * ভরসা তোমাদের উপর; পদমর্য্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোন কৌশলের প্রয়োজন নাই। কৌশলে কিছুই হয় না। দুঃখীদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। * * ভগবান অনন্তশক্তিমান; আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। * * আমি তোমাদের নিকট—এই গরিব, এই অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িত-দের জন্য—এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীন-দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহা বলি প্রদান কর; বলি—জীবনবলি, তাহাদের জন্য—যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন, দরিদ্র, পতিত, উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশকোটী ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে। এ এক দিনের কাজ নয়। পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থ-সারথি আমাদের সারথি হইতেও প্রস্তুত, আমরা তাহা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া

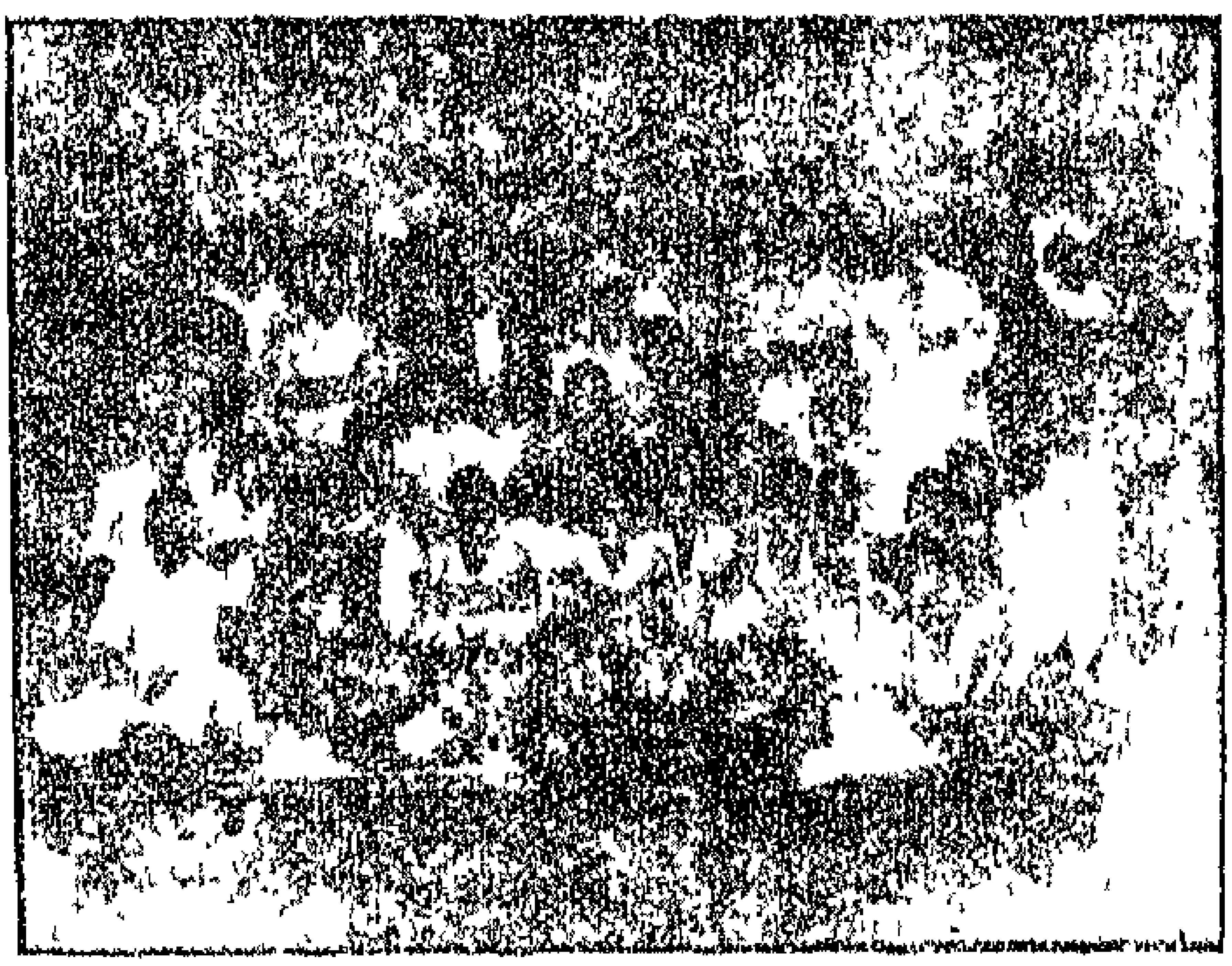
ভারতের শত শত যুগসঞ্চিত পর্ব্বতপ্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।

* * * এস, ভ্রাতৃগণ! স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কি ভয়ানক দুঃখরাশি ভারত ব্যাপিয়া। এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। তা হউক, আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের মহিমা ঘোষিত হউক আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উঠিবে। প্রভুর জয়! আমি * * অকৃতকার্য্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভাব গ্রহণ করিবে। * * বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল, দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব, একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।

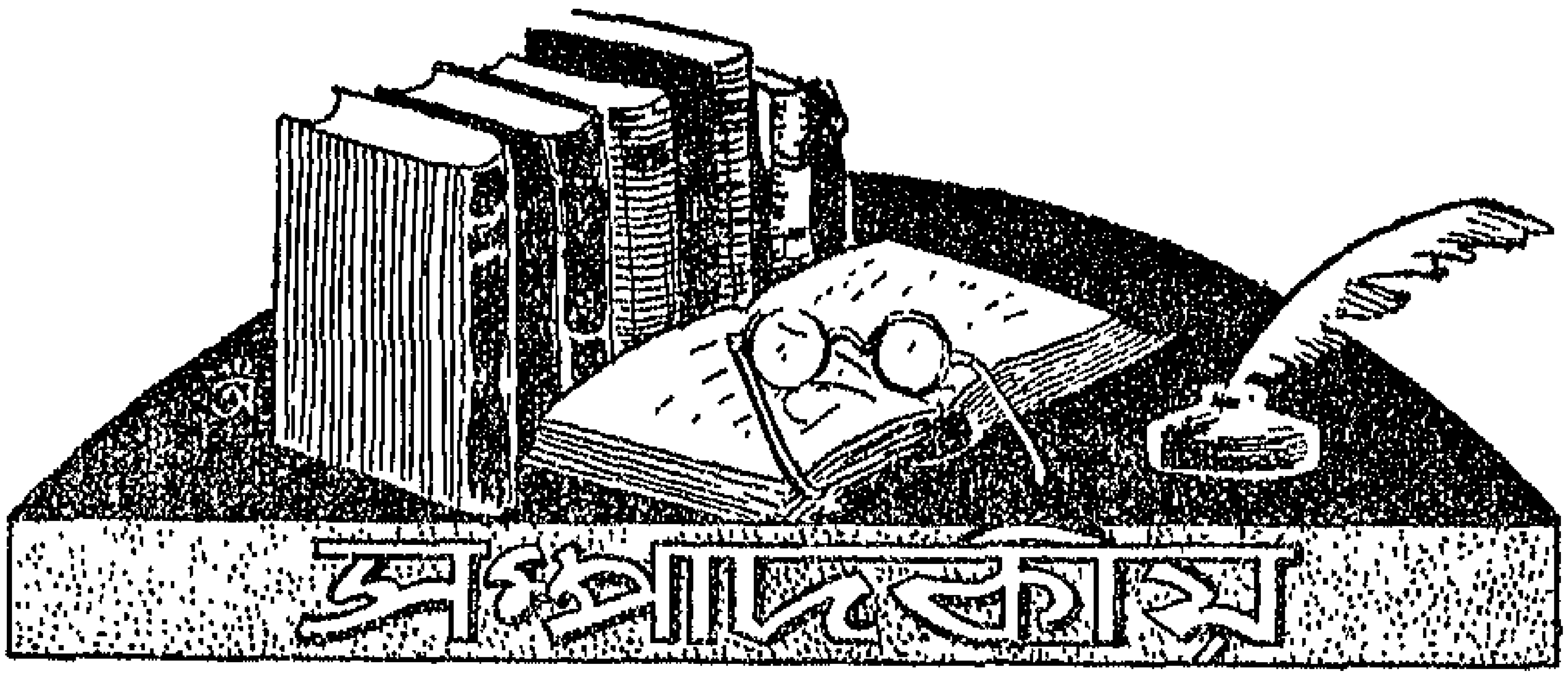
* * * দরিদ্র, অজ্ঞ, ও অত্যাচারনিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান হউক, তোমাদের পাগল হইবার উপক্রম হউক। তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবে তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ—অনন্ত শক্তি আসিবে! * * এগিয়ে যাও। এখনও বলিতেছি এগিয়ে যাও। * * ভয় পাইও না! উপরে অনন্ত-তারকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয়দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে, অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সমুদয়ই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

* * * উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, onward, onward—এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মেয়ে মদ্দে আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে। onward, onward, নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে * * * 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—হরে হরে।

—বিবেকানন্দ
('পত্রাবলী' হইতে চয়ন)।



সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর বদ্রীরাম সর্দ্দার গত ১৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার পরলোক গমন করিয়াছেন। ভবানীপুর উড়িয়া-পাড়া ব্যায়াম মন্দিরের তিনি প্রধান ব্যায়াম ও লাঠি শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে উক্ত ক্লাবের যে ক্ষতি হইয়াছে—তাহা অপূরণীয়। আমরা সর্দ্দারের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।



অনিল রায়ের 'ঐক্য—'

'জয়শ্রী'র শারদীয় সংখ্যায়—ভূতপূর্ব রাজবন্দী বিখ্যাত নেতা অনিল রায় একটী প্রবন্ধে বাঙলার প্রগতিশীল রাজনীতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি যা ব'লেছেন তার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম হ'লো : বিভিন্ন দলে বিভক্ত হ'য়ে কার্য্য করার চেয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হওয়া অধিকতর কার্য্যকরী এবং গোঁড়ামীকে পরিত্যাগ ক'রে উদার মনোভাব নিয়ে বিভিন্ন নেতাদের ঐক্য বদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। যদি সকলেই নিজ নিজ মতবাদকে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়ে অপরের আদর্শগুলোকে স'রিয়ে রাখেন তবে মিলন সম্ভব হবে না; হ'লেও তা স্থায়ী হ'তে পারে না। প্রত্যেকেরই উচিৎ সম্মিলিতভাবে আদর্শকে গ'ড়ে নেওয়া; তাতে কারো ক্ষোভ ক'রবার কিছু থাকবে না।

বাঙলার তরুণ সম্প্রদায়ের ওপর অনিলবাবুর প্রভাব সামান্য নয়, বিশেষ ক'রে রাজনীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ঢাকার যুবক মণ্ডলীর অনেকেই তাঁর ওপর আস্থা সম্পন্ন।

প্রথম যখন প্রবন্ধটী প'ড়তে প্রবৃত্ত হই তখন মনে হ'লো সময়োপযোগী হওয়ার রচনাটী মূল্যবান। কিন্তু অধিকক্ষণ সে মনোভাবকে সমর্থন ক'রা গেলো না। প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে যতই অগ্রসর হ'তে লাগলাম ততোই তার বিকৃতরূপ আমাদের নিরুৎসাহ ক'রতে লাগালো। ক্রমে শ্রদ্ধার ক্ষীন রেখাটুকুও যেন বিলীন হ'য়ে মিশে গেলো।

রূপান্তরে।

অনিলবাবু জেল থেকে বেরিয়ে যে মতবাদ প্রচার ক'রেছিলেন এখন সন্দেহ হ'চ্ছে তাঁর সে সব কথার মুখে অপর কোন উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল কিনা।

ইতালীর মুসোলিনীকে ইতালীবাসী প্রথম এইরূপেই পেয়েছিল, আর মুসলিনীর যে সত্যকার রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাতে স্বভাবতই সন্দেহ জাগে অনিলবাবু সত্যি কি মার্ক্স-পন্থী, না হিট্‌লার মুসলিনীর অনুচর। তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'রবার জন্য সাম্য-প্রীতি দেখাচ্ছেন, না তিনি বিভ্রান্ত!

তাঁর মত জ্ঞানী-পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ বিভ্রান্ত হ'য়েছেন এটা দেশবাসী বিশ্বাস ক'রবে কিনা জানি না কিন্তু মার্ক্সের অনুরাগী মার্ক্সবুদ্ধগণ যে বিশ্বাস ক'রবেনা তা মনে হয় না।

উক্ত প্রবন্ধে দু'টি জিনিষ আছে যা দৃষ্টিকে কোন প্রকারেই এড়িয়ে যায় না। প্রথম তিনি ভাষার চাতুর্য্যে লেনিন-এর মতবাদকে ভিন্ন পথে টেনে নিয়েছেন, দ্বিতীয়টী তিনি উদার মনোভাব নিয়ে সকলকে মিলিত হ'তে ব'লেছেন, কিন্তু এ আহ্বানে এমন একটা রূপের সন্ধান পাওয়া যায় যাতে সাধারণ অনুসন্ধিৎসুতারও ধরা পড়ে, তিনি ঐক্য কামনা করেন বটে কিন্তু তাঁর নিজের অপ্রকাশ্য মতবাদকে বিসর্জ্জন দিয়ে নয়; তোমরা সবাই এসো উদার হৃদয় নিয়ে। বর্ত্তমান বক্তব্যে সুক্ষ্মভাবে বিচার করা সম্ভব হ'লো না, আগামী সংখ্যায় আমরা এ বিষয় যথাযথ আলোচনা ক'রবার আশা পোষণ করি।

ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতি

কংগ্রেসী বছর শেষ হ'য়ে এলো, বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসু আর মাত্র দু'মাস আছেন ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতির আসনে।

আগামী রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের তোড়জোড় আরম্ভ হ'য়ে গেছে। কয়েকমাস পূর্ব্ব থেকেই কংগ্রেসের বামপন্থীকর্ম্মী

গণ এবং সাম্যবাদী ও সমাজ তন্ত্রীগণ সুভাষ চন্দ্রের পুনর্নির্ব্বাচনের পক্ষে ফতোয়া প্রকাশ করছেন। দক্ষীণপন্থী 'বল্লভ-ভুলা-রাজেন্দ্র' সম্প্রদায় সুভাষ চন্দ্রের পুনর্নিয়োগ যেন সমর্থন ক'রতে পারছেন না সম্ভবও নয়। দিনের দিন কংগ্রেসের ভেতর বামপক্ষীয়দের যেরূপ শক্তি বৰ্দ্ধিত হ'চ্ছে, তাতে যদি সুভাষ চন্দ্রের মত একজন চরমপন্থীর প্রভাব স্থায়ীত্ব লাভ করে তা হ'লে যে 'ভাই' কম্পানীর অস্তিত্বই বিলুপ্ত হ'য়ে যায়, গান্ধীজীও ডুবে যান অতলের তলে।

গান্ধীজীর ভক্তবৃন্দ এবং গান্ধীজী জেনে বুঝে এরূপ ভাবে আত্মমর্য্যাদাকে কোন প্রকারেই বিপন্ন করতে পারেন না; দেখেনও তা তা হ'তে। তাই তাঁরা চেষ্টা ক'রছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে তাঁদের শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করাতে। এদিকে সুভাসচন্দ্রও স'রে যেতে অনিচ্ছুক।

আবুলকালাম আজাদ অথবা অপর যে কেউ, দক্ষিণপন্থী সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হন এবং প্রতিনিধিদের যদি স্বাধীন ভাবে ভোট দেবার অধিকার থাকে তবে তাঁরা বা তিনি যে পরাজিত হ'বেন তাতে আমাদের কোন সংশয় নেই।

তবে সুভাষ চন্দ্র গত বছর রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হ'য়ে সুরকে যেরূপ নরম ক'রেছিলেন এবং দক্ষিণপন্থীদের সহায়তা ক'রেছিলেন তাতে অনেকই বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে প'ড়ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি পরে নিজের কর্ম্মধারাকে সংশোধন ক'রে নিচ্ছেন। তিনি যদি পুনরায় গান্ধীর কুহকে প'ড়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট ক'রতে উদ্যত হন তবে সুভাষবাবুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলেই মনে হয়। আশা করি তিনি একবার যখন তাঁদের মায়াজাল ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে এসেছেন সত্যিকারের কর্ম্মীদের মধ্যে, তখন আর পুনরায় আবদ্ধ হবেন না নিজেকে বিনাশ ক'রতে। সুভাষ চন্দ্র যদি নির্ব্বাচন হ'তে স'রে না দাঁড়ান তবে ব্যালট অনিবার্য্য। দেখা যাক গান্ধীপন্থী এবং বামপন্থীদের প্রভাব, কারা ভারতের প্রকৃত জনপ্রিয় আর কারা উপাদন।



স্বর্গীয় সুধীর কুমার চন্দ্র

ভূতপূর্ব্ব অর্চ্চনা সম্পাদক

জন্ম :—৩০শে কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩১৯ সাল। মৃত্যু :—২৯শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৪৫ সাল।

অর্চ্চনা

৩৫ বর্ষ } পৌষ—১৩৪৫ { ১১শ সংখ্যা

টমাস গ্রে

অমিয় কুমার বাগচী

বিশ্ব সাহিত্যে মাত্র একটি কবিতা রচনা করে টমাস গ্রে'র মতো এমন অবিনশ্বর সুনাম অর্জ্জন করতে আর কেউ পারেন নি। এই বিখ্যাত কবিতাটির নাম "Elegy written in a country churchyard। ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে যাঁরাই অল্প বিস্তর পরিচিত তাঁরাই এই কবিতাটির অন্ততঃ দু একটি চরণ মুখস্থ রেখেছেন···ঠিক রেখেছেন বললে হয়তো ভুল হবে বরং আপনা হতেই চরণগুলি তাঁদের অন্তরে গেঁথে গেছে বল্লেই ঠিক হবে। আমার ব্যক্তিগত জীবন কাহিনীর সঙ্গে এই অমর পদ্যটি অতি অল্প বয়সেই জড়িত, যখন অর্থ গ্রহণ করবার বয়স হয়নি তখনও সুর করে এই কবিতাটি বার বার পড়েছি···সে পড়ার মধ্যে এক তৃপ্তি ছিল···সে তৃপ্তি অর্থগ্রহণ করার তৃপ্তি থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আজও আমার বেশ মনে আছে··নীচু ক্লাসে ছেলেদের সামনে যখন গড়গড় করে বলতাম—

"Full many a gem of p rest ray serene
The dark unfathom'd caves of ocean bear
Full many a flower is born to blush unseen.
And waste its sweetness in the desert air"

সঙ্গীরা শুনে বিস্ময়ে চেয়ে থাকতো···গর্ব্বে আমার বুকটা ভ'রে উঠত। কিন্তু তখন যদি কেউ বলতেন—"যা বল্লে তার মানেটা বলো দিকি।" আমায় তা হলে অপ্রস্তুত হোতে হোত। এমনি করে টমাস গ্রে'র সঙ্গে আমাদের অনেকেরই অতি অল্প বয়সেই পরিচয় ঘটেচে। পরবর্ত্তী জীবনে সেই অস্পষ্ট পরিচয়টা লেখকের জীবনী ও কাব্য সাহিত্যের আলোচনার ফলে স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

শুধু Elogy রচয়িতা বলে ইংরাজি সাহিত্যে 'গ্রে'র নাম নয়···classic যুগের জড়তা থেকে যাঁরা সর্ব্বপ্রথম বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন তাদের মধ্যে টমাস গ্রে ছিলেন একজন যদিও তাঁর এ বিদ্রোহ সার্থকতা তেমন লাভ করেনি···না করলেও আমরা তাঁর সাধু প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না।

(২)

ড্রাইডেন মিলটন ও স্পেনসারের মতো গ্রে লণ্ডনে জন্মে ছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখটি হোল ১৭১৬সালের ২৬এ ডিসেম্বর। এই কারণে লণ্ডন সাহিত্যিকদের কাছে তীর্থ ক্ষেত্র স্বরূপ···এক লণ্ডন সহরে, পোপ, ব্লেক, কীটস, ব্রাউনিং প্রভৃতি চির বিখ্যাত কবিরা জন্ম গ্রহণ করেছেন এইজন্যে Augustine Birrel...'John Milton এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখতে গিয়ে লিখেছেন—"In the matter of municipal govermet, gas, water, fog, and snow, much can be alleged and proved against the English capital, but in the domain of poetry which I take to be a nation's best guaranteed stock, it may safely be said that there are but two shrines in England whither it is necessary for the literary pilgrim to carry cockle hat and shoon-London, the birth place of Chaucer, Spenser, Ben Johnson, Miltor

Herrick, Pope, Gray, Blake, Keats and Browning and Stratford upon Avon, the birth place of Shakespeare. Of English poets it may be said generally they are either born in London or remote country places.

গ্রের বাবা ফিলিপ গ্রে ছিলেন একজন ব্রোকার। তাঁর অবস্থা একসময়ে খুবই ভাল ছিল কিন্তু সে সব দিন বেশি দিন থাকে নি···ভাগ্যলক্ষ্মী শেষে তাঁর প্রতি এতদূর অপ্রসন্ন হয়েছিলেন যে জীবনের শেষদিনগুলি তাঁর স্ত্রী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দোকানের সামান্য রোজগারের ওপর নির্ভর করে কাটাতে হয়। এই দুঃখ দারিদ্র্যের নিত্য নতুন আঘাতে ফিলিপ গ্রে যতখানি নিরাশ হয়েছিলেন··· তাঁর স্ত্রী কিন্তু ততখানি হননি··তিনি শিশুপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে পরম ধৈর্য্যসহকারে সবই হাসিমুখে সয়েছিলেন... এবং নিজেদের অতি কষ্টের সঞ্চিত টাকা থেকে তিনি বালকের ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্যে···তার শিক্ষার পেছনে কিছু টাকা খরচ করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন নি। পড়াশুনো নিয়ে গ্রে মেতে উঠলেন। তিনি অতি অল্প বয়স থেকেই বই পড়তে ভাল বাসিতেন···তার মতো শিক্ষিত কবি এক মিলটন ছাড়া ইংরিজি সাহিত্যে আর কেউ আসে নি।

গ্রে১৭২৭ খৃষ্টাব্দে 'ইটনে' নাম লেখালেন! এখানে তাঁর দুজন মামা শিক্ষকতা করিতেন! এখানে পড়বার সময় তাঁর সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী Sir Robert Walpole এর পুত্র Horace Walpole ও আয়ারল্যাণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলারের পুত্র Richard West এর আলাপ হয়। এই আলাপ ধীরে ধীরে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ১৭৩৪ সালে গ্রে 'ইটন' ছেড়ে কেমব্রিজে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে Pembroke Hall এ কিছুদিন থেকে Peterhouse এ স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করলেন। এ সময় গ্রে দিনরাত বই নিয়ে বসে থাকতেন····· বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেশামেশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। যতদূর মনে হয় এই বই পড়বার তীব্র নেশাই তাঁকে সাহিত্য জগতে বেশি কিছু দান করতে দেয়নি। তিনি লেখার চেয়ে পড়তে ভালবাসিতেন। বই ছিল তাঁর 'Never failing friends'। সাহিত্যিক মাত্রেই খেয়ালী···কোন বিশেষ পথে থাকা তাদের পক্ষে বেশিদিন সম্ভব নয়··গ্রে' ১৭৩৮সালে ডিগ্রি না নিয়ে কেমব্রিজ ছেড়ে দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধন ত্যাগ করতেই বন্ধু Walpole এসে তাঁকে অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে দেশ ভ্রমণে বার হোতে··· খরচের সমস্ত ব্যয় ভার তিনিই গ্রহণ করিবেন'' গ্রে'কে তার জন্যে ভাবতে বারণ করে দিলেন। গ্রে ভেবে চিন্তে রাজি হয়ে গেলেন··বই পড়ে পড়ে বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে তিনি এক এক রকমের ধারণা পোষণ করতেন এখন তার ইচ্ছে হোল তার কাল্পনিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে বাস্তবতার সাদৃশ্যকে যাচাই করতে, তা ছাড়া চুপচাপ দেশে থেকেই বা কী লাভ। ১৭৩৯ সালে মার্চ মাসে গ্রে বন্ধুর সঙ্গে দেশ ভ্রমণে বেরলেন। এই ভ্রমণ ব্যাপারে তাঁর জীবনে একে একে দুটি বছর কেটে গেল। ফ্রান্স ও ইতালীর বিখ্যাত জায়গাগুলি দেখে যখন দেশে ফেরবার ব্যবস্থা হচ্ছে এমনি সময় বন্ধুর সঙ্গে গ্রে'র কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটল! তিনি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর সংসর্গ ত্যাগ করলেন এবং একা ১৭৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন।

দেশে ফেরবার ২ মাস পরে অর্থাৎ নভেম্বর মাসে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটল। গ্রে'র মা স্বামীর মৃত্যুর পর ব্যবসা তুলে দিয়ে উইণ্ডসর (Windsor) জেলায় Stoke Poges নামে একটি গ্রামে তাঁর বোনের সঙ্গে গিয়ে বসবাস সুরু করলেন। কবি কিন্তু লণ্ডনেই রইলেন সেখান থেকে তিনি মাঝে মাঝে মাকে দেখে আসতেন! দিন আবার কাটতে থাকে। বইয়ের সমুদ্রে ডুবে গ্রে ঘরের কোণে চির একাকীর জীবনযাপন করেন! এমনি সময় অর্থাৎ ১৭৪৯ সালে তাঁর মাসী 'মেরির মৃত্যু ঘটল। তাঁর মা একা পড়ে গেলেন। এই মৃত্যু গ্রেকে তীব্রভাবে আঘাত করে···এরই ফলে ১৭৪১ সালের অসমাপ্ত জগৎ বিখ্যাত কবিতা 'Elegy writt n in a country churchyard'খানিকে তিনি শেষ করেন। কিন্তু কবিতাটি প্রকাশিত হোল ১৭৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রে'র নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।···শিক্ষিত অশিক্ষিত সবার দৃষ্টি গ্রে'র ওপর পড়ল। কিন্তু গ্রে কেমনি নির্বাক···নিস্তব্ধ···বই নিয়ে ব্যস্ত।

আরও কয়েক বছর পরে অর্থাৎ ১৭৬২ সালে কেমব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Modern History'র প্রফেসারের পদের জন্য গ্রে' দরখাস্ত করলেন···কিন্তু ফল হোল না···কিন্তু এই বছরেই তিনি তদানিন্তন প্রধান মন্ত্রীর জামাইয়ের শিক্ষক হোলেন···বেশ মোটা মাইনের কাজ···গ্রে' অনেকটা নিশ্চিন্ত হোলেন ! বছর পাঁচেক পরে অর্থাৎ ১৭৬৮ সালে আবার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব্বোক্ত পদের জন্যে প্রফেসারের দরকার হোল···এবারও গ্রে' দরখাস্ত পাঠালেন··· ভগবান এবার মুখ তুলে চাইলেন···গ্রে বার্ষিক ৪০০ পাউণ্ড মাইনেতে প্রফেসর নিযুক্ত হোলেন। কিন্তু বেশিদিন এ সুখ সৌভাগ্য ভোগ করবার কপাল তাঁর ছিল না...১৭৭১ সালে ৩০এ জুলাই ক্যামব্রিজে সামান্য কয়েকদিন অসুখে ভুগে তিনি চিরদিনের মতো পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন ! তাঁর দেহ Stoke Pogisএ তাঁর মা ও মাসীর সমাধির ঠিক উল্টো দিকে তাঁর বড় আদরের Ivy-mantled Tower এর ছায়ায় সমাহিত করা হয় !

(৩)

Gray a born poet, fell upon an age of prose. He fell upon an age whose task was such as to call forth in general man's powers of understanding, wit and cleverness than their deepest power of mind and soul."—Mathew Arnold.

গ্রে বেশি কিছু লিখে যেতে পারেন নি··কিন্তু যা লিখে গেছেন তা অমর হয়ে আছে। অনেকে জানেই না যে তিনি Elegy ছাড়া আরও কবিতা লিখেছিলেন আমরা এখানে তাঁর রচনাগুলির একটি তালিকা তুলে দিচ্ছি···

(১) Ode on a Distant Prospect of Eton College (১৭৪২) (২) Ode on Spring, Hymn to Adversity" "Elegy written in a country churchyard (এই তিনটি কবিতা তিনি ১৭৫১ সালে রচনা করেন) (৩) "The alliance of education and goverment" "Ode to Vicssitude" "The Progress of Poesy এবং 'The Bard' ১৭৫৭ সালে প্রকাশিত হয় (৪) Ode on the installation of the Duke of Grafton to the Chancellorship of the University of Cambridge ১৭৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া আরও কয়েকটি রচনা তাঁর আছে।

গ্রে'র রচনা সমালোচনা করবার আগে আমাদের দেখা উচিত তিনি কোন সময়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর জন্মাবার বছর কয়েক আগে পোপ মারা গিয়াছিলেন সত্যি···কিন্তু তখনও তাঁর প্রভাব দেশের ওপর অটুটভাবে বিরাজ করছিল, তখনও পোপের নির্দ্দেশ মতো বিশেষ এক ভঙ্গীতে কবিতা রচনা করার রেওয়াজ ছিল। গ্রে এবং কলিন্স এই প্রথাকে বরণ করতে না পারলেও যুগের দান হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই জন্যে গ্রে'র কবিতাতে পোপ প্রভৃতি ক্লাসিক যুগের কবিদের মতো প্রকৃতি খুব উঁচু আসন পায়নি···তাকে বর্ণনীয় বিষয়ের মাধুর্য্য প্রকাশের জন্যে ডাকা হয়েছিল···তাকে তার জন্যে সমাদর যেমন পরবর্ত্তী যুগে Wordsworth, কলরিজ প্রভৃতি কবিরা করেছিলেন তেমনভাবে গ্রে কোথাও করেন নি।···ক্ল্যাসিক যুগে কবিরা সামান্য কথাগুলিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন·· যা সহজে সবাই বুঝতে পারে... এমন কথা তাঁরা ব্যবহার করতেন নেহাৎ দায়ে পড়ে··· তাঁরা সাহিত্যটাকে রাখতে চেয়েছিলেন এক বিশেষ শ্রেণীর জন্যে···গ্রে'র রচনার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা নিশ্চয়ই ক্লাসিক ঢং এর কথাগুলি লক্ষ্য করেছেন...যেমন the rudy drops that worm my heart প্রভৃতি। আগেই বলা হয়েছে শেলি, কীটস, ব্রাউনিঙ, প্রভৃতি পরবর্ত্তী যুগের কবিদের কাছে প্রকৃতি যে ভাবে ধরা দিয়েছেন·· গ্রের কাছে কেমনভাবে ধরা দেননি··· এর জন্য দায়ী গ্রে' নয়···দায়ী গ্রের অগ্রবর্ত্তীরা যাঁরা প্রকৃতিকে বরাবর দূরে রেখে এসেছিলেন নেহাৎ দায়ে না পড়লে ডাকতেন না। কিন্তু গ্রে যে প্রকৃতির সঙ্গে সদ্‌ভাব করবার জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন এ তাঁর রচনা পড়লেই বোঝা যায়।

গ্রে'র সব চেয়ে বড় গুণ ছিল এই যে, কবিতাকে কী করে ধীরে ধীরে তার চরম সৌন্দর্য্যের মধ্যে দাঁড় করান যায়—এবং কী করে সমাপ্তির শেষ সুরটুকু পাঠকদের চিত্তকে আকর্ষিত করতে পারে তা তিনি বেশ ভাল ভাবেই জানতেন। এইজন্য প্রসিদ্ধ সমালোচক Mathew Arnold বলেছেন—"Gray holds his high rank as a poet

not merely by the beauty and grace of isolated passages, not merely by a diction generally pure in an age of impure diction; he holds it above by the power and skill which the evolution of his poem is conducted"

গ্রে যদি আরও পঞ্চাশ ষাট বছর পরে জন্মাতেন তা হলে তাঁর আরও বিকাশ ঘটত! তিনি যে নিজেকে পূর্ণরূপে দান করতে পারেন নি—এর জন্যে দায়ী তাঁর যুগ। তাঁর যুগই তাঁকে নীরব রেখেছিল—অবশ্য এটাও ঠিক গ্রে সেরকম শক্তিমান হলে নিজেকে হয়তো আরও ভালভাবে প্রকাশ করতে পারতেন—অবশ্য যুগের দাস থেকে গেছেনই।

গ্রে ছিলেন যাকে বলে নীরব কবি। তিনি কবিতা রচনা করতেন কিন্তু কাউকে জানতে দিতেন না—অবশ্য এর কারণ ছিল—একসময় Agrippiana নামে একখানি নাটক রচনা করে তিনি তাঁর বন্ধু West কে শোনান—বন্ধু তাশুনে তাঁকে উৎসাহ না দিয়ে বেশ একটু ঠাট্টা করেন—সেই থেকে গ্রে নিজের লেখা কাউকে শোনাতেন না।

ইংলণ্ডের তদানিন্তন রাজকবি Colley Cibber এর মৃত্যুর পর তাঁকে পোয়েট লরিয়েট বা রাজকবির আসন দেবার প্রস্তাব হয়—কিন্তু গ্রে সে সম্মানিত পদ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হন।

পর্দ্দার গায়ে

শ্রীতারক নাথ মুখোপাধ্যায়

(এক)

"বেশত—মেয়েটিকে আর একবার দেখে আসবি চল্—বেশী দূর ত' নয়। পছন্দ না হয়, তোকে আর অনুরোধ ক'রব না মৃণাল।" এই কথা বলে নিখিল তার বন্ধু মৃণালের কাঁধে হাত দিয়ে, মুখের পানে প্রায় মিনিট দুই চেয়ে থাকবার পরও যখন মৃণালের মুখ থেকে "হ্যাঁ" "না" কোন উত্তরই এল না তখন নিখিল মৃণালের কাঁধ থেকে হাতটা নামিয়ে নিয়ে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে, ক্ষুণ্ণস্বরে ব'ললে; "তা'হলে যাবিনি?"

"যাবনা," এইটাই আমার মনের কথা নিখিল, কিন্তু শুধু তোর মান রাখতে, তেতো ওষুধ গেলার মত, নিতান্ত অনিচ্ছাতেও একবার যেতে হবে আমাকে।

"না মৃণাল, তোর গিয়ে কাজ নেই। উপেক্ষা করবার মত মেয়ে, "মিনু" নয়। সুপাত্রের সম্ভবতঃ তার অভাব হবে না।" এই কটা কথা নিখিল বেশ একটু ঝাঁজ দিয়েই ব'ললে। মৃণাল, খপ্ করে নিখিলের হাতটা ধরে অনুযোগের সুরে ব'ললে: "মিথ্যে তুই রাগ ক'রছিস্ নিখিল! আমি ত' তোকে অনেক বারই বলেছি, যদি বিয়ে করতে হয়, তাহলে একটু লেখাপড়া জানা মেয়েকেই বিয়ে করব—অন্ততঃ আই, এ, পাশ। যে মেয়ে লোকের সঙ্গে সাহস করে দুটো কথা বলতে পারবে, যাকে কারো আগলে বেড়াতে হবে না, অবাধে চলা ফেরা করতে পারবে, দরকার হলে আমার অফিসের কাজ কর্মেও সহযোগিতা করবে।

"কিন্তু আমি বলি মৃণাল, এরকম সোনার মায়ামৃগ যে বনে চ'রে বেড়ায়, সেই খানেই বেড়াতে দিয়ো,—ঘরে আদর করে ডেকে এনে সারা জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তুলো না," এই বলে নিখিল হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে, যাবার উপক্রম করতেই মৃণাল বলে উঠল: "জান নিখিল, লেখাপড়া জানা মেয়েদের উপর, এই রকম নীচ কটাক্ষ যারা করে—তাদের আমি—

"ইতর বলি—এই ত'?" এই কথা বলেই নিখিল মৃণালের মুখের পানে চেয়ে একটু হেসেই হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে

বেশ একটু বিদ্রূপ করেই বলল : "তুমি কেন,—আজকাল লেখাপড়া, গান বাজনা জানা, অবাধে চলা ফেরা করা মেয়েদের সম্বন্ধে কোন রকম কটাক্ষ ক'রে কিছু বললেই, অনেকে ঐ আখ্যা দিয়ে থাকেন যদিও সেরকম কটাক্ষের মধ্যে প্রচুর সত্যি কথার অভাব থাকে না।"

মৃণাল—তাহ'লে, তুমি বলতে চাও যে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাটা নিতান্ত অন্যায়, তাদের স্বাধীনভাবে ঘুরে ফিরে বেড়ানো অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য ?

নিখিল—মেয়েদের লেখাপড়া শেখা কোন কালেই গর্হিত কার্য্য ছিল না আজও হ'তে পাবে না, তবে আজকালকার লেখাপড়া শেখার চেয়ে তার আতিশয্যটা এত বেশী যে সেটা আমি কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারি না—বরং ভয় করি। মৃনাল—রাস্তায় ঘাটে, এমন কি অনেক বাড়ীর ভেতরেও যে সব দুর্নীতির ঘটনা, দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, এতেও কি তোমাকে বলে দিতে হবে যে মেয়েদের স্বাধীন গতিবিধি একটা গর্ব্বের সামগ্রী ! যাক্ ভাই ওসব আলোচনায়, তোমার কল্পনাকে, আমি ক্ষুন্ন করতে চাই না তবে যে মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিতে চাইছিলাম, তাতে, কল্পনা হয়ত তোমার ক্ষুন্ন হ'ত—কিন্তু বাস্তবটা মাধুর্য্যে ভ'রে উঠত।" এই কথা বলেই নিখিল আর কোন উত্তরের আশা না করেই হন্ হন্ করে চলে গেল। মৃণাল অনেকক্ষণ নিখিলের যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইল পরে মুখে একপ্রকার শব্দ করে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল "হামবাগ।" তারপর পকেট থেকে 'সিগারেট কেস্‌টা' বার করে একটা 'সিগারেট' ধরিয়ে সামনেই একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ল।

(দুই)

নিখিল, মৃণালের ওপর বেশ একটু রাগ ক'রেই তার কাছ থেকে সরে এসে, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রায় পাঁচ মিনিট। তারপর কী ভেবে সোজা প্রতাপাদিত্য রোডের দিকে চলতে লাগল। প্রায় দশ মিনিট এমনি চলার পর একটী ছোট দোতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াতেই বারাণ্ডা থেকে "মিনু" ডাক দিল "নিখিলদা এই বুঝি তোমার পাঁচটা ?" নিখিল উপরের দিকে চাইল কিন্তু কোন কথা না কয়েই সোজা বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল।

বসবার ঘর। দামী জিনিষ দিয়ে না হলেও—সাজানো মন্দ নয়। নিখিল চেয়ারে বসে—'মিনু' তারই সামনের একটা চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে।

আক্ষেপের স্বরে 'মিনু' বললে "কেন তুমি আমার জন্যে অপমানিত হ'তে গেলে নিখিলদা ?"

"যদি অপমানিত হয়েই থাকি তার জন্য এতটুকুও দুঃখ আমার হয়নি মিনু' কিন্তু তোর মত মেয়েকে মৃণাল আজ উপেক্ষা করেই চলে গেল, বুঝলে না 'ষ্টুপিড্‌টা' যে কি রত্ন আজ হারালে সে, এই ভাবনাটাই আজ আমাকে বেশী দুঃখই দিচ্ছে।"

"নাঃ—তুমি দেখছি ভারী রেগেছো নিখিলদা। আচ্ছা মৃণাল বাবুর আমাকে পছন্দ হয়নি, এতে তোমার এতো রাগ কেন বলতো ? তাছাড়া সত্যিই ত' পছন্দ হ'বার মত আমার কিছুই নেই। না আছে রূপ—না জানি লেখাপড়া।"

"তোর রূপকে যে অবজ্ঞা করে সে হয়ত রূপ কখন দেখেনি। তা যাকৃগে মিনু—তার চেয়ে হাজার গুণে ভাল ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে একটা moral প্রতিশোধ নোব, এই রইল আমার পণ।"

"কিন্তু নিখিলদা—লোকে বলে, তোমার মত ভাল ছেলে নাকি, হাজারে একটী মেলে—যদি তাই সত্যি হয় তাহ'লে সেই রকম আদর্শের একটী সুপাত্রের সন্ধান কোরো—বুঝেছো ?" এই বলেই হাসি চাপবার জন্যই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

* *

"কী বলতে চায় মিনু ?" "সে কি তবে" ? "না—না তা হ'তে পারে না" এই রকম এলো মেলো চিন্তার গুরুভারে নিখিলের মনটা ব্যস্ত হয়েই উঠল।

* *

আবার সেই হাসি—তেমনি সরল—মন মাতায় কিন্তু তাতায় না। মুখ ফিরিয়ে নিখিল দেখল পর্দাটার একটা কোন ধরে মিনু দাঁড়িয়ে। কৃত্রিম কোপে নিখিল বললে "কি হচ্ছে মিনু—যাকে বলে দোব ?"

"তা দিয়ো—কিন্তু শীগগীর উঠে এসো নিখিলদা—এস না"—এই বলেই নিখিলের হাত ধ'রে এক রকম টানতে টানতেই বারাণ্ডায় নিয়ে গেল—

"দেখছো—কে যাচ্ছে ?"

নিখিল দেখলে—তারই বন্ধু মৃণাল—আর তার সঙ্গে একটী মেয়ে—তাকেও নিখিল চেনে। নিখিল কথা কইল না—কেবল একটিবার মিনুর মুখের দিকে চেয়ে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল ঘরের ভেতর—সেখান থেকেও শুনতে পেলে—'মিনুর' সেই হাসি—বারাণ্ডা থেকে ভেসে আসছে, দখিন হাওয়ায় গা মিশিয়ে।

তিন

এক বছর কেটে গেছে—মৃণালের বিয়ে হয়েছে, ভবানীপুরের নামজাদা ডাক্তার বিমল চ্যাটার্জ্জীর একমাত্র বিদুষী মেয়ে যমুনার সঙ্গে। আই, এ পাশ করে বি এ পড়া সুরু করতেই প্রজাপতির দূত মৃণালকে ডানা দিয়ে ঝাপটে নিয়ে এসে যমুনার হাতে সঁপে দিয়েছে। তন্বী, শ্যামা যমুনা তার সস্তু করা আধুনিকতার যাদুমন্ত্রে মৃণালকে এমনি হাতের মুঠোর মধ্যে করে ফেলেছে যে ছোট ছোট নাবালক দুটো ভাই আর বিধবা মায়ের ভার মাসিক মাত্র ১৫৲ টাকা ব্যবস্থায় কোন এক নির্ব্বোধ দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেও একটুকু দ্বিধা বোধ করেনি। লোকে নাকি মৃণালের এই রকম ব্যবহারে কানা ঘুসোয় অনেক কথাই রটিয়ে বেড়ায় কিন্তু মৃণালের প্রাচীন পন্থী বিধবা মায়ের নিজের দোষেই যে ছেলের রোজগারের অন্ন মাতে সইল না এটা পবিত্রীকান্তের লোকগুলো কিছুতেই বুঝবে না। বিদুষী পুত্রবধূ সকালে উঠে চা খায় না—দু'দশজন স্ত্রী, পুরুষ বন্ধু আসা যাওয়া করলেই শাশুড়ী ঠাকরুণ মুখ ভার করেন—সিনেমায় একটু আনন্দ করতে গেলেই শাশুড়ীর চোখে বেহায়াপনা, মনকে একটু হালকা করতে দু'একখানা—"নূতনের স্বপন দেখি বারে বারে" গোছের আধুনিক গান গলা ছেড়ে গাইলেই—শাশুড়ী ঠাকরুণ দু'শ কথা শুনিয়ে দ্যান—এই রকম অমার্জ্জনীয় অপরাধ প্রগতি মন্ত্রে পূর্ণ দীক্ষিতা কোন তরুণী সহ্য করতে পারে ? এরকম শাশুড়ীর,—বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করা ছেলের অন্ন সুখাদ্য কিছুতেই হতে পারে না।

মৃণাল ভেবেছিল যমুনার ভালবাসা সৃষ্টি ক'রবে একটা অনাবিল শান্তির স্বর্গ, তাই তার অভাব অভিযোগ দূর করতে মৃণাল কোনদিনই কুণ্ঠা বোধ করেনি। আর সেই জন্যেই যমুনার অসম্ভব রকম অমিতব্যয়িতার ফলে এক বছরের মধ্যে মৃণাল মস্ত বড় দেনাদার বোলে বাজারে সুনাম কিনে ফেলেছে। খরচ কমাবার জন্যে যমুনাকে অনুরোধ করলে—যমুনা যে সব কথা বলে ; তার ভাবার্থ অপদার্থ স্বামীদের হাতে পড়ে নারীদের যে কী লাঞ্ছনা হয় তার প্রমাণ সে নিজে।

* *

সেদিন শনিবার,—বেলা তিনটার সময় মৃণাল বাড়ী এসে দেখলে—যমুনা বাড়ী নেই—চাকর 'বঙ্কুকে' জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল—কোন এক বাবুর সঙ্গে বেলা বারোটার সময় মোটরে বেরিয়ে গেছে। কখন যে আসবে তাও বলে যায়নি। অফিসের পোষাকটা খুলে ফেলে বারাণ্ডায় বসে এক কাপ চা নিয়ে মৃণাল অনেক কিছুই ভাবতে লাগল। এমনি করেই সময় কাটিয়ে দিল বেলা পাঁচটা অবধি। চাকর বঙ্কু জিজ্ঞাসা করলে "বাবু বেড়াতে যাবেন না" ? মৃণাল জবাব দিল না—তেমনি নিশ্চল হয়েই বসে রইলো। সন্ধ্যা ছ'টা বাজল—রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে উঠলো কিন্তু মৃণালের মনের ভেতরটায় গাঢ় অন্ধকার যেন জমাট হয়ে উঠল বিভীষিকার সৃষ্টি করতে। কখন যে রাত আটটা বেজে গেছে মৃণাল জানতেও পারেনি।

চাকর 'বঙ্কু' এসে বললে 'বাবু খেতে আসুন'। মৃণাল যেন স্বপ্ন দেখছিল—হঠাৎ সেটা গেল ভেঙে, বিহ্বলের মত বঙ্কুর মুখের পানে চেয়ে মিনিট খানেক পরে বললে—কিছু বলছিস্ আমাকে ? "হাঁ বাবু—খাবার দেওয়া হয়েছে"।

"কটা বেজেছে রে ?"

"আটটা বেজে গেছে"

"তোর মা আসেনি ?"

"না—বাবু।"

"তোরা খেয়ে নে—আমার শরীরটা ভাল নেই। খাব না। এই বলে উঠে দাঁড়াতেই সিঁড়িতে পরিচিত হিলওলা জুতোর খট্‌খট্ আওয়াজ কানে যেতেই সেই দিকে চাইল। যমুনা এল তারই সামনে—তার আজকের বেশ একটু তারিফ করবার মতই। মৃণালের মনটা বিষিয়েই ছিল—যমুনার আজকের নির্লজ্জ বেশভূষা—আর এত

রাত্রি পর্য্যন্ত না জানিয়ে বাইরে থাকায়—গুমরে থাকা তেতো ভাবটা, হাউয়ের মত দপ করে জ্বলে ওঠে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়ার মতই ঠেকল। তাই বেশ একটু দৃঢ় স্বরেই মৃণাল বললে "কোথায় ছিলে এতক্ষণ শুনি ?" যমুনা এরকম কথা শুনতে একেবারেই অনভ্যস্ত, তাই প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে এক মিনিট চুপ করে রইলো ; পরে স্বামীর দিকে বক্রদৃষ্টিতে একবার চেয়েই বললে—"গেছলুম আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে।"

"বন্ধুর বাড়ীতে—সে বন্ধুটি স্ত্রীলোক না পুরুষ ?"

"কোন্‌টা শুনলে খুসী হও ?"

"খুসী কিছুতেই হই না—তোমার ব্যাভার, চাল চলন—আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। মেয়ে মানুষকে প্রশ্রয় দিলে ফল যে তার ভাল হয় না আজ আমি বুঝতে পেরেছি। আজ নিখিলের সব কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে।"

"কী কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ?"

"থাক্ সে সব শুনে তোমার প্রয়োজন নেই—কিন্তু একটা কথা বলে দিই যমুনা বাড়াবাড়ী অনেক করেছো সহ্যও করেছি অনেক—কিন্তু এটা জেনে রেখো—সহ্যেরও সীমা আছে"—এই বলে মৃণাল নিজের শোবার ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল—

ঠিক তার পরেই নীচের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ তার কানে গেল। যমুনা তড় তড় করে নীচে নেমে গেল—খিল খুলে দেওয়ার শব্দ মৃণাল স্পষ্ট শুনতে পেলে—কানটা খাড়া করে রইল ; কিন্তু শোনা কিছুই গেল না। বিছানা থেকে উঠে আস্তে আস্তে সিঁড়ির ধারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল—

(চার)

"আজ আর যাওয়া হবে না মিঃ রায়।"

"কেন ?"

"সে অনেক কথা"

"ওঃ বুঝেছি, মিঃ ব্যানার্জ্জি বুঝি মত দেন নি ?"

"না"

"তিনি বুঝি ?—

"চুপ" এই বলে যমুনা একবার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখবার চেষ্টা করলে।

মৃণালের মাথার ভেতর যেন সমস্ত রক্তটা জমাট হয়ে উঠল।

"তা হলে তুমি যাবে না ? অপরাজিতা তাহলে দুঃখিত হবে।"

"না মিঃ রায়, আজ থাক"—

"বেশ থাক্—।" এই বলে তরুণ ব্যারিষ্টার মিঃ রায় চ'লে যাবার উপক্রম করতেই যমুনা বলে উঠল—আচ্ছা চলুন—যাচ্ছি—এই বলেই স্বামীকে না জানিয়েই যমুনা বঙ্কুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে জেগে থকতে হুকুম দিয়ে সশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল—

মোটরের আওয়াজ—হর্ণের শব্দ—কানে এল মৃণালের—মৃণাল সিঁড়িতেই বসে পড়ল—কিছু বলতেও পারল না—বলবার শক্তিও বোধ হয় ছিল না। সামনের বারান্দা দিয়ে দেখল—মোটর ছুটেছে—আর কানে তার আওয়াজ এল তরঙ্গায়িত হাসির শব্দ।

কতক্ষণ যে মৃণাল অমনি করে বসেছিল—জানতেই পারেনি—হঠাৎ কী যেন একটা করুণ সুরে তার চমক ভেঙে গেল। ঠিক সেই সময়ে ঘরের ভিতরকার ক্লকটায় ঠং ঠং করে দুটো বাজল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মৃণাল ঘরে উঠে গেল—বিছানায় বসে সামনে টাঙানো যমুনার ফটো খানার দিকে চেয়েই তার মনটা ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘর থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এসে বারাণ্ডার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল—সামনের পার্কের মেহেদী পাতায় ঘেরা বেড়ার ধার দিয়ে কে একটা লোক গাইতে গাইতে যাচ্ছিল—

"আমায় পথ দেখায়ে দাও
সকল স্মৃতির মাঝখানে মোর
ঘোমটা টেনে দাও"

মৃণাল বারাণ্ডায় তেমনি রেলিং ধরেই রাত্রিটা প্রভাত ক'রে দিল। দারুণ অবসাদে মৃণালের দেহটা যেন এক রাত্রেই অনেকখানিই ভেঙে পড়েছে।

বঙ্কু চা নিয়ে এল—মৃণাল বিরক্তির সুরে বললে "যা—যা—চা চাই না" বঙ্কু বাবুর রাগের কারণ আগেই বুঝেছিল

তাই কিছু না বলেই ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। মৃণাল শার্টটা গায়ে চড়িয়েই বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। একখানা ট্যাক্সি যাচ্ছিল তাকে থামিয়ে বললে—"ভবানীপুর।"

মৃণালের শ্বশুর বিমলবাবু একটা "কল"এ বেরুচ্ছিলেন—হঠাৎ মৃণালকে দেখে—ড্রাইভারকে 'স্টার্ট' বন্ধ করতে বলেই মোটর থেকে নেমে এসে মৃণালকে জিজ্ঞাসা করলেন মৃণাল তোমাকে দেখে ত' মনে হচ্ছে শরীরটা তোমার ভাল নয়—চল চল ওপরে চল। আমার আবার একটা জরুরি "কল" আছে—তা হোক্ পরে গেলেই চলবে। মৃণাল চুপ ক'রেই রইল। যমুনা যে কাল রাত্রে বাড়ী ফেরেনি এখানে এসেছে কিনা সেটা জানবার প্রবল ইচ্ছাটা বুকের মধ্যে তোলপাড় করে উঠল কিন্তু কি একটা দারুণ দুর্ভাবনা তার বলবার শক্তিটাকে যেন গ্রাস করেই নিল। হঠাৎ মৃণাল বিমলবাবুর হাত ছাড়িয়ে ট্যাক্সিতে উঠেই ব'লল—বালিগঞ্জ—জলদি—। নির্ব্বাক বিস্ময়ে বিমল ডাক্তার সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল ঠিক যেন বজ্রাহতের মত।

* *

বছর ঘুরে গেছে—। নিউসিনেমায় 'অসম্ভব ভিড়—রাস্তায় লোক ধরে না। মোটরগুলোর হর্ণের শব্দে রাস্তাটা যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। একখানা নূতন ছবির আজ উদ্বোধন।

চিত্রগৃহের সামনে 'সাইনবোর্ড' ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে 'হাউস ফুল'। নিখিল সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল—নিরাপদে নয় ভিড়ের মধ্যে বেশ দু'একটা ধাক্কা খেয়ে অতিষ্ঠ হয়েই চলেছিল। তখন সিনেমায় 'ইন্টারভ্যাল' তবুও কী ভিড—। হয়ত এরা পরের 'Show' এ টিকিট কেনবার জন্যই ব্যস্ত কিম্বা শুধু ভিড করে মজা দেখবার জন্যেই আশে পাশে ঘুরছে। হঠাৎ নিখিলের নজরে পড়ল কে যেন তারই চেনা একজন 'সোডাফাউন্টেনের' সিড়িতে গালে হাত দিয়ে বসে। "একি। মৃণাল। হ্যাঁ মৃণালই ত'।

"মৃণাল' এই বলে এগিয়ে গিয়ে মৃণালের হাতটা ধরল। মৃণাল সোজা দাড়িয়ে উঠেই একটু হাসবার চেষ্টা করল, যেন জানাতে চায় তার কিছুই হয়নি।

"নিখিল—হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। তোর সঙ্গে মিত্রর বিয়ে হয়েছে শুনেছি নিমন্ত্রণ পত্রও পেয়েছিলাম কিন্তু লজ্জায় যেতে পারলাম না। অতীতের অনেকগুলো কথা আমাকে যেতে বাধা দিল—তাই ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারলাম না। তোরা সুখী হ'। এই প্রার্থনাই করি।

তোর কি চেহারা হয়েছে মৃণাল—অবশ্য এমনি হওয়াই স্বাভাবিক—তা যাক্ যমুনার সন্ধান কিছু পেলি?

মৃণাল অনেকক্ষণ নিখিলের মুখের দিকে চেয়ে ম্লান হাসিতে মুখখানা আরও ম্লান করে ব'লল; পেয়েছি নিখিল তার সন্ধান, এই আজ একটু আগেই পেলাম। কিন্তু—

পার্থেন্দু গাঙ্গুলী

সুধীর কুমার

এবারেব অর্চ্চনা অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝাব ভিতর দিয়া বাহিব হইল! মাত্র চাব পাঁচ বৎসর সুধীর কুমার চন্দ্র তাঁর বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস চন্দ্রের নিকট হইতে অর্চ্চনাব সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিয়া একাগ্রচিত্তে অর্চ্চনা পরিচালনার সাধনা কবিতেছিলেন, এমন সময় কি এক দুর্দ্দমনীয় ঝড়ের মাজে মৃত্যু ওৎ পাতিয়া ছিল তা কে জানত? তাঁর প্রিয়তমা ‘অর্চ্চনার’ কাছ হইতে মাত্র ২৬ বৎসব বয়সে তাঁকে গ্রাস করিয়া লইল—তিনি গত ১৫ই ডিসেম্বব ১৯৩৮ সালে বাত ৭টা ২৪ মিঃ সময় মাত্র তিন মাস অসুখে ভুগিয়া ইহজগৎ ত্যাগ কবিয়াছেন।

পরলোকে সুধীর কুমার

শ্রীকমলা কান্ত বসু

মহাকালের মহাতূর্যের ফুৎকারে জীব জগতের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়। এই প্রদীপ কেনই-বা প্রজ্বলিত হয় আর কেনই-বা নির্বাপিত হয়—এ প্রশ্ন বড় সহজ প্রশ্ন নয়—এই একটা প্রশ্নই মানুষের চিন্তা-সমুদ্র মথিত করে' যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তা' এতই বিশাল যে তার না আছে আদি না আছে অন্ত।

কাল অনন্ত, পৃথিবী বিপুল। এই বিপুলা পৃথ্বীর অন্তর্গূঢ় রহস্যই যখন আগাগোড়া উদ্ঘাটন করা আমাদের সাধ্যাতীত; তখন অনন্তকালের নিগূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি আমাদের কতটুকু? এই সকল রহস্যের যিনি মূলাধার, সেই পরম রহস্যময় অবাঙ্মনসগোচর কালাতীত পরাৎপর পরমেশ্বরই সে রহস্যের মর্ম্মবোধ করেন। কিন্তু রহস্য বলে' তাঁর চোখে কিছুই নেই,—যা' মানুষের কাছে তমসাচ্ছন্ন ঘন কুজ্ঝটিকার ন্যায় অস্পষ্ট, তা' তাঁর সামনে মধ্যাহ্নের খর দিবালোকের সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল!

ভাবি,—এই যে বিরাট্ জগৎ—এর একদিকে নব নব সৃষ্টি, আর একদিকে পলকে পলকে ধ্বংস। কেন এই সৃষ্টি—কেন এই ধ্বংস? কেন এই জন্ম—কেন এই মৃত্যু? কেন এই আসা—কেন এই যাওয়া? কেন এই বন্ধন—কেন এই বিচ্ছেদ? এই "কেন" বিরাট্ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে তখন, যখন আমাদের চোখের ওপর থেকে চলে' যায় কোন আত্মজন মহাকালের করাল শিঙার নিঃশব্দ আহ্বানে—চলে' যায়, আর ফেরে না।

আমরা পড়ে' থাকি এখানে তার স্মৃতি নিয়ে, আহা, কত দিনের সে স্মৃতি—যার পরতে পরতে জনক জননী—সহোদর সহোদরার অকৃত্রিম অতল অসীম স্নেহ—মমতা—প্রীতি; যার পরতে পরতে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-পরিচিত-আশ্রিতজনের শ্রদ্ধা—প্রেম—ভালবাসা, যাতে কপটতা নেই, নিবিড়তা আছে।

যার বা যাদের স্মৃতি নিয়ে আমরা পড়ে থাকি—এমন দিন আবার আসবে সেদিন আমাদের স্মৃতি নিয়ে আর কেউ পড়ে থাকবে না। এই বোধ হয় কুটিল কালের চরম লিখন। এ লিখনের ওপর মানুষের হাত নেই এতটুকু।

এই যে জীবন, একে দশ দিকে ঘিরে রয়েছে মৃত্যুর অনন্ত অদৃশ্য উর্ম্মিজাল—এ যেন কালসিন্ধুর বুকের ওপর ফুটে রয়েছে রূপরসগন্ধসমন্বিত বিকচ প্রফুল্ল শ্বেতশতদলের মত কিংবা যেন স্রোতে একখানা ভেলা কখন কিভাবে ভেসে যাচ্ছে, কোন্ পথের উদ্দেশে ভেসে চলেছে, তার সঠিক নির্দ্দেশ নেই। এই জীবনে যখন মৃত্যুর স্পর্শ পড়ে, জীবন-শতদলে যখন মৃত্যু-কীট বাসা বাঁধে, জীবন-ভেলা যখন অকস্মাৎ ডোবে—তখনই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে মধুর সম্বন্ধ তা' টুটে যায়, টুটে যায়, টুটে যায়, দিবাশেষে নৈশস্বপ্নের ন্যায়—এত অকস্মাৎ যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মর-জগতের গ্রন্থিবন্ধন যে কত ক্ষণিক, কত ক্ষণস্থায়ী, তা' কারও বুঝতে এতটুকু বিলম্ব হয় না।

মর-জগতের গ্রন্থিবন্ধন ছিন্ন করে মৃত্যু—একে ভীষণ বল, পাষাণ বল, ক্ষতি নেই।—মানুষের এই নিয়তি। কিন্তু এই নিয়তি কি মৃত্যুর পরেও? মৃত্যুই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে সেতু বন্ধন করে মৃত্যু।

আজ আমাদের মাঝখান থেকে এমন একজনকে মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, যাঁর স্মৃতি আমাদের অন্তরের পরতে পরতে উদ্বেল হ'য়ে উঠ্ছে। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় 'অর্চনা'য় লেখার সূত্রে। ১৩৩৬ সালে 'অর্চনা'য় আরও বেশী করে' লেখ্বার জন্যে তাঁর অজস্র অনুরোধ আমার কাছে এসেছে। তিনি 'অর্চনা' সম্পাদন করেছেন মাত্র বছর দু'এক, কিন্তু আমার রচনার ও রচনাশক্তির অনুরাগী ছিলেন বরাবর। এই অনুরাগ থেকেই তাঁর প্রতি আমার সৌহৃদ্যের সূত্রপাত হয়। মৃত্যুর মাস কয় পূর্ব্বেও 'অর্চনা' সম্বন্ধে বহুবার আমার সঙ্গে তাঁর অনেক আলোচনা ও প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা হয়—সেই সময় আমি বুঝতে পারি 'অর্চনা'র ভার নিয়ে 'অর্চনা'কে নানাদিক্ দিয়ে জনপ্রিয় করবার আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রায় তাঁর কত

সুদূর প্রসারী ও সুগভীর ছিল। 'অর্চ্চনা'কে সুসমৃদ্ধ করে' গড়ে' তোলবার অনেক 'স্বপ্ন' নিয়ে তিনি আমাদের কাছ থেকে কালের করাল আহ্বানে চিরবিদায় নিয়েছেন—'স্বপ্ন' এইজন্যে যে, তিনি তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী বঙ্গ-ভারতীর অর্চ্চনার আয়োজন শেষ পর্য্যন্ত করে যেতে পারেন নি—এ তাঁর অক্ষমতা নয়, অবহেলাও নয়, সুযোগের অভাব। তাঁর অকাল মৃত্যু তাঁকে তাঁর অন্তরের মহাস্বপ্ন সার্থক ও কার্য্যে পরিণত কর্‌বার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। আমরা তারই মত বাণী-অর্চ্চনার একজন নিঃস্বার্থ সেবক। তাঁর আকস্মিক তিরোভাবে বাণী-মন্দিরের একজন তরুণ সেবকের অভাব আমরা বিলক্ষণ অনুভব করছি,—আরও এইজন্যে যে, তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয়ের ও সৌহার্দ্দ্যবন্ধনের সুযোগ ঘটেছিল। মৃত্যু আমাকে একজন প্রিয়ভাষী, অকপট অনুরাগী, সুদর্শন বন্ধুর সঙ্গ থেকে বিচ্ছেদের দুস্তর দূরত্বে ঠেলে দিয়েছে—এ কেবল আমাকে নয়, আরও অনেককেই, কেননা তিনি জনপ্রিয় ছিলেন।

এই বিচ্ছেদের দারুণ দুঃসংবাদ আমাকে বিহ্বল করেছে, আরও এইজন্যে যে, গত ২৬এ অগ্রহায়ণ সন্ধ্যায় আমি তাঁর বাড়ীতে গেছি—মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে যে মহাকালের আকস্মিক ফুৎকারে তাঁর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হবে, তা' কে তখন জান্‌ত? আমার বয়ঃ কনিষ্ঠ হ'লেও, তিনি তাঁর নিজগুণে আমার হৃদয় অধিকার করেছিলেন। বিচ্ছেদ-বিহ্বল চিত্তে আজ তাই ভাবি—উঃ, কি নিদারুণ সেই ২৯এ অগ্রহায়ণের সন্ধ্যা!—তাঁর জীবনের অকালসন্ধ্যা!

অকালে প্রয়াণ স্মরণে—

—শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

আবার ফাগুন্ এলো, কুসুম-গন্ধে ভরে দিক্,
নীপন শাখার 'পরে কুহরিছে বারে বারে পিক্।
ঝুলনে ঝুলিবে ব'লে যমুনার তীরে নীপ-বনে…
আসে আভীরিণী-বালা ফাগুনের দোলা-লাগা-মনে;
হাতে কুঙ্কুম ফাগ্, রঙগে কি গোঁয়াইবে রাতি?
নীল যমুনার জল রাঙাইল করি মাতামাতি।
সে-রঙের ছোঁওয়া লেগে রাঙিল কুমারী-মন যত,
সে-খেলা হেরিল নভে রজনীর তারা-বধূ শত।
এমন ফাগুন্ দিনে রহি' রহি' বেদনা উথলে,
বাণীর পূজারী তুমি কোথা আজ তাঁর বেদী-তলে?
নব কলেবরে পুনঃ সাজাবে না "অর্চ্চনা" তব?
শুনাবে না আর বার সত্যের মহিমা সে নব?
সবতে বাসিয়া ভালো, প্রীতি-ডোরে বাঁধিয়া সবায়,
অকালে সকল ফেলি' কেন গেলে দূর অমরায়?
সম্পাদনার ভার দিল কি দেবতা তব 'পরে?
তোমারে হারায়ে হেথা অশ্রুতে সব আঁখি ভরে।
ব্যাধি-শোকাতুর তব জনকের আঁখি-পুরোভাগে…
তোমার জননী-স্মৃতি আবার নূতন ক'রে জাগে!
যেথায় আসন তব আজি এই ফাগুন্ দিনে…
অশ্রু-প্রবাহগুলি যাবেনা কি সেথা পথ চিনে?

মৃত্যু

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

পৃথিবীতে মানুষ যেমন জন্মে, মরেও তেমনি। জীব মাত্রই ধ্বংসশীল, অমর কেউ নয়। আমরা অনেক সময় কিছু নষ্ট হয়ে গেলে দুঃখ করি, কষ্ট পাই, পরম সত্যকে সেই ভুলের মাঝে হারিয়ে ফেলি।

মাটির পৃথিবীর বুকে জমে আছে স্নেহ প্রীতি ভালবাসা, অনেক দূরে থাকে যারা, একেবারে নিঃসম্পর্কীয় যারা—তারাও হয় আপন, তারাও আসে কাছে। এই জন্যই পৃথিবী এত সুন্দর, মাটির মানুষ মাটিকেই ধ'রে থাকতে চায়, স্বর্গে যেতেও তার ইচ্ছা করে না।

মানুষ তাই চায় যা সে ভালবাসে, যাদের সে ভালবাসে, তা সবই যেন অটুট ভাবে বর্ত্তমান থাকে।

আমরা ঠিক এই মনোভাবেই পোষণ করি যাদের ভালবাসি—তারা যেন ভালো থাকে, সুখে থাকে, অসময়ে তারা যেন না চলে যায়। নিয়মিত সময় আমরা ঠিক করে রাখি—যে সময়টা পৃথিবীকে উপভোগ করে নেওয়া যেতে পারে, চাওয়ার ও পাওয়ার আশায় মিটে যায়। সেই সময়ের আগে কেউ যদি চলে যায়, আমাদের দুঃখের সীমা থাকে না।

এই কথা বলতে আজ সুধীর চন্দ্রের কথাই মনে হচ্ছে। পরিচয় তার সঙ্গে একটি দিনের নয়, অনেক দিনের। কোনদিনই ভাবতে পারিনি—অমন স্বাস্থ্যসুন্দর চেহারা যার, সে এমন তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারে। কিন্তু সে চলে গেছে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, আজ তার স্মৃতিটাই শুধু মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মৃত্যু আসবেই—ধ্বংস অনিবার্য্য তা জানি—জগতের সবাই জানে, তবু যে যায় তার জন্য চোখের জল ঝরে পড়ে, মনে হয়—কেন এসেছিল, কেন চলে গেল, ধরণীর মায়া তাকে এত অল্প বয়সে ত্যাগ করতে হ'ল কেন? তার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব—পরিচিত সকলকে নিদারুণ দুঃখ দিয়ে কেন সে চলে গেল?

আজ তার শোকার্ত্ত স্বজনকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নাই, নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার কিছু নাই, তার পরলোকগত আত্মার জন্য প্রার্থনা করার ভাষাও যেন ফুরিয়ে গেছে। তবু বলতে হয়—চোখের জল মুছে ব্যথিত কণ্ঠে তবু ভাষা ফুটাতে হয়,—বলি—তোমার আত্মা সান্ত্বনা লাভ করুক, শান্তিধামে বিশ্রাম কর। আমরা তোমার বিয়োগে যত দুঃখই পাই—সে তোমার স্মৃতি, সেই দুঃখই আমাদের একদিন সান্ত্বনা দেবে।

বন্ধু-বিরহে

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

মানুষের কাছে মানুষের দাবী অসীম,—এই অনুভূতি নিয়েই আমরা মানুষের সাথে পরিচয় করি, আর শেষে সেই পরিচয় আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব আনে। নানান সুখ দুঃখের ভেতর দিয়ে সমস্ত মন যখন শ্রান্ত হয়ে উঠে তখনই আমরা ছুটি সেই বন্ধুর কাছে একটু হাসি আনন্দ দিয়ে মনকে সতেজ করে নেবার জন্যে। বন্ধু বুঝিয়ে দেয় এই একঘেয়ে জীবনের সার্থকতা আছে। সুধীরচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আমি এই কথাটাই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি।

কায়ারূপী সুধীর চন্দ্রকে মহাকাল খুব অকালেই নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত আমাদের কাছ হ'তে চিরদিনের জন্যে নিয়ে গেছে। কিন্তু বিরহের প্রাচীর ভেদ করেও ছায়ারূপী বন্ধু আমার এখনও আমাদের সকল হাসি আনন্দের মাঝে যোগ দিচ্ছে,—এই সত্য ও সার্থক সান্ত্বনাকেই আমি আমার জীবন পথের পাথেয় করে নিয়েছি।

—"জীবনেরে কে রাখিতে পারে
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।"

একথা জানি। তবে বন্ধুর চির-মধুর হাস্যরঞ্জিত মুখখানি হৃদয়-পটে চিরকাল আঁকা থাকবে। তবু মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে কোনও এক ব্যথাভরা মুহূর্ত্তে প্রিয়তম বন্ধুর পরিপূর্ণ সঙ্গলাভের জন্যে। মন কোনও যুক্তি মানতে চায় না তখন কোনও সান্ত্বনাই উজ্জ্বলরূপ নেয় না। তখন সমস্ত দেহমন পেতে চায় শরিরীর সত্ত্বা দিয়ে ঘেরা নিছক জীবন্ত মানুষটীকে।

বন্ধুর কাগজে তারই স্মৃতিকথা গুছিয়ে লেখার মত মনের অবস্থা আজ আমার নয়। একজন সত্যকার প্রেমিক বন্ধুর বিরহে আর একজনের জীবন কেমন পঙ্গু হ'য়ে যায় আজ আমি তা গভীর ভাবেই উপলব্ধি করেছি। খুব প্রিয়জনকে মানুষ যখন হারায়, তখন তাকে আর কখনও দেখতে পাবে না, এই দুঃখে সে কাঁদতে চায়। আমিও তাই চাই। চিরদিন আমাকে অশ্রুভরা চোখে বন্ধুবরের অভাব অনুভব করে যেতে হবে।

উদয়াস্ত স্রোত-ভাটা আছে তবু সীমা ও সময়

—শ্রীবিভাকুসুম চট্টোপাধ্যায়

হে সুধী ঃ দরদী বন্ধু জীবনের মধ্যাহ্ন বেলায়—
কাজ ফেলে দিয়ে তুমি গেলে কোন নভের সীমায়!
কাঁদিছে সবাই প্রিয় বিচ্ছেদের ব্যথা লয়ে বুকে
মর্ম্মভাঙ্গা অশ্রুমাল্য ডালি দেয় নতমৌন-মুখে
পরিপূর্ণ যৌবনের আকাঙ্ক্ষায় উচ্চ মন লয়ে
দরাজ ছিলে যে প্রিয় অকস্মাৎ কোথা গেলে র'য়ে!
মর্ত্ত্যের প্রদীপ এক নিভে গেল দুরন্ত-ঝঞ্ঝায়,
ক্ষণিকের আলোকেতে চেনাইলে তুমি আপনায়,
সূর্য্যের উদয় সত্য, শাশ্বতও অস্তগামী রবি—'
কালের নির্দ্দেশ মত চলাফেরা করিতেছে সবি
উদয়াস্ত স্রোত-ভাটা আছে তবু সীমা ও সময়।
চৌর্য্যবৃত্তি অকালের চিরন্তন চলে তার জয়।
তাই বুঝি প্রিয়তম পারিল না তোমারে রাখিতে—
বহু বাহু বিস্তারিয়া অকালেরে নারিল রুধিতে
নির্ব্বাক ক্রন্দন দহে, হৃদয়ের মৌন বেদনার
অশ্রুর অঞ্জলি শুধু নাহি কোন বাণী সান্ত্বনার।
চির অভিসারে তব জলে যায় ব্যথা গন্ধ ধূপ—
ধূম্রের কুণ্ডলি গাঢ় ফুটে ওঠে স্মরণের রূপ।
ওগো প্রিয় কর্ম্মপ্রার্থী লহ কাজ এসে নিজ করে;
ভাঙ্গা-কাজ ডাকে তোমা কাঁদি ফেরে অম্বরে অম্বরে
"কোথা প্রিয়তম" বলি কাঁদে তব অর্চ্চনা প্রেয়সী!
ভুলে আছ তারে তুমি ছিল তব বিশ্বের শ্রেয়সী;
অবিশ্রান্ত স্মৃতি তব জ্বলিতেছে সকলের মনে।
করুণ বিদায় নিলে সঙ্কুচিত করিয়া জীবনে!

সুধীরবাবুর সহিত আমার পরিচয়

শ্রীনলিনীকুমার নাগ-চৌধুরী

সুধীরবাবু যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাহার সহিত আমার পরিচয় ছিল; কিন্তু বন্ধুত্ব ছিল না। মৃত্যুর পর তিনি আমার বন্ধু হইলেন!

মানুষ মানুষকে যদি একেবারে চিনিতে পারিত, তাহা হইলে জগতের অনেক কিছুই সমস্যার সমাধান হইত।—সুধীরবাবুর সঙ্গে যাঁহারা প্রথম আলাপ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রথমে নিরাশ হইয়াছেন,—এ কথা আমি কতকটা জোরের সহিত বলিতে পারি। প্রথম আলাপে তাঁহাকে অল্পভাষী ও অহঙ্কারী বলিয়া মনে হইত। তাই বলিয়া তাঁহার যে অহঙ্কার ছিল না,—তাহার পরিচয় আমি না পাইলেও,—এ কথা বলি না।

আমার একটা বড় প্রবন্ধ যাহা ধারাবাহিকরূপে বাহির হইবার কথা,—এক সংখ্যার পর আর তাহা না প্রকাশিত হওয়ায় আমি একদিন অর্চ্চনা আফিসে যাই; সুধীরবাবু তখন proof দেখিতে ছিলেন; জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি?" তিনি—"হাঁ, এই আসছে মাসে বার হবে" ইত্যাদি স্বল্প বাক্যে উত্তর দিতে লাগিলেন, কিন্তু ভাল উত্তর পাইলাম না। মন আমার তাহাতে তত বিরক্ত হইল—কিন্তু তখন ত বুঝিতে পারি পারি নাই যে তিনি সেই প্রবন্ধটা হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং এই যে নীরবতা, ইহা আর কিছুই নহে—স্বচ্ছ সরলতা। যেন কত অপরাধী! অপরাধী মন বলিতে বলিতেও পারিতেছে না!

আমার পরম বন্ধু শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় সুধীরবাবুর সহিত আমার আলাপ হয়। উক্ত দুই বন্ধু পরস্পর অভিন্ন হৃদয় ছিলেন; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, শেষে সুধীরবাবুর কাছে সারদাবাবু অপেক্ষাও আমি প্রিয়তর হইয়াছিলাম। অর্চ্চনা সম্পাদক মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে আসিতেন; গল্পগুজব হইত। আমার লেখা তাঁহার ভাল লাগিত; আমার লেখা তিনি মন দিয়া শুনিতেন; মর্য্যাদার সহিত বাহির করিতেন। আমার লেখা তাঁহার এত ভাল লাগিত যে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা।

মৃত্যুর দুই-তিন মাস আগে হইতে তিনি আমার বাড়ীতে খুব ঘন ঘন আসিতেছিলেন; তখন আর তাহাকে আমি অহঙ্কারী ভাবিতাম না—তখন আমারই মন অপরাধী হইয়াছিল; কিন্তু যখন তাহার বন্ধুত্বকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিতে গেলাম, মৃত্যু তাহার পূর্ব্বেই আমাদের দুইজনকার মাঝখানে যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছে। তাই আগেই বলিয়াছি, মৃত্যুর পর তিনি আমার বন্ধু হইলেন।

এই বন্ধুত্ব কি রকম? এই সৌহৃদ্যের মধ্যে যুগপৎ আশা ও নৈরাশ্য, পূর্ণতা ও অপূর্ণতা—বিরাট আনন্দ ও দুঃখ আছে। যখন তাহাদের ছাড়িতে চাই,—তাহারা ছাড়ে না; যখন তাহাদের ছাড়িতে চাই না,—ব্যথার সমুদ্র আরো ফুলিয়া উঠে!

বিয়োগ-ব্যথা

—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

অকালে তোমারে নিল মহাকাল বক্ষে তার টানি,
উদয় না হ'তে রবি অস্তাচলে করিল প্রয়াণ;
তবু তুমি হে সুধীর, রবে স্থির স্মৃতিপটে জানি —
চিরতরে সমুজ্জ্বল,— গরিমায় প্রদীপ্ত অম্লান!
তোমার সারল্য-প্রীতি, মধুময় সৌজন্য তোমার,—
একনিষ্ঠ সেবা তব 'অর্চ্চনার' বাণীর মন্দিরে—
সেনা জানে,—ভুলিতে তোমারে কভু পারিবেনা আর;
বিয়োগ-বেদনা তব ছিন্ন করে হৃদয়-তন্ত্রীরে!
ও-পারে সু-ধীর তুমি,—মোরা হেথা অধীর হিয়ায়
স্মৃতির তর্পণ তব করিতেছি নয়ন ধারায়!

সুধীর কুমার চন্দ্র

(শ্রীমেঘেন্দ্র লাল রায়)

শ্রদ্ধেয় সুধীর চন্দ্রের সহিত আমার পরিচয় হয় যখন আমি অর্চ্চনায় প্রবন্ধাদি লিখি—। যদিও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ আমার ঘটে নাই তথাপি তাঁহার মধুর ব্যক্তিত্বের ছাপ আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান—মনে আছে এক শীতের সন্ধ্যায় তিনি আমার বাড়ীতে বালীগঞ্জে আমার প্রিয় বন্ধু অনিল কুমার ভট্টাচার্য্যের সহিত আসিয়াছিলেন—

সাহিত্য প্রীতির সুমোহন মূর্ত্তি লইয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। অর্চ্চনা যাহাতে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে তৎ নিমিত্ত তাঁর কতোই আগ্রহ দেখি! কথায় কথায় তাঁহাকে বলি যে সাময়িক মাসিক পত্রিকায় কেবল চুটকী সাহিত্যের প্রসার দেখিতে পাই গল্পের প্রাচুর্য্য, প্রবন্ধ ও প্রকৃত সমালোচনার বিরাট দৈন্য অনুভব করি। সুধীর বাবু বলিলেন তিনিও সেই মত পোষণ করেন। তিনি আমার ন্যায় প্রায় বৃদ্ধত্বের কোটায় আসেন নাই তাঁহার মুখে একথা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলাম। তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল আর্ট, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে Carlyle, Tolstoy, Thackeray ও বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র লাল শরৎচন্দ্রকে লইয়া অনেক আলোচনা হইল। তাঁহার সহিত আলোচনায় যে সব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে বিষয়ে তিনি আমায় প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন—শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমি অর্চ্চনাতে প্রবন্ধ লিখি।

তখন তিনি বলিয়াছিলেন আরো আলোচনা করিবেন কিন্তু সে সুযোগ আর ঘটে নাই।

অতি অল্প পরিচয়ে তরুণ সম্পাদকের মধুর ব্যক্তিত্ব আজও চিত্তপটে অতীতের সুখ স্মৃতির ন্যায় বিরাজ করিতেছে। যখন শুনিলাম বন্ধু অনিলকুমারের মুখে যে তিনি বিশেষ পীড়িত, তখন ভাবি নাই যে তিনি আমাদের নিকট হইতে এত শীঘ্র চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন।

তাঁহার সাহিত্য প্রীতি সাহিত্য সেবায় নিষ্ঠা ও পবিত্র চরিত্রের মাহাত্ম ও ঔজ্জল্য আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল।

তাঁহার বিশেষ প্রিয় অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য যে তাঁহার স্বর্গগত বন্ধুবরের পত্রিকা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় তাহার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। এ সংবাদে আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

আমরা সুধীর চন্দ্রকে আজ কি দিতে পারি—তিনি আজ বহুদূরে—পুণ্য স্মৃতির হস্তে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রেরণ করি ও তাঁহার শোকার্ত্ত আত্মীয় স্বজনকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করি। মঙ্গলময় যেন সুধীর চন্দ্রের আত্মাকে শান্তি দেন এই আমাদের প্রার্থনা।

এসেছ কি প্রিয়তম ?

—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

কত ফুল ফোটে, আর কত যায় ঝ'রে,—
স্মৃতি তার র'য়ে যায় বনের মর্ম্মরে।
তুমি এসেছিলে প্রিয় জনারণ্য মাঝে,
পঁহুছিতে পারো নাই জীবনের সাঁঝে!
কয়েকটি প্রভাতের মধুর আলোতে
হেসে উঠে, মুছে গেলে এ পৃথিবী হ'তে!
তবু তার স্মৃতিটুকু র'য়ে গেছে মনে
সীমাহীন জনতার অরণ্যগুঞ্জনে।

ক্ষণে ক্ষণে সচকিত, ফিরে দেখে লোকে,—
'এসেছ কি প্রিয়তম খুসিভরা চোখে
প্রিয়জন মাঝে তুমি ? হাসিঅশ্রু মাঝে—
এসেছ কি ছোট বড় শত কোটি কাজে
—ভালোবাসা ভরা তব সুকোমল মনে—
ধীরে ধীরে সকলের প্রাণের কাননে ?

"তীর্থযাত্রী"

প্রবোধ সরকার

পথচলতি জীবন-পথে চিরসনাতন অমোঘ সত্য মাঝে মাঝে তার এমনি কঠোর কঠিন তীব্র মূর্ত্তি নিয়ে আমাদের চোখের সামনে হাজির হয়—তা যেমনি অবিশ্বাস্য তেমনি সহ্যাতীত ভয়াবহ। কিন্তু বাস্তব জগতের সাধারণ মানুষ অমর সত্যের কণ্ঠ রুদ্ধ করে মনগড়া কল্পনাকে প্রাধান্য দিতে পারে না। কাজেই সুধীরের অবিশ্বাস্য অকাল মৃত্যুসংবাদ আমার কল্পনাপ্রবণ অবিশ্বাসী মন বিশ্বাস না করে পার্লে না।

সুধীর চন্দ্রকে অনেকেই জানেন কথাশিল্পী ও সম্পাদক হিসাবে, কিন্তু সুধীর চন্দ্র কথাশিল্পী ও সম্পাদক হবার বহু পূর্ব্ব হতেই তাকে আমি জানি ছাত্র হিসাবে। ঐ তরুণ শিল্পীর ছাত্রজীবন ও কর্ম্মজীবন সবচেয়ে মধুময় হয়ে উঠেছিল তার অমায়িক অপার্থিব শিশুর সারল্যে। বর্ত্তমান যুগে সরলতার অভাব থাকাটাই যেন অতি বড় গৌরবময় একটা কিছু! তাই আমরা আজ মুখে বলি এক আর অন্তরে ভেবে নিই ঠিক তার বিপরীত। আর যুগধর্ম্ম হিসাবে এই আত্ম-প্রবঞ্চনাকেই প্রাধান্য দিয়ে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেষ্টা করি। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে দুরকম কলাবিদের সবচেয়ে বেশী প্রাচুর্য্য লক্ষিত হচ্ছে। প্রথমতঃ—অভিনেতা, আর দ্বিতীয়—লেখক বা সাহিত্যিক। আজকাল ঘরে ঘরে লেখক আর অভিনেতার সংখ্যার হার এমনিভাবে বেড়ে উঠেছে যে তার ফলে—পাঠক আর দর্শকের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হচ্ছে। আমরা আজ জনে জনে সাহিত্যিক—জনে জনে অভিনেতা।

এই মারাত্মক আত্মপ্রবঞ্চনার ফলে না হচ্ছে সাহিত্যের উন্নতি আর না হচ্ছে অভিনয়ের উন্নতি।

কথাশিল্পী বা সম্পাদক হিসাবে সুধীর চন্দ্রের স্থান কোথায়—সে বিচার আমার নয়; আমি শুধু বলতে চাই যে, যুগের ঐ মারাত্মক আত্মপ্রবঞ্চনার মোহের ফাঁসে সে নিজেকে কোনদিন বদ্ধ করেনি।

মাসিক "অর্চ্চনার" বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। সাহিত্যের আসরে "অর্চ্চনার" একটা স্থান বহু পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে গেছে। সুধীর চন্দ্র "অর্চ্চনার" পুরাতন ধারা অক্ষুন্ন রেখে—নতুনত্বের আহ্বান করে পত্রিকাখানিকে সুষমামণ্ডিত কর্ত্তে সচেষ্ট ছিল; অথচ অতি আধুনিকতার মোহে সে কোনদিন নিজেকে হারিয়ে পথভ্রষ্ট হয়নি। তরুণ সম্পাদকের পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়।

পৃথিবীতে যতগুলি তার ভালবাসার জিনিষ ছিল—তার মধ্যে অর্চ্চনাই উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে সে তার কোন বিশিষ্ট বন্ধুকে বলে গেছে,—"ভাই! অর্চ্চনা রইলো—! আমি তো মৃত্যুপথযাত্রী কিন্তু অর্চ্চনাকে তোমরা বাঁচিয়ে রেখো।"

এতেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে কতখানি দরদ দিয়ে সুধীর চন্দ্র তার অতি সাধের মাসিক পত্রিকা "অর্চ্চনাকে" ভালোবাসতো।

সুধীর চন্দ্রের বন্ধুবর্গ ও "অর্চ্চনার" নবীন সম্পাদক শ্রীমান্ রণজিৎ চন্দ্রের (সুধীর চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) নিকট আমার নিবেদন যে,—তাঁরা যেন "অর্চ্চনার" পুরাতন প্রবীণ সাহিত্যিক গোষ্ঠি ও নবীন সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতির সাহায্যে "অর্চ্চনাকে" বাঁচিয়ে রেখে সুধীর চন্দ্রের ঐকান্তিক অভিলাষকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

সুধীর চন্দ্রের পিতৃদেব মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস চন্দ্র ("অর্চ্চনার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিদারুণ দুঃখকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা আমার নেই;—কারণ তাঁদের অনির্ব্বচনীয় ব্যথার কতকটা পরশ আমার বুকে এসেও বেজেছে।

সুধীর চন্দ্রের অমর আত্মা শান্তি লাভ করুক।

কোথায় তিনি ?

শ্রীমতী কণক লাহা

এ কথা কোনওদিন ভাবতে পারিনি যে এই অল্প বয়সে সুধীর কুমার চন্দ্র জগতের সকল সম্পর্ক মিটিয়ে স্মৃতিটুকুই রেখে চলে গেলেন দূরে, অনেক দূরে যেখানে তাঁর শোক সন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতার করুণ বিলাপ, তাঁর ভাইবোনদের সকাতর আহ্বান কিছুই পৌঁছায় না। যেখানে অশ্রু কোনও পথ খুঁজে পায় না, মর্ত্তের কোনও ব্যথা স্থান পায় না। ভাবতে পারিনি যে তিনি তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে গড়া অর্চ্চনাকে ফেলে, স্নেহময় পিতা, স্নেহের ভাইবোন ছেড়ে চলে যাবেন। একথা কোনও দিন অন্তরের কোনেও স্থান দিতে পারিনি যে তাঁর জীবনের কলি ফুটে না উঠতেই কোন এক অজানা ঝঞ্ঝাতে ঝরে পড়বে; লুটিয়ে পড়বে স্নিগ্ধ ধরার কোমল কোলে। কিন্তু অসময়ে ঝরা ফুলও নিঃশেষে আপনাকে ধরার সঙ্গে মিলিয়ে দেয় না। মিলিয়ে যাবার আগে, সে যে কদিন ফুটেছিল সে ক'দিনের সৌরভে সকলকে মাতিয়ে রাখে। এই অসময়ে ঝরে পড়া ফুলটিও যে তাই। তার 'ফোটার' সৌরভ এখন তার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে নিত্য।

সাহিত্যে তাঁর স্থান ছিল উচ্চে একথা কেউ অস্বীকার করবে না। তাঁর অর্চ্চনার সমাদর শুধু ভারতে না ইংলণ্ডে, জার্ম্মানীতে, আমেরিকাতেও।···

সুতরাং সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর সমালোচনা করা আমার বাতুলতা; কিন্তু তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে আমি যতটুকু জেনেছি ততটুকু দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের আভাস লোকচক্ষুর সামনে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করবো সামর্থ্যমত।

তিনি শুধু সাহিত্যিক হিসাবে আমাদের পরিচিত আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন না। তিনি আত্মীয়তা সূত্রেও আমাদের সঙ্গে বাঁধা ছিলেন তাই তাঁর সঙ্গে মেশবার তাঁকে চেনবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

তাঁকে সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা আমার মত ক্ষুদ্র লেখিকার পক্ষে অসম্ভব। তাই তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা দিক আমি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাই করেছি।

তাঁর মত jolly এবং humourist লোক অতি অল্পই দেখেছি। এখানে তাঁর ২।১টা humour এর উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না—

একদিন তাঁর কয়েকটি বন্ধু বসে বসে verse compose করছেন। compose তো হচ্ছে কতো, শুধু তাঁরা তুলছেন হাসির লহর। সুধীরবাবু চুপ করে বসে দেখছিলেন তাঁদের কাণ্ড। হঠাৎ উঠে গেলেন। ফিরে এলেন হাতে এক ঘটী জল। দিলেন তাদের গায়ে ঢেলে। তারা তো হেসে লুটোপুটী খেতে লাগলেন সুধীরবাবুর কাণ্ড দেখে।

আর একদিন সকলে মিলে যাচ্ছেন cinema দেখতে (বন্ধুরা বেশ করে সেজে যাচ্ছেন সব)। একে দার্জ্জিলিং বিদেশ তারপর cinema house মাত্র দুটা তার একটায় চলছে হিন্দী film আর একটায় ছিন্নহার। তাঁরা অবশ্য ছিন্নহার দেখতেই যাচ্ছেন। তাঁদের মনে বেশ আমোদ। সুধীর বাবু চুপচাপ চলেছেন সঙ্গে। কিন্তু তাঁর ঠোঁটের কোনে *কি এক রহস্যের কৌতুকময় হাসি খেলছে কেউ লক্ষ্য* করেননি। cinema house এর প্রায় কাছাকাছি গিয়ে সুধীরবাবু বল্লেন—আজকে তো কি কারণে cinema house বন্ধ। তাঁরা তো উঠলেন প্রায় লাফিয়ে—যাঁ! cinema house বন্ধ তবে···? কিন্তু তাঁরা প্রত্যক্ষ না দেখে বিশ্বাস করতে চাইলেন না। cinema house এ পৌঁছে দেখা গেল সত্যই বন্ধ। বেচারা বন্ধুরা!!

বন্ধুরা সকলে যাচ্ছেন Sinchol Lake দেখতে। সুধীরবাবু যাবেন না। কিন্তু তারা যাবার আগে যে কখন সেখানে যাবার পাশখানা একজনের পকেট থেকে তুলে নিয়েছেন কেউ জানেন না। তাঁরা চলে গেছেন অতটা খেয়াল না করেই। কিন্তু ষ্টেশনে পৌঁছেই যাকে বলে চক্ষু চড়কগাছ! কিন্তু সুধীরবাবুর বন্ধুদের অতটা কষ্ট দিতে বোধ হয় প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তাঁরা যাবার একটু পরেই পাঠিয়ে দিলেন পাশটা একটা ছোট ছেলের হাতে।

এমনি সব নানা ছোট খাটো ব্যাপারে তিনি বন্ধুদের

এবং অন্যদেরও আমোদ দিতেন। তিনি না হেসে গম্ভীর ভাবে এমন সব কথা বলতেন যা করতেন যাতে অন্যের পেটে খিল ধরে যায়।

এইভাবে নানা আমোদের মধ্য দিয়ে জীবনের কয়েকটা বছর কাটিয়ে পাড়ি দিলেন কোন অজানার দেশে, যেখানের সব জিনিষই আমাদের অজানা, অচেনা; জানিনা সেখানে কি আছে, কে আছে, সেখানে কারা থাকে, যারা থাকে তাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি কেমন। জানিনা সে জায়গা কত দূরে। শুধু এইটুকু জানি যে এই মর্ত্তের কোনও জিনিষ, কিছুর স্থান সেখানে নেই এক কেবল মর্ত্ত্যত্যাগীর আত্মা ছাড়া।

পৃথিবীতে কি তিনি এসেছিলেন পিতার স্নেহ, ভাই বোনের ভালবাসা, বন্ধুদের প্রীতি, আত্মীয়স্বজনের স্নেহ নিতে? তাদের সকলের জীবনের ছন্দের সঙ্গে নিজের জীবনের ছন্দ মিলিয়ে জীবনের সামান্য কটা বছর কাটিয়ে চলে যেতে এই অসময় সকলের মায়ার বাঁধন কাটিয়ে? তাঁর উপর সকলের কত আশা কত ভরসা ছিল তিনি সে সব নির্ম্মূল করে চলে গেলেন একেবারে, আর এ জগতে তাঁর চিহ্ন কোথাও কিছু না রেখে। শুধু রেখে গেলেন তাঁর সুগভীর স্মৃতি, তাঁর নাম, তাঁর যশ, তাঁর কীর্ত্তি যা তাঁকে অমর করে রাখবে। তাই নিয়েই তাঁর শোকার্ত্ত আত্মীয় স্বজন, পরিচিত সকলেই সান্ত্বনা খুঁজে পাবেন। তাঁর বৃদ্ধ পিতা কিসের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পাবেন জানিনা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিন আর সুধীরবাবুর আত্মাকে পরলোকে শান্তি দিন।

সুধীর কুমার

[বি-কু-ল]

সুধীরের সবচেয়ে বড় পরিচয়—সে ছিল বন্ধু।

সরল, অনাড়ম্বর, সংস্কারমুক্ত মানুষটি—অতিশয় দৃঢ়, স্বতন্ত্রমত আগুয়ান!

যাঁরা কিছুদিনও ওর সান্নিধ্যে এসেছেন—তাঁরাই ওর বিদায়ের আকস্মিক ঘায় মুহ্যমান হবেন, নিঃসন্দেহ।

ওর মতন মনোযোগী শ্রোতা, ওর মতন উৎসাহী সাথী ওর মতন পরোপকারী মন—আমি একজন কারও মধ্যে দেখিনি; ওকে যখনই কাছে পেতুম—হাসিতে, আনন্দে আলাপে, আলোচনায় নিবিড় সুখেই সময় কেটে যেত।

ওর মতন এত অল্প বয়সে যাদের পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয়, বুঝতে পারি, পৃথিবী তাদের বাসের অযোগ্য স্থান; আরো সুন্দর, মধুর শান্তিময় কোনও দেশের আহ্বানে তারা চলে যায় পিছনে তাদের সঙ্গ-লাভেচ্ছু অতৃপ্ত স্বজন, বন্ধুবৃন্দ অশ্রু বেদনায় ব্যাকুল হ'য়ে অন্ধকার পথের পানে চেয়ে থাকে, কণ্ঠে গুঞ্জরিত হতে থাকে, 'ভুলিব না কভু, রবে মনে মনে!'

বিদায়, আপাততঃ বিদায়, বন্ধু! আমাদের পিছনের অজস্র সুখের মুহূর্ত্তগুলি বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হয়ে এবার আমার সামনে ছড়িয়ে থাকুক, তাদের উপর নিয়ত প্রতিফলিত হোক তোমার স্মৃতির মনোরম আলো!

শোক-উচ্ছ্বাস

শ্রীরণজিৎ চন্দ্র

নহে কোন দেব,   মহান্ মানব
নহে কোন সাধু,   কীর্ত্তি অভিনব
নহে কোন ধনী   বিপুল বিভব—
নহে গণ পরিচিত—
তবু কেঁদে সারা ভাই-ভগ্নি যত শোকে জর্জ্জরচিত্ত।

ফুলের মত   ফুটিল কাননে—
শান্তি সুধা ভরা   কোমল আননে—
কত আশা ভাষা   সুপ্ত হৃদি কোণে
শুকাইল ধীরে ধীরে—
ফুলের-সুষমা-মরি মরি তবু আকাশে বাতাসে ফেরে!

কত ফুল ফোটে   বনানীর মাঝে,
লাগিত যেইটী   দেবতার কাজে,
শুকাইল আহা   অকালে—অকাজে—
স্তব্ধ! বিধির বিধান!
কেনবা ফুটিল—পেলব পুষ্প—কেন তার অবসান?

আশা ভোগ তৃষা   অনন্ত অশেষ
না হইতে তার   জ্ঞানের উন্মেষ
কেন হরে' নিলে,   বল পরমেশ
অবোধ আমরা যত—
তবু কি বুঝিব করুণা তোমার বহিতেছে অবিরত?

স্মৃতিকণা

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

শীতের ধূসর অপরাহ্নে অকস্মাৎ আকাশে ঘন মেঘ ঘনাইয়া আসিল বজ্রাঘাতের ন্যায় শুনিলাম সুধীর চন্দ্র আর ইহধামে নাই। বিপুল আত্মীয় স্বজন অগণিত বন্ধুবান্ধবকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া সুধীর চন্দ্র পার্থিব জগতের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেল চির শান্তিধামে।

রোগশয্যাশায়ী পিতার মর্মান্তিক মূকবেদনার ভাষা, আত্মীয়বর্গের অশ্রুজল আমাদের দীর্ঘশ্বাস কিছুই আর ফিরাইয়া তাহাকে আনিতে পারিবে না জানি কিন্তু তবুও অবাধ্য মন বাধা মানে না।

সজল বেদনা-অশ্রুতে কণ্ঠ আজ অবরুদ্ধ লেখনী স্তব্ধ।

সুধীর চন্দ্র আমার জীবনে আসিয়াছিল। বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদের ন্যায় স্বর্গের পারিজাত যে ধূলির ধরণী তাই তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। আমাদের জীবনপথ হইতে বঞ্চনার অভিশাপ দিয়া সে চলিয়া গেল।

অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে নিরুপায় দৃষ্টিতে সুধীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্চ্চনার বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীমান রণজিৎচন্দ্র আমার মুখের পানে চাহিয়া আছে—তাহাকে কি সান্ত্বনার বাণী শুনাইব? দুর্ব্বল লেখনী আমার যাহার উৎসাহ প্রেরণায় চলিয়াছিল আজ চলার পথে তাহা যেন বন্ধ হইয়া গেছে।

কৈশরের খেয়ালে যে স্বপ্ন জাগিয়া ছিল—বাণীর পবিত্র দেউলে যে ক্ষীণ দীপশিখা জ্বালাইবার প্রচেষ্টা করিয়া ছিলাম জীবনের সংগ্রামে তাহা এতদিনে নিভিয়াই যাইত—কিন্তু তাহা নিভাইতে দেয় নাই—আমার প্রীতিমুগ্ধ বন্ধু সুধীর কুমার দীপ্তকণ্ঠে যে শোনাইয়াছিল জয়ের বাণী আজও কানে বাজিতেছে—অনিলবাবু জীবনের পথ আশীর্ব্বাদ যে জনতার স্রোতে আমরা মিশে যাইনি।

সুধীরের প্রৌঢ় পিতৃদেব শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদাস বাবু যেদিন অর্চ্চনাকে আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইলেন—আমার জীবনের সাধনাকে তোমাদের হাতে দিলুম আশীর্ব্বাদ করি তোমরা যেন এর গৌরবকে আরও বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হও—সেদিন বসন্তের নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় আকাশকে সাক্ষী রাখিলাম—এই সাধনাই যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হয়।

তারপর কত বিচিত্র রজনীর প্রচেষ্টা—কত ঝড়-ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম করিয়া আমরা চলিয়াছিলাম—অর্চ্চনার সেবাব্রতে বন্ধুর সেই অদম্য উৎসাহ—সাহিত্য সেবার সে মহান ব্রত তাহা কখনও ভুলিবার নয়!—সুধীরের বিহনে আজ সেই স্মৃতি জাগিতেছে।

প্রতিটি দিনের প্রতিটি ছোটখাটো স্মৃতি—আজ তাহা কত গভীর! সুধীরের ব্যক্তিত্ব তাহার সরলতা—স্বার্থপর এ ধূলির ধরণীতে সত্যিই বিরল। পত্রিকা পরিচালনায় কত মনান্তর হইয়াছে—রাগ করিয়া—অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছি—গভীর রাত্রিতে উত্তর কলিকাতা হইতে দক্ষিণ কলিকাতায় আমার গৃহে আসিয়া বন্ধু ঘুম ভাঙাইয়াছে - সহাস্য প্রশান্তমুখটিতে আবদার জানাইয়াছে—অকপট ব্যবহার অভিমান ভাঙাইয়া চলিয়া গেছে তাহার ব্যক্তিত্বের নিকট পরাজিত হয় নাই তাহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয় নাই -এমন কাহাকেও দেখি নাই।

তাহার প্রতিটি লিপির ভাষা অর্চ্চনা আপনাকে চাহিতেছে সজল অশ্রুর আখরে কেবলই চোখের সামনে ভাসিতেছে।

রোগশয্যা পার্শ্বে অসহ্য ব্যাধিক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া যখন বসিয়া থাকিতাম বন্ধু তখন বলিত আমার জন্যে ভাবনা নেই অর্চ্চনার জন্যে কি করছেন?

সাহিত্যের প্রতি এ অনুরাগ এ সাধনা সচরাচর দেখি নাই সুধীরের সংস্রবে আসিয়া এই মহান্ শিক্ষা জীবনে লাভ করিয়াছি।

বাণীর একান্ত সেবক আজ আর ইহজগতে নাই—আমাদের সহস্র ব্যাকুলতার মাঝেও আর সে ফিরিয়া আসিবে না কিন্তু তাহার মহান্ সাধনার স্মৃতি আজিও রহিয়াছে। যাহার সেবায় সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল সেই অর্চ্চনা তাহার জীবনাপেক্ষাও প্রিয়;

তাহার এই প্রিয় স্মৃতিরেখা আমাদের জীবনে অক্ষুন্ন হইয়া বিরাজ করুক আজিকার দিনে সেই কামনাই করিতেছি।

অর্চনার অনুরাগী লেখক লেখিকা পাঠক পাঠিকা বিজ্ঞাপন দাতা আজ সকলকেই বিনীত নিবেদন জানাইতেছি স্বর্গগত সাহিত্য সেবীর অমলিন স্মৃতি যেন চির অক্ষুন্ন থাকে সমবেত সহযোগিতার মাঝে।

জীবনের বাসন্তী প্রভাতে যে কুসুম ঝরিয়া গেল বন্ধু হিসাবে আত্মীয় হিসাবে সহকর্মী হিসাবে চিরদিন বেদনার অশ্রু স্মৃতিতে আমার চিত্তপটে ভাসিয়া থাকিবে উহায় তাহা ব্যক্ত হইবার নয়। অশ্রুসিক্ত চক্ষে নিগূঢ়তম বেদনার মাঝে বন্ধুর অমর আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

নিঃসঙ্গ বেদনার মাঝে নিঃসহায় মুহূর্তে অশরীরি বন্ধু তুমি আমাদের পাশে আসিয়া চির প্রশান্ত মূর্ত্তিতে সান্ত্বনার বাণী লইয়া দাঁড়াইও।

পরলোকে সুধীর

শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল

মানুষ ভাবে এক কিন্তু ঘটে আর এক। ভবিতব্যের উপর হাত তার কোথায়। জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের কত আশা, কত কল্পনার রঙ্গীন ফানুষ, একদিনে, এক ঘণ্টায়, এক নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায়—কত রঙ্গীন স্বপ্ন রূপ নেবার আগেই ভেঙ্গে পড়ে, স্মৃতির পটে কেবল একটা ছোট দাগ রেখে। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার চিরদিনই কোথায় যেন একটা গোল বেধে আছে।

কিন্তু এতো কল্পনা নয় এ যে সত্য কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা সব চূর্ণ হয়ে গেল এক নিমেষের মধ্যে। একি বিধাতার ক্রুর পরিহাস। সুধীর বাড়ে গেল এই বাস্তব জগতের সকল দেনা পাওনা মিটিয়ে।

তার সম্বন্ধে লিখতে হলে অনেক কিছুই লেখা যায়—কিন্তু পারা যায় না; চক্ষু ঝাপসা হয়ে আসে, লেখনী অগ্রসর হয় না; কিন্তু তবুও লিখতে হবে তার সম্বন্ধে কারণ বর্ত্তমান "অর্চনা সম্পাদক শ্রীমান্ রণজিৎ চন্দ্রের অনুরোধ।

কতদিন আমরা দুইজনে নির্জ্জনে বসে কত হাসি, ঠাট্টা, তামাসা করে, কত সুখ দুঃখের কথা বলে কত সময় কাটিয়ে দিয়েছি, কত প্রতিজ্ঞা করেছি,—পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায় রাখব বলে; জীবনকে উপভোগ করবার জন্যে কত রঙ্গীন কল্পনাই আমরা করেছিলাম, কিন্তু হায়! ভগবান অসময় তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন আমার নিকট হতে চিরদিনের মত।

যেখানেই গিয়েছি—সুধীর ছাড়া কখনও হই নাই—পাঠশালা হতে আরম্ভ করে Theatre Cinema খেলা ধুলা, এমন কি যখন বিদেশে গিয়েছি তখনও সুধীর ছাড়া হই নাই।

আমাদের বন্ধুত্ব কিরূপ প্রখর ছিল তার ২।১টা উদাহরণ দিব—

গ্রীষ্মকাল—বেলা তখন প্রায় ১২॥০টা। গ্রীষ্মকালে কলিকাতা সহরের অবস্থা যে কি ভীষণ তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র। সুধীরের বাড়ীতেই বসেছিলাম। হঠাৎ সে বলে বসল "চ, গর্ম্মতলায় বেড়িয়ে আসি" আমিও বললাম রাজী আছি। সঙ্গে আমাদের আর একটী বন্ধু ছিল, সরে পড়ল। আমি ও সুধীর প্রায় তিন মাইল রাস্তা ঘুরে এলাম। বস্ত্রের মধ্যে আমার ছিল মাত্র কাপড় আর পায়ে ছিল চটী। আর সুধীরের ছিল পরণে গামছা ও পায়ে চটী। গায়ে আমাদের কিছুই ছিল না। রাস্তায় চলতে চলতে সুধীর বলছিল "সবাই ভাবছে আমরা পাড়ার লোক"।

এই রকম খেয়ালের জন্য পদব্রজে তার সঙ্গে একবার চুঁচুড়া ঘুরে আসতে হয়েছিল।

Delhi Express—চলেছি 'দেওঘরে' জন ২০ বন্ধু নিয়ে। কিসের একটা ছুটীর জন্যে Stationএ কদিন হতে খুব ভিড় হচ্ছিল—সুতরাং স্থির হল আমরা ঘণ্টাখানেক আগে Stationএ পৌছাব। আমাদের আর সব বন্ধু

ঠিক্ সময় Station চলে গেছে ; বাকী কেবল মাত্র আমরা দুজন। তখন ট্রেন ছাড়তে মাত্র মিনিট কুড়ি বাকী তখনও আমরা দুজনে নিশ্চিন্ত মনে Telephone ঘরে কথা কইছি,—সুধীর বলছে—"ভয় কি যখন ৪॥০ গণ্ডা লোক Stationএ পৌঁছেচে তখন তারা আমাদের জন্যে স্থান একটু রাখবেই!" কিন্তু গাড়ীতে পৌঁছে আমরা বেশ ভালভাবেই ঠকেছিলাম, সুধীর অবশ্য নয় ; কারণ বর্দ্ধমানে গাড়ী পৌঁছিলে ২॥০ টাকার সীতাভোগ মিহিদানা কেনা হল এবং রাখা হল upper berthএ, সুধীরও সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের ভাণ করে upper berthএ গিয়ে শুল। জসিডিতে গাড়ী পৌঁছুলে দেখা গেল মিষ্টান্নের চ্যাঙারী প্রায় নিঃশেষ হয়েছে।

পুরী গিয়েছি রথ দেখতে সঙ্গে আমাদের আর একজন বন্ধু গিয়েছল। এ বন্ধুটি আমাদের পুরী পৌঁছেই বলে বাটী যাব এবং দিন তিন চার পরে ফিরেও এলো। তখন আমরা দুজন মাত্র। দিনও ভালভাবে কাটছিল না। শেষে সুধীর কোথা হতে জন ১২।১৩ বন্ধু জোগাড় করে আনলে তখন আমাদের দিন আবার বেশ আনন্দে কাটতে লাগল। রথের দিন চার পরের কথা,—সন্ধ্যাবেলা আমরা দল বল নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি—এমন সময় এলো ভীষণ বৃষ্টি—প্রায় সকলেই বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্যে যে যেখানে পেলে একটু একটু আশ্রয় করে নিলে, আশ্রয় কেবল পাই নাই আমরা চারজন—সুতরাং আমাদের ভিজতে হল প্রায় দেড় ঘণ্টা। বৃষ্টি ধরলে আমরা বাটীর দিকে রওনা হলুম সমুদ্র তীর ধরে, এ সময় হঠাৎ সুধীর আশ্রয় ভোগীদের মধ্যে ২ জনকে দিল ঠেলে ফেলে সমুদ্রের জলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই সেই রাত্রে সমুদ্রে স্নান করে বাটী ফিরতে হয়েছিল।

দার্জ্জিলিং—গিয়েছি তিন বন্ধুতে বেড়াতে। সেদিন আবহাওয়াটা ভাল না থাকায় রাত্রে একটু তাড়াতাড়ি আহার শেষ করে বিছানায় আশ্রয় নিলাম। সুধীর আমার পাশেই শুত, আহারের পর ভিতরে গিয়েছিল বোধ হয় মশলা খেতে। ফিরে এসে যখন দেখলে আমরা দু'বন্ধুতে সমস্ত লেপ কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছি ও তার গায়ে দিবার জন্য কিছুই নাই—তখন সে কিছু না বলে শুয়ে পড়ল সুইচটা অফ্ করে দিয়ে কিছু গায়ে না দিয়েই। মিনিট দুয়েক পরে মুখে এমন একটা শব্দ করে আমার গায়ের সমস্ত লেপ ও কম্বল টেনে নিল—যে তখন আমার পক্ষে হাসি চেপে রাখা মুস্কিল হয়ে পড়ল—এবং এমন ভাবে হাসতে লাগলাম যে বাটীর মেয়েরা সব ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ল—মিনিট পনের ধরে যখন এমনি ভাবে হেসে চলেছি তখন আমাদের তৃতীয় বন্ধুটিও হাসতে আরম্ভ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাটীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও। পাড়ার লোক জিজ্ঞাসা করতে লাগল কি ব্যাপার! কি ব্যাপার!! হাসিও আমাদের কিছুতেই থামতে চায় না—শেষকালে সুধীরও হাসতে আরম্ভ করলে ; ভীষণ বিপদে পড়লাম,—আমার মাথার শিরাগুলা ফুলে উঠল নিঃশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড় হল—কিন্তু চেষ্টা করেও হাসি থামাতে পাচ্ছি না। অবশেষে সুধীরই আমাদের রক্ষা করলে—এক ঘটী "সিন্ধল-লেকের" কন্‌কনে শীতল জল আমার মাথায় ঢেলে।

যে দার্জ্জিলিং সহরের লোকেরা সব সময় ৩।৪টী জামা না পরে থাকতে পারে না সেই ঠাণ্ডা দেশে আমরা মাত্র ১টি Sporting গেঞ্জি পরে ক্রমাগত ৩।৪ ঘণ্টা ধরে Badminton খেলেছি।

সুধীর ছিল গম্ভীর। নিজে না হেসে অপরকে হাসাবার ক্ষমতা ছিল তার অসীম, আবার যখন সে নিজে হাসত তখন হত ভীষণ মুস্কিল। যেখানেই গিয়েছি আনন্দে স্থানটী মাতিয়ে দিয়ে এসেছি। কত দুঃসাহসিক কাজ আমরা দুজনে করেছি তার ইয়ত্তা নেই—।

কলিকাতা—বৈকালে বাহির হয়েছি, সাথে আছেন আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু কবি সতীশ চট্টোপাধ্যায়। রাস্তায় সুধীরের জল পিপাসা পেল—কাছে কোথাও দোকান নাই, প্রবেশ করলাম একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত বাটীতে ; আলাপ জমাইয়া পাইলাম জল এবং যে স্থলে বাটীর মালিকের অনুপস্থিতে মেয়েদের সহিত আলাপ হইত সে স্থলে পাইতাম মিষ্টান্ন এবং সেই সঙ্গে পান।

এই ভাবে আমাদের দিন বেশ আনন্দেই কাটছিল কিন্তু সে ঝরে গেল—এক নিমেষের মধ্যে ইহজগতের সকল দেনা পাওনা মিটিয়ে। সে চলে গেল আমাকে ফাঁকি দিয়ে, আমার বন্ধুত্ব ছিন্ন করে, আমাকে অতলে ভাসিয়ে, আমার সকল আশা ভরসা চূর্ণ করে দিয়ে—অস্তাচলে অস্তরাগ রচনা করে স্নিগ্ধ ফুলের সুরভির স্মৃতিমাত্র হয়ে গেল।

ভাই সুধীর—তুই আমার সব আশা, কল্পনা ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেলি,—কোথায় গেলি জানি না, কোথায় আছিস্—জানি না ; কেমন আছিস্ তাও জানি না ; তবে যেখানেই থাকিস্ অপেক্ষা করিস্—স্থান রাখিস্—যেন গিয়ে বসতে পাই তোরই পাশে তোরই হাত ধরে।

সুধীর প্রয়াণে

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

সুধীর বনফুলের মত স্বল্পায়ু নিয়ে এলো এই সংসারে, একটা দমকা হাওয়ার বেগে ঝরে পড়লো অকালে, ফোটবার আগেই। সেই ছোট্ট জীবনের যে গন্ধটুকু বিলিয়ে গেল এই সংসারের মাঝে সেইটুকুই

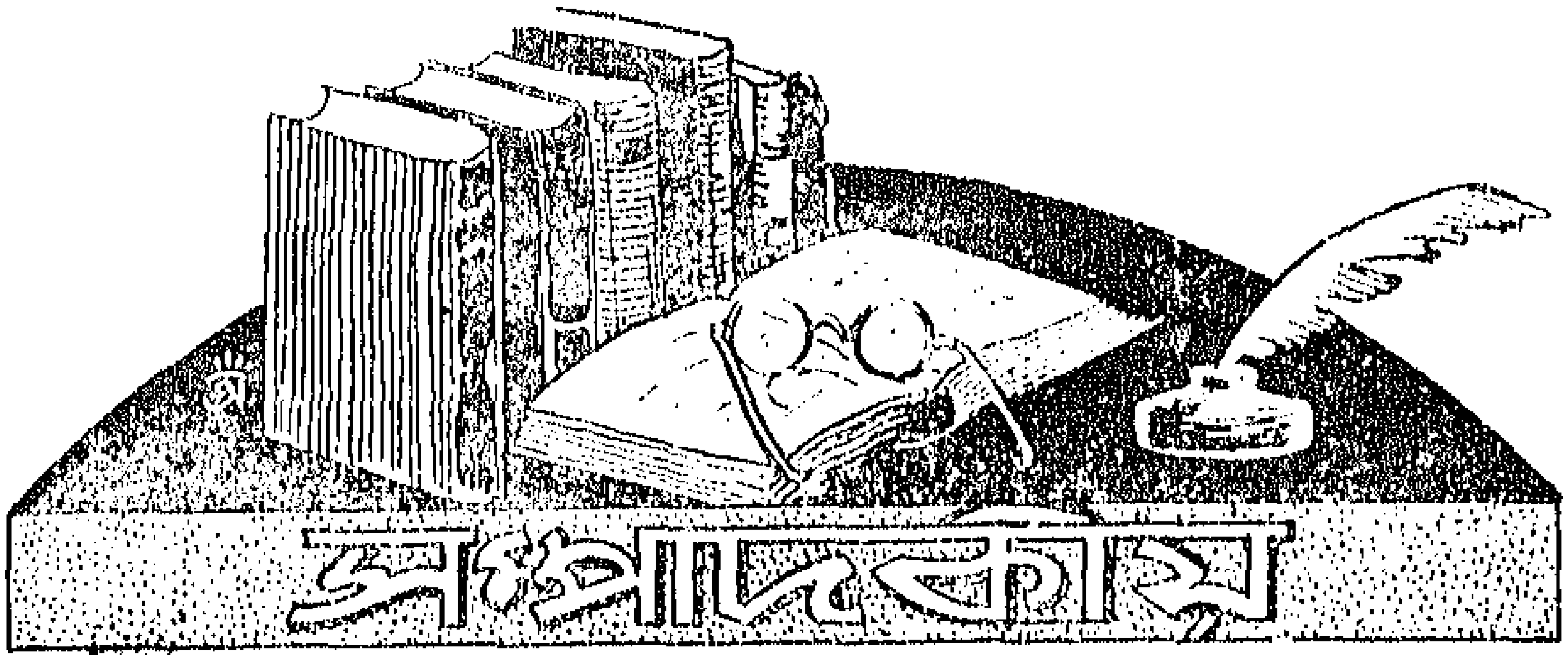


রইলো জেগে বাতাসের বুকে বুকে! পরমায়ু যেমন অল্প, কর্ম্মজীবনও তেমনি তার অল্প। সাহিত্যসেবী পিতা রোগাক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই 'অর্চ্চনার' সম্পাদনাভার ন্যস্ত হলো সুধীরচন্দ্রের ওপর। তরুণ সম্পাদকের সে কী উদ্যম, সে কী আগ্রহ! কায়মনপ্রাণে সে অর্চ্চনার বেদীমূলে নিজেকে দিল লুটিয়ে। দীর্ঘ বৎসর সে সব ভুলে বাণীর অর্চ্চনা করলে, একাগ্রচিত্তে। সংসারে নির্লিপ্ত, সাহিত্য-সেবাই হলো তার জীবনের সাধনা। কিন্তু ক'টি দিনই বা! উন্মুখ যৌবনের অটুট স্বাস্থ্য সহসা ঝড়ে-ভেঙ্গে-পড়া পল্লবিত শাখার মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কাল ব্যাধি তাকে নিঃশেষে গ্রাস করলে। কোথায় গেল তার অসুরের মতো শক্তি, কোথায় গেল দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, যুঝতে পারলে না, করাল মৃত্যুর সাথে!

মরতে কি সে চেয়েছিল, না। যৌবনের প্রারম্ভে মরতে কেউ চায় না সেও চায়নি। বাঁচবার সে কী আকুল কাতরতা! মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় যখন তাকে দেখলুম, তখনো সে বুঝতে পারেনি যে বেলাশেষের বাঁশী বেজেছে। তখনো সে বাঁচতে চেয়েছে, তখনো তার ধারণা ছিল সে বাঁচবে। কী কাতর সে নিষ্প্রভ চোখের চাউনি! কী ব্যাকুলতা তার ম্লান মুখের প্রতিটি রেখায়! সে বাঁচতে চায় পৃথিবীর মাটিতে, আলো বাতাসে সে বাঁচতে চায়! সে চাউনি, সে অব্যক্ত কাতরতা, সে কী কখনো ভুলতে পারবো? না, জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত না।

মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। মঙ্গলময় নিশ্চয়ই তিনি যিনি তাকে ডেকে নিলেন। তার আত্মার সদ্গতি হোক, মা'র ছেলে, মা'র কোলে গিয়ে চিরশান্তিতে বিরাজ করুক্—

"May his soul rest in peace."



গভীর দুঃখ এবং শোকের মাঝে অক্ষম লেখনী নিয়ে আজ দায়িত্বপূর্ণ আসনে বসবার সময় সর্ব্ব প্রথমে অনুভব করছি নিজের দৈন্যের কথা। যে আদর্শ কর্ম্মী তাঁর জীবন পথের সাধনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন আমাদের কাছে এসে সে সাধনার ধন ধূলি মলিন না হয় সর্ব্ব কর্ম্মের সহায়ক সিদ্ধিদাতা বিশ্ব নিয়ন্তার কাছে সেই প্রার্থনাই করছি। পরলোকগত আত্মার পরিতৃপ্তি বিধানে "অর্চ্চনার" সেবা আরও জাগ্রত হোক—অশ্রুসিক্ত চোখে বাণীর মন্দিরে তাই আবার নৈবেদ্য-উপাচার নিয়ে এলুম।

* * *

অর্চ্চনার ভূতপূর্ব্ব তরুণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সুধীর কুমার চন্দ্র দীর্ঘদিনের দুরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণার কবল হতে চিরমুক্তি লাভ করেছেন—তাঁর এই অকাল বিয়োগে আমরা মর্ম্মাহত, সান্ত্বনার কোনও ভাষা নেই।

* * *

তাঁর স্মৃতির পরম নিদর্শন এই অর্চ্চনা। বর্ত্তমান সংখ্যা তাঁর অমর স্মৃতির শ্রদ্ধাঞ্জলিতে পর্য্যবেশিত হল। পরলোকগত অর্চ্চনা সম্পাদকের গুণমুগ্ধ প্রীতিমুগ্ধ বন্ধুগণ বাণীর বরপুত্র অনেকেই এতে যোগদান করে আমাদের কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন আমরা তাঁদের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

* * *

আমাদের এই অসহায় অবস্থায় শোকাভিভূত চিত্তের একমাত্র সান্ত্বনা আমাদের সহস্রবিধ ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও কারুরই স্নেহ দৃষ্টি থেকে আমরা বঞ্চিত হইনি।—আজিকার দিনে এই প্রার্থনাই করি এই স্নেহের এবং প্রীতির বন্ধন চিরদিনই যেন অটুট থাকে। অর্চ্চনার নিয়মিত লেখকবর্গ বাঙলার খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের সাহায্য এবং সুপ্রচারিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের সহানুভূতি এবং গ্রাহক গ্রাহিকাবর্গের প্রীতি দৃষ্টি অক্ষুণ্ণ।—অর্চ্চনা শুভানুধ্যায়ীদের এই শুভ কামনা এবং আশীর্ব্বাদই আমাদের চলার পথের পাথেয়। বাঙলাদেশে সংবাদিকতায় বহু বাধাবিঘ্ন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে আমাদের ক্ষমা দৃষ্টিলাভে হতে বঞ্চিত হব না—এই আশাই মহা আশা।

* * *

সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যায় বাঙলার আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন অর্চ্চনার সুরে সেই সমস্যার প্রতিধ্বনি থাকবে এই কথা বলেই আজকের মতন আমরা বিদায় গ্রহণ করি।

আকস্মাৎ

তোমার বিয়োগে ভাষা গেছে ডুবে চিন্তার নাহি জোর,
আজ শুধু তাই বিদায় জানাই হে প্রিয় বন্ধু মোর।

—যতীশ চট্টোপাধ্যায়।